শ্রম সংস্কার কমিশন

শ্রমজগতের রূপান্তর-রূপরেখা

শ্রমিক-অধিকার, সু-সমন্বিত শিল্প-সম্পর্ক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

কমিশন প্রতিবেদন

এপ্রিল ২০২৫

এটি শ্রম সংস্কার কমিশনের সংক্ষিপ্তসার। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানসমূহের, বিস্তারিত দাবীনামা ও নামের তালিকাসহ মতবিনিময় সভাসমূহে উপস্থিতির তালিকা সংযুক্ত আছে, যা https://blrcommission.org/ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কমিশন সদস্যবৃন্দ

মো. রাজেকুজ্জামান (রতন) সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট।	**আনোয়ার হোসাইন** যুগ্ম সমন্বয়কারী, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, ও সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল।	**আরিফুল ইসলাম** গণমাধ্যমকর্মী
ড. অনন্য রায়হান অর্থনীতিবিদ, ও চেয়ারপার্সন, আইসোশ্যাল।	**ফারুক আহাম্মাদ** মহাসচিব ও সিইও, বিইএফ	**এ এন এম সাইফ উদ্দিন** সদস্য, সহায়ক কমিটি বিজিএমইএ
ফজলে শামীম এহসান ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফতুল্লা এ্যাপারেলস লিমিটেড, ও কমিটি সদস্য, বিইএফ	**সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড, ও প্রাক্তন কমিটি সদস্য বিইএফ	**ব্যারিস্টার নিহাদ কবির** সিনিয়র পার্টনার, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটস, ও প্রাক্তন কমিটি সদস্য বিইএফ
মোস্তফা আল হোসাইন আকিল শিক্ষার্থী সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন।	**তাসলিমা আখতার** সভাপ্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি; ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, এবং আলোকচিত্রী	**মো. সাকিল আখতার চৌধুরী** সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন — বিএলএফ
কামরান তানভিরুর রহমান সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	**এ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম** সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন, ও কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সলিডারিটি সেন্টার - বাংলাদেশ।	**তপন দত্ত** সভাপতি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটি বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র - টিইউসি

ড. জাকির হোসেন অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	**ড. মাহফুজুল হক** সাবেক সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান, এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়

কমিশন প্রধান

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা-র বাণী

শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান-এর বাণী

'আমরা
নীচে পড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে!'

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শতবর্ষ পূর্বে মাদারীপুরে মৎস্যজীবী সম্মেলনে উপরের জাগানিয়া গানটি গেয়ে সকল বৈষম্য ও বঞ্চণার বিরুদ্ধে জেগে ওঠার ডাক দিয়েছিলেন। শত বছর পরেও বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের সেই স্বপ্ন পূরণ অধরাই রয়ে গেছে। শ্রমজীবী মানুষ আজও বন্দি হয়ে আছে সেই একই বৃত্তে। শ্রমজীবী মানুষ ক্রমেই পিছিয়ে পড়েছে উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে। সমাজ এগিয়েছে, কিন্তু শ্রমিকের জীবনচিত্র রয়ে গেছে একইরকম। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতিকালে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ প্রতিদিন লড়াই করছে দারিদ্রের সাথে, কাজ ও জীবিকার অনিশ্চয়তার সাথে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শংকা নিয়ে দিন কাটছে তাদের। একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় জীবন পাবার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম সংগ্রাম করছে শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত জীবন আজও আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের স্বপ্নই আমরা দেখেছিলাম ১৯৭১-এ, ৯০-এ, আবার দেখেছি ২৪-এর জুলাইয়ে। একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ এবং মর্যাদাকর বাংলাদেশ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চব্বিশের জুলাই ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে শ্রমখাত সংস্কারের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। এই মহান অভ্যুত্থানে যে সকল শিশু, ছাত্র, শ্রমিক, নাগরিক শহীদ হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। সেই সাথে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির জন্য যে সকল শ্রমিক, ছাত্র-জনতা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

'যেকোনো কাজ- কাজ না থাকার চেয়ে ভালো' এবং 'সস্তা শ্রমই আমাদের ব্যবসায়ের শক্তি'- নীতি নির্ধারণী মহলের এই ভ্রান্ত দর্শন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের উন্নয়ন, শিল্পায়ন, মর্যাদাকর ও শোভন কাজ এবং শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে সস্তা শ্রম ও দুর্ঘটনার দেশ হিসেবে।

যুগ যুগ ধরে অধিকার ও ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ ও সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই উদ্যোগকে সফল করতে কমিশনের সদস্যগণ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, পারস্পরিক আস্থা ও সম্মান নিয়ে কাজ করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে একটি ঐকমত্যের প্রতিবেদন জাতির সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। এক বিশাল কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিনিধি, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, আইনজীবী, গণমাধ্যম কর্মীগণ- তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন-, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ- স্কপসহ বিভিন্ন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন, সেক্টরাল ফেডারেশন, মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার সংগঠনসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ- সবাইকে জানাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা। একইসাথে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন– বিইএফ ও এর সদস্য সংগঠনসমূহ বিভিন্নভাবে মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ, পরামর্শ এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রমিক সুরক্ষায় রাষ্ট্রের যা কিছু উদ্যোগ তা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের শ্রমিক- যা ১৫% এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শ্রম বিক্রি করে জীবনধারণ করলেও দেশের সিংহভাগ শ্রমিকেরই নেই আইনী স্বীকৃতি, নেই কোনও সামাজিক নিরাপত্তা। সিংহভাগ

শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার ও দরকষাকষির অধিকার না থাকায় তারা বঞ্চিত হচ্ছে ন্যায্য হিস্যা থেকে,ব্যাহত হচ্ছে শিল্পসম্পর্ক। বিভিন্ন অযুহাতে আইন-কানুনের দোহাই দিয়ে প্রসাশন পুড়িয়ে দিচ্ছে জেলেদের জাল, ভেঙে দিচ্ছে রিক্সাওয়ালার রিক্সা যা তাদের জীবিকার একমাত্র উপকরণ! বছরের পর বছর একই কর্মক্ষেত্রে একই কাজ করলেও শ্রমিকের চাকুরি স্থায়ী হয় না। ন্যূনতম নাগরিক সেবার ব্যবস্থা না করেই গড়ে তোলা হচ্ছে শিল্পাঞ্চল। বড় বড় দুর্ঘটনায় শ্রমিকের প্রাণ যাচ্ছে, অথচ বিচার নেই এসব অবহেলাজনিত মৃত্যুর, ক্ষতিপূরণের পরিমাণও শ্রমিকের জীবনের সাথে এক বিরাট প্রহসন মাত্র। বৈষম্য ছড়িয়ে পড়েছে মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অনেক ক্ষেত্রে। অভিবাসী শ্রমিক, নারী শ্রমিক, আদিবাসী শ্রমিক, প্রতিবন্ধি শ্রমিক বঞ্চিতদের মধ্যেও আরও বঞ্চিত। ঐতিহ্যবাহী ও প্রতিষ্ঠিত শ্রমখাতগুলো বন্ধ হচ্ছে ধীরে ধীরে। জাতীয় পর্যায়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। রাষ্ট্র ও সমাজে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকের মর্যাদা ইত্যাদি তলানিতে এসে ঠেকেছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে সস্তা শ্রমের দেশ হিসেবে।

শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা একটি গতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এই সত্যকে উপেক্ষা করার যে সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামো আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছে তার আমূল সংস্কার ব্যতীত বৈষম্যহীন সমাজ এবং মর্যাদাকর বাংলাদেশ নির্মাণ অসম্ভব। এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশে শ্রমজগতের রূপান্তর করতে হলে কমিশনের প্রতিটি সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ আমাদের ব্যবসা, কাজের ধরণসহ শ্রমজগতে প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তা মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। জাতিসংঘ, আইএলও এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসেবে, আন্তর্জাতিক শ্রমমানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে, টেকসই লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে, সর্বোপরি আগামীতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ব্যাবসা, মানবাধিকার ও পরিবেশ সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা পরিপালনে আমাদেরকে শ্রমজগতের খোলনলচে পরিবর্তন করতে হবে। একটি দক্ষ উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি গড়েতোলার জন্য প্রয়োজন জাতীয় পরিকল্পনা, উদ্ভাবনীময় উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য চাই শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পের সম্মিলিত প্রয়াস। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে দরকার ব্যবসাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা। সরাদেশে বিভিন্ন মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমরা শ্রমিকদের সমস্যা ও বঞ্চনার পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসার বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার কথা জানতে পেরেছি। কর্মসংস্থান, উন্নত অর্থনীতি এবং মর্যাদাকার শিল্পের দেশ গড়তে হলে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দক্ষ শ্রমশক্তি ও তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টি তার মধ্যে অন্যতম।

আমরা বিশ্বাস করি, এই সুপারিশমালা একদিকে যেমন আট কোটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে পথ দেখাবে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিকারের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা তৈরি করবে, ঠিক তেমনি কারখানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত একটি সামাজিক সংলাপের কার্যকর সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে যা শ্রমজগতের জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল অংশীজনকে একত্রিত করে সকলের আকাঙ্ক্ষিত শ্রমজগত বিনির্মাণ করবে এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক জাতীয় শিল্প গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণ, টেকসই ও গতিশীল শিল্প, সুসমন্বিত শিল্প-সম্পর্ক, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও ন্যায্য হিস্যা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারখানা, শিল্প ও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যবসার বাধা দূর করে জাতীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি কমিশন জোর দিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রত্যাশা থাকবে, সুনির্দিষ্ট কিছু স্বল্পমেয়াদি ও অগ্রাধিকারভিত্তিক সংস্কার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়কালেই যেন শুরু করা হয়, যা পরবর্তী নির্বাচিত সরকার এগিয়ে নিয়ে যাবে। একই প্রত্যাশা আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নীতিনির্ধারকদের কাছে।

কমিশন প্রস্তাবিত 'জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম' গঠনের মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, প্রণীত হতে পারে জাতীয় সংস্কারের পথ নকশা।

আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি, শ্রম অধিকার শক্তিশালী করার মাধ্যমেই বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাকর ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব। আমরা সেটা পারব, আমাদেরকে পারতে হবে।

‘এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা- এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা-...’

‘শ্রমজগতের রূপান্তর-রূপরেখা’ শতবর্ষেরও বেশি আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ‘মূক মূখের ভাষা’ তুলে আনার চেষ্টা করেছে। সকলে মিলে এই রূপরেখা এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আমরা আট কোটি শ্রমজীবী মানুষ ও তার পরিবারকে আশাবাদী করতে পারি, গড়ে তুলতে পারি একটি মর্যাদাকার বাংলাদেশ।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ
প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন।

সূচি

কৃতজ্ঞতা ১৫
শব্দ সংক্ষেপ ১৬
প্রস্তাবনার সামগ্রিক প্রতিফলন ১৮

১. ভূমিকা ২২
১.১ প্রেক্ষাপট ২২
১.২ উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি ২৪
১.৩ কর্মপদ্ধতি, টেকনিকাল কমিটি পরিচিতি ও অংশীজন পরিচিতি ২৬
১.৪ রিপোর্টের বিভিন্ন ভাগ পরিচিতি ২৭

২ শ্রম সংস্কার প্রস্তাবনা কাঠামো ২৮
২.১ সংস্কার কাঠামোর ভিত্তি ২৮
২.২ সংস্কার নীতি ৩০
২.৩ সুপারিশ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় ৩১
২.৪ সংস্কার প্রস্তাবনার বিষয়ভিত্তিক কাঠামো ৩৩
২.৫ প্রস্তাবনার মূল কাঠামো ৩৪

৩. বিষয়ভিত্তিক মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবনা ৩৬
৩.১ কাজ ও পেশার স্বীকৃতি, কাজের অধিকার, সুযোগ, দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং নিশ্চয়তা ৩৬
৩.২ মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা ৫২
৩.৩. নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা ৬০
৩.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ৭৪
৩.৫ সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি ৮২
৩.৬ শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার ৯০
৩.৭ সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং অন্তর্ভুক্তি ১০৭
৩.৮ শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম ১০৭

৪. শ্রমখাত সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রস্তাবনা ১১২
৪.১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১১২
৪.১.১ শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর ১১৩
৪.১.২ শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর ১১৩
৪.১.৩ দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তর ১১৩
৪.১.৪ শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর ১১৪
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ১১৬
কেন্দ্রীয় তহবিল…………১১৬
৪.১.৫ অনুবিভাগ ১১৬
গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ: ১১৭
শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই) ১১৭
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI) ১১৭
অভিবাসী শ্রমিক অনুবিভাগ ১১৮
৪.১.৬ বিশেষ সুপারিশ ১১৮
৪.১.৭ জবাবদিহিতা, অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা ১১৮
জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি ১১৮
জাতীয় স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন ১১৯
৪.১.৮ ত্রিপক্ষীয় কার্যক্রম ও কাঠামোসমূহ জোরদার ১১৯
৪.১.৯ জাতীয় মজুরি কমিশন ১১৯
নিম্নতম মজুরি বোর্ড ১২০
স্থায়ী মজুরি কমিশন ১২০

৫. বিশেষ ইস্যুভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা ১২১
৫.১ ব্যবসা ও মানবাধিকার প্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ ১২১
৫.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও ন্যায্য রূপান্তর ১২৩
৫.৩ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরকারি ক্রয় ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি ১২৬

৬ বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীদের অধিকার ও কল্যাণে সংস্কার প্রস্তাবনা **১২৮**
৬.১ লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রান্তিক শ্রমগোষ্ঠী........১২৮
৬.১.১ নারী শ্রমিক........১২৮
৬.১.২ তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠী........১৩১
৬.১.৩ যুব শ্রম জনগোষ্ঠী........১৩২
৬.১.৪ প্রবীণ শ্রম জনগোষ্ঠী ১৩২
৬.১.৫ আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী........১৩৩
৬.১.৬ প্রতিবন্ধী শ্রম জনগোষ্ঠী ১৩৪
৬.১.৭ অভিবাসী শ্রমিক ১৩৫
৬.১.৮ পরিচ্ছন্নতাকর্মী/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শ্রমিক/দলিত জনগোষ্ঠী ১৪২
৬.১.৯ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ১৪৩

৬.২ কৃষিভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী........১৪৩
৬.২.১ কৃষি শ্রমিক........১৪৩
৬.২.২ চাতাল/রাইস মিল শ্রমিক........১৪৪
৬.২.৩ চা শ্রমিক........১৪৫

৬.৩ রপ্তানিমুখি শিল্প ও এলাকাভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী ১৪৫
৬.৩.১ গার্মেন্টস (তৈরি পোশাক) খাতের শ্রমিক ১৪৫
৬.৩.২ চিংড়ি শিল্প শ্রমিক ১৪৭
৬.৩.৩ ট্যানারি শ্রমিক ১৪৭
৬.৩.৪ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রমিক ১৪৮
৬.৩.৫ ডক/বন্দর শ্রমিক........১৪৯

৬.৪ শিল্পভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী........১৫০
৬.৪.১ রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ কারখানা........১৫০
৬.৪.২ জাহাজ ভাঙা শিল্প ১৫১
৬.৪.৩ ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প শ্রমিক ১৫২
৬.৪.৫ ফার্নিচার শ্রমিক........১৫৩
৬.৪.৬ পাথরভাঙা শ্রমিক ১৫৩

৬.৫ সেবাখাতভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী........১৫৪
৬.৫.১ রেলওয়ে শ্রমিক........১৫৪
৬.৫.২ নৌযান শ্রমিক........১৫৫
৬.৫.৩ পরিবহণ........১৫৫
৬.৫.৪ রিকসা/ব্যটারি রিকসা-ইজিবাইক/ভ্যান চালক........১৫৬
৬.৫.৫ নিমার্ণ শিল্প শ্রমিক ১৫৭
৬.৫.৬ বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত ১৫৮
৬.৫.৭ হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ১৫৯
৬.৫.৮ গৃহ শ্রমিক........১৬০
৬.৫.৯ পরিচর্যা কর্মী (কেয়ার ওয়্যাকার্স)........১৬০
৬.৫.১০ বিউটি পার্লার কর্মী........১৬১
৬.৫.১১ কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিক........১৬১
৬.৫.১২ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্মী ১৬২

৬.৬ পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী ১৬৩
৬.৬.১ সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মী........১৬৩
৬.৬.২ মৎস্যজীবী ও জেলে শ্রম জনগোষ্ঠী........১৬৪
৬.৬.৩ হকার্স/শহর অঞ্চলে স্বনিয়োজিত শ্রম জনগোষ্ঠী........১৬৬
৬.৬.৪ মার্কেট/দোকান কর্মচারী........১৬৬
৬.৬.৫ দপ্তরি/প্রহরী........১৬৭
৬.৬.৬ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মী........১৬৮

৬.৭ বিশেষ নিয়োগের ধরনের ভিত্তিতে শ্রমিক ১৬৯
৬.৭.১ আউটসোর্সিং শ্রমিক ১৬৯
৬.৭.২ রাইড শেয়ারিং/গিগ/প্লাটফর্ম ইকনোমির শ্রমিক ১৬৯
৬.৭.৩ গৃহভিত্তিক শ্রমিক..১৭০

৭ বিশেষ প্রস্তাবনা..১৭২
৭.১ শ্রম শক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত্র গবেষণা ও শিক্ষা ১৭২
৭.২ বাজেট বরাদ্দ...১৭২
৭.৩ শ্বেতপত্র প্রস্তুত ১৭২

সংযুক্তি ১.৩.১: টেকনিকাল কমিটির সদস্যদের তালিকা ১৭৩
সংযুক্তি ১.৩.২: সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা ১৭৭
সংযুক্তি ১.৩.৩: দাবিনামা ও লিখিত মতামত প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা.. ১৮০
সংযুক্তি ৪.৩: শ্রমিক, মালিক, পেশাজীবী, শ্রম ও মানবাধিকার সংগঠন ও শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভার তালিকা.........১৮৪

কৃতজ্ঞতা

জুলাই '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান রেখে শ্রমিকের অধিকার এবং জীবনমান উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন এবং এই কমিশনের দায়িত্ব প্রদানের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে কমিশন সদস্যগণের সার্বিক তত্ত্বাবধান, গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী টিম, বিষয়ভিত্তিক টেকনিক্যাল টিম ও বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সর্বোচ্চ অবদান এবং পরিশ্রমের ফসল এই প্রতিবেদন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সেই সকল অংশীজনের প্রতি, যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময়, পরামর্শ, মতামত ও সহায়তা দিয়ে প্রতিবেদন তৈরিসহ কমিশনের কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ, সেক্টর ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফেডারেশনসমূহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, মালিক সংগঠনসমূহ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার সংগঠন, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক, আইনজীবী, পেশাজীবী এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাদের কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিভিন্ন অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের গঠনমূলক আলোচনা ও উপস্থিতি এই প্রতিবেদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত অধিদপ্তরসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সাচিবিক সহায়তা এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠনসমূহের কমিশনের সাচিবিক কার্যক্রমে সহায়তা; গবেষণা, প্রতিবেদন ও বিভিন্ন কার্যকারী দলিল প্রদানসহ সকল কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সভার আয়োজনসহ সার্বিক সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীসহ- সকলকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা।

দীর্ঘ পাঁচ মাস নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রস্ততির জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই গবেষণা ও প্রতিবেদন কমিটি, বিভিন্ন টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যগণ এবং কমিশনের কাজে নিয়োজিত সাচিবিক টিমকে (নাম সংযুক্ত)। তাঁদের দায়িত্বশীলতা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই প্রতিবেদনটি একটি কার্যকরী দলিল হিসেবে রূপ নিয়েছে।

এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় গণমাধ্যম আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তারা একদিকে শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর কমিশনের কাছে তুলে ধরেছেন, অপরদিকে কমিশনের কার্যক্রম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞে অবদান রাখা সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, এই সুপারিশমালা বাস্তবায়ন হলে, দেশের শ্রমিকসমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক শ্রম পরিবেশ গড়ে উঠবে এবং সুষম শিল্প-সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষের জীবনমান ও জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(কমিশনের কাজে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত সকল ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা কমিশন কৃতজ্ঞতার সাথে মূল প্রতিবেদনে সংযুক্ত করেছে।)

শব্দ সংক্ষেপ

ADR	অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজোলিউশন
AI	আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স
BAIRA	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস
BANBEIS	বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস
BBS	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস
BEF	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
BEPZA	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি
BIDA	বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
BILS	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
BLA	বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট
BLR	বাংলাদেশ লেবার রুলস
BMET	ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং
BNQF	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক
BNSK	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
BOESL	বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
BTEB	বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড
CBA	কলেক্টিভ বার্গেইনিং অ্যাগ্রিমেন্ট/ এজেন্ট
CBLM	কমপিটেন্সি বেইজড লার্নিং মেটেরিয়ালস
CEDAW	কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট ওমেন
CRC	কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড
CRPD	কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজএবিলিটিজ
CSDDD	কর্পোরেট সাসটেইনাবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্স ডিরেকটিভস
DEMO	ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ম্যানপাওয়ার অফিস
DIFE	ডিপার্টমেন্ট অব ইনস্পেকশন ফর ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্টস
DoL	ডিপার্টমেন্ট অব লেবার
DWCP	ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রামস
EIS	এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম
EOBI	এমপ্লয়িজ ওল্ড-এজ বেনিফিটস ইনস্টিটিউশন
EPZ	এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন
ESDO	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
ESRM	এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট
ETI	এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ
EU	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
FAO	ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন
GBVH	জেন্ডার-বেইজড ভায়োলেন্স অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট
GIZ	জার্মান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি
GoB	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
GRM	গ্রিভেন্স রিড্রেসাল মেকানিজম
GRS	গ্রিভেন্স রিড্রেসাল সিস্টেম
GSI	গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স
GSP+	জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স প্লাস
HRDD	হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স
IBC	ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল
ICCPR	ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস
ICESCR	ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস
ICLS	ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব লেবার স্ট্যাটিস্টিশিয়ানস
ICT	ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি

ILO	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
IMT	ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি
IRI	ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইনস্টিটিউট
ISU	ইন্ডাস্ট্রিয়ল সেইফটি ইউনিট
ITPs	ইন্ডিজেনাস অ্যান্ড ট্রাইবাল পিপলস
LDC	লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি
LEED	লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন
LFS	লেবার ফোর্স সার্ভে
LIMA	লেবার ইনস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন
LIMS	লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
MoLE	মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট
NAP	ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান
NEET	নট ইন এমপ্লয়মেন্ট, এডুকেশন, অর ট্রেনিং
NEP	ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট পলিসি
NID	ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড
NIPSOM	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন
NOSHTRI	ন্যাশনাল অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট
NSDA	ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
NSDP	ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পলিসি
OECD	অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
OMS	ওপেন মার্কেট সেল
OSH	অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ
OSHA	অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
PPE	পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট
PPP	পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ
QWRS	কোয়ার্টারলি ওয়েজ রেট সার্ভে
RBC	রেসপন্সিবল বিজনেস কনডাক্ট
RMG	রেডিমেড গার্মেন্টস
SCDDA	সাপ্লাই চেইন ডিউ ডিলিজেন্স অ্যাক্ট
SDGs	সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস
SEZ	স্পেশাল ইকোনমিক জোন
SOP	স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর
STEM	সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যান্ড ম্যাথেমেটিকস
TCC	ট্রাইপার্টাইট কনসালটেটিভ কাউন্সিল
TTC	টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার
TVET	টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং
UDHR	ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস
UNCRPD	ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজএবিলিটিজ
UNGC	ইউনাইটেড নেশনস গ্লোবাল কমপ্যাক্ট
UNGPs	ইউনাইটেড নেশন্স গাইডিং প্রিন্সিপলস অন বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস
WARBE	ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য রাইটস অব বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্টস
WEF	ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম
WHO	ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন
WRI	ওয়েজ রেট ইনডেক্স
WSUP	ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন ফর দ্য আরবান পুওর
WWA	ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন
WWF	ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড

প্রস্তাবনার সামগ্রিক প্রতিফলন

সংবিধান নির্দেশিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের সকল প্রকার শোষণ মুক্তি। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার সুনিশ্চিত হবে। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২৪ এর জুলাইয়ের রক্তঝরা ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে একটি বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাকর স্থানে প্রতিষ্ঠা করা। এই জনআকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ গঠন করেন 'শ্রম সংস্কার কমিশন'। স্বাধীনতার ৫৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম গঠিত এই কমিশন মনে করে, বাংলাদেশের শ্রমজগতে বিরাজমান বৈষম্য মোকাবেলায় শ্রম, শ্রমিক ও তাঁর অধিকারকে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিবেচনায় না রেখে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

শ্রমজীবীর নাগরিক অধিকার, জীবন-জীবিকার মর্যাদা, সমঅধিকার, প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ও বৈষম্যবিরোধী সুযোগ নিশ্চিতের লক্ষ্যে শতাধিক অংশীজনের সাথে মতবিনিময়ে সমন্বিত হয়েছে এই সুপারিশ। কমিশন মনে করে, বাংলাদেশে শ্রমিকের অধিকার ও মঙ্গল নিশ্চিতকরণে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে কর্মসংস্থান, শিল্পের উৎপাদনশীলতা-বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তর। তাই এটি শুধু শ্রমিকের নয় সমগ্র দেশ ও দশের স্বার্থেই জরুরি। শ্রমিকের অধিকার বাংলাদেশের সাংবিধানিক অধিকারের অংশ। তেমনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে শ্রমমানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এদেশের অঙ্গীকারের অংশ। এর জন্য রাষ্ট্রের নীতি-আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ-বাস্তবায়ন, সর্বজনীনতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির অনুসরণ অন্যতম প্রয়োজনীয় কাজ। লক্ষ্যভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার, শিল্প বিকাশ ও উন্নয়নের সুফলে শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতের মাধ্যমেই বৈষম্যহীন-মর্যাদাকর বাংলাদেশ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করছে।

সমন্বিত মতের ভিত্তিতে তৈরি সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের অধিকারসমূহ আইন দ্বারা সুরক্ষিত ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে কমিশন সুপারিশ করছে। একইসাথে সুপারিশ করছে কার্যকর বাস্তবায়নে আইনানুগ স্বীকৃতি, কাঠামোগত উন্নয়ন ও লঙ্ঘন প্রতিকারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রকে ভূমিকা নিতে। এ লক্ষ্যে, কমিশনের সামগ্রিক সুপারিশের মূল দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

১.১ **সকল শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা ও স্বীকৃতি:** প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহ ভিত্তিক, অভিবাসী, স্বনিয়োজিত শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

এই লক্ষ্যে, কাজের স্বীকৃতি ও পরিচয়পত্র, নিরবচ্ছিন্ন কাজ এবং আয়ের নিশ্চয়তা, মর্যাদাকর-শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে এবং চাকরির অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অস্থায়ী ও এজেন্সিনির্ভর নিয়োগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক) নিজের ও পরিবারের মর্যাদাকর জীবনযাপন উপযোগী ন্যায্য মজুরি (লিভিং ওয়েজ), উন্নয়নে ন্যায্য অংশীদারিত্ব ও হিস্যা প্রাপ্তির অধিকার;

খ) প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ কাজ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, দুর্ঘটনায় যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং নিজের ও পরিবারের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার;

গ) প্রত্যেকেরই অবসর, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা, মাতৃত্বকালীন বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা প্রাপ্তি এবং কোনও না কোনও সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমে অন্তর্ভুক্তি;

ঘ) প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত হওয়া, সমষ্টিগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করার ও অধিকার লঙ্ঘণে অভিযোগ জানানো, প্রতিকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা;

এই অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণে, সরকার কর্তৃক দেশের সংবিধান, আইএলও কনভেনশন এবং কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, শোভন কাজের মানদণ্ড এবং মানবাধিকার ও ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার আলোকে যথাযথ ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্তমান শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় ও মৌলিক সংস্কার অথবা একাধিক আইন প্রণয়ন করা, এবং কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.২ **মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় এবং খাতভিত্তিক মজুরি নিশ্চিতকরণ:** শ্রমিক ও তার পরিবারের মর্যাদাকর জীবনযাপন উপযোগী মজুরির অধিকার নিশ্চিতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরির মানদণ্ড স্থির করা এবং জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা। একইসাথে, মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নয়ন, বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কাঠামোগত সংস্কারে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করা। জাতীয় ও খাতভিত্তিক মজুরি তিন বছর পর পর মূল্যায়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি এবং মর্যাদাপূর্ণ মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

১.৩ **নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ:** শ্রমিকের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার আইনি অধিকার নিশ্চিত করা। খাত ও পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করা। দুর্ঘটনায় বা অবহেলাজনিত নিহত-আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড পুনর্মূল্যায়ন করা। একইসাথে, মর্যাদাপূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে মানদণ্ড ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।

১.৪ **শ্রমিকসহ শ্রমশক্তি নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্যভাণ্ডার গঠন:** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, স্ব-নিয়োজিতসহ সকল শ্রমিকের পেশাগত ও আইনি সুরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেয়া। এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জরুরি ভিত্তিতে 'জাতীয় শ্রমশক্তি নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্য ভাণ্ডার' গড়ে তোলা।

১.৫ **সংগঠন ও দরকষাকষি অধিকার:** সংগঠিত হবার অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র কর্তৃক মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে কার্যকর করা। ট্রেড ইউনিয়ন শর্ত শিথিল করে সংগঠন করার অধিকার বিস্তৃত করা। দরকষাকষির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো নিশ্চিত করা।

১.৬ **জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ :** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্তঅধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা-সমন্বয় জোরদারে সরকারি (শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন-আইআরআই, নসট্রি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান) ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বত্র জবাবদিহিতা, গণতান্ত্রিক চর্চা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় সংস্কার করা।

১.৭ **স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন :** জবাবদিহিমূলক শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন প্রয়োজন। স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে অবিলম্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি 'জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম' গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১.৮ **কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ:** দেশে বিরাজমান বেকারত্ব রোধ এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রসারে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা। একইসাথে, অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং উদ্ভূত সুযোগ কাজে লাগাতে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পথনকশা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া; এক্ষেত্রে, শ্রমের যথাযথ ব্যবহার, উৎপাদনশীল যুব শ্রমশক্তি ও উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

১.৯ **সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা:** সকল শ্রমিকের সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রাপ্তির (কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা-অবসর, মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা) সুযোগ নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। শ্রমিকদের সমস্যার ভিন্নতা ভিত্তিতে কোনও না কোনও নিরাপত্তা স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এক্ষেত্রে আইএলও'র জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন, সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১.১০ **সম-অধিকার নিশ্চিত এবং সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণ:** নারী-পুরুষ, অন্যান্য লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীভেদে মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসহ শ্রমখাতের সর্বত্র বৈষম্য নয়- সম–অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা। আর, পাহাড়ে-সমতলে আদিবাসী ও বহুজাতির জনগোষ্ঠীর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

১.১১ **যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ:** যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতা বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করা; একইসাথে, জরুরিভাবে অভিযোগ সেল ও নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা। আইএলও কনভেনশন **১৯০** অনুসমর্থন করা।

১.১২ **সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা :** সকল নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাস করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারের সহায়তা প্রদান ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্কিম প্রণয়ন করা।

১.১৩ **শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধ ও নিরাপত্তা:** শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধে সরকার কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আগাম দাদন দেয়াসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে জবরদস্তিমূলক সকল পথ বন্ধ করায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

১.১৪ **সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ চর্চা:** সুসমন্বিত-সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে শ্রমিক-নিয়োগকারী সহ সকল পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ এবং কার্যকর সংলাপের কাঠামো ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

১.১৫ **সুষ্ঠু শ্রম আদালত, ন্যায়বিচার ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :** শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও অযথা হয়রানি বন্ধে সরকার কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া। আইনের অধিকার লঙ্ঘন প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কাঠামো নিশ্চিত করা। বিরোধ নিষ্পত্তি ও আইনানুগ প্রাপ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ ও বলপ্রয়োগ বন্ধ করা। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে তা দ্রুত পর্যালোচনা সাপেক্ষে বাতিল করা।

১.১৬ **মর্যাদাপূর্ণ-হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ ও আদালতে বাংলাভাষার প্রচলন করা:** মর্যাদাপূর্ণ শ্রমপরিবেশের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতিভেদে অবমাননাকর ও অমর্যাদাকার ক্ষমতাকেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহার রোধ করা। শ্রম আইনে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে 'নারী' ব্যবহার করা। কর্মপরিবেশে শ্রেণিক্ষমতায় তুই-তুমি সম্বোধন চর্চা বন্ধ করা। শ্রম আদালতের শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল থেকে হাইকোর্ট ও অ্যাপিলেট ডিভিশন পর্যন্ত সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন করা।

১.১৭ **সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বে নারী-পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:** শ্রম সংশ্লিষ্ট নীতি, বাৎসরিক বাজেট এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনসহ বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ-বাস্তবায়নে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিক ও তার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং জাতীয় সংসদসহ সকল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে/ফোরামে সংঘবদ্ধ শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে সরকারের নীতি প্রণয়ন করা।

১.১৮ **আপদকালীন তহবিল গড়ে তোলা ও বিদ্যমান তহবিলের স্বচ্ছতা:** দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, ব্যবসায় আকস্মিক সংকটের কারণে শ্রমিকের মজুরি ও অন্যান্য প্রাপ্তি লাভ এবং উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জরুরি ও আপদকালীন তহবিল গঠন করা। এছাড়া, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

১.১৯ **শ্রমিক ইতিহাস-ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা ও স্মৃতিসৌধ গঠন:** শ্রমিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর গঠনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা কোর্স ও মিডিয়ায় শ্রমের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও শ্রমিকের জীবনগাঁথা মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা।

১.২০ **শহীদ স্বীকৃতি, পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও ন্যায়বিচার:** চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনে নিহত সকল শ্রমিককে রাষ্ট্র কর্তৃক শহীদের স্বীকৃতি প্রদান করা। এছাড়া, শ্রমখাতে দুর্ঘটনা বা অবহেলাজনিত নিহতদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের পুনর্বাসন, চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রীয় যথাযথ নীতি গ্রহণ করা। একইসাথে, রানাপ্লাজা, তাজরিন গার্মেন্টস, এবং হাসেম ফুডসহ উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে দায়ীদের দ্রুত বিচার ও শাস্তির আওতায় আনা।

১.২১ **টেকসই শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন:** জাতীয় শিল্পের করা বিকাশ, শিল্পায়ন ও টেকসই ও শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা, উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য কর্তৃক ব্যাপক ও পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সামাজিক ব্যবসার প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করা । এ লক্ষ্য আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন এবং শিল্পও দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা।

১.২২ **শিল্পাঞ্চল ও শ্রমঘন এলাকায় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা:** শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য শিল্পাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে এই সুবিধা (শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিমা, সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, গ্যাস বিদ্যুৎ-পানির যথাযথ সরবরাহ ও অন্যান্য) যাতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত হয় তার উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে বাংলাদেশ সার্বিকভাবে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

১.২৩ **জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিবেচনায় কর্মপরিবেশ গঠন:** জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিবেচনায় শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলায় সরকার ভূমিকা নেবে। এ সংক্রান্ত দেশীয় পরিবেশ বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পরিপালনে মনোযোগী হওয়া।

১.২৪ **অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা:** সকল অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে রাষ্ট্রী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে, অভিবাসী শ্রমিকের স্বীকৃতি, সংগঠিত হওয়া এবং প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে দেশীয়-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করা।

১.২৫ **শ্রম বিষয়ক গবেষণা ও জরিপ:** শ্রমশক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার কর্তৃক আলাদা বিভাগ গঠন করা।

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের সকল প্রকার শোষণ মুক্তি। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার সুনিশ্চিত হবে। শ্রম অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে মর্যাদাপূর্ণ শ্রমপরিবেশ গড়ে তোলার গণতান্ত্রিক পথনির্দেশক প্রস্তাবনা তৈরিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন।

শ্রমিকশ্রেণির প্রতি চলমান মর্যাদাহীনতা, বঞ্চনা ও বৈষম্য এবং দীর্ঘ উপেক্ষা ও অবহেলা থেকে উত্তরণের যে জন-আকাঙ্ক্ষা এবং বিপুল শ্রমশক্তির অংশগ্রহণে টেকসই শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার যে অপার সুযোগ ও সম্ভাবনা– সে সব আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই "শ্রম জগতের রূপান্তর-রূপরেখা" শীর্ষক প্রতিবেদনটি কমিশনের সুপারিশ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

সাড়ে সাত কোটি শ্রমজীবী মানুষের দেশ বাংলাদেশ। দেশের অর্থনীতি মূলত শ্রমভিত্তিক। কৃষিপ্রধান এই দেশে কৃষিভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। উৎপাদন খাতের পাশাপাশি অভিবাসন শ্রমখাতও বাংলাদেশের জন্য অতীব সম্ভাবনাময় একটি খাত। শ্রম ও শিল্পখাতের এই বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, শ্রমিকের ন্যায়ানুগ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় ভূমিকা, শিল্পের বিকাশের অনুকূল ও সহায়ক নীতি-পরিকল্পনা আবশ্যক। বর্তমান সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদা, সুযোগ ও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হবে সঠিক পথনির্দেশ।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস– লিঙ্গ, বয়স, জাতি, ধর্ম, ভাষা ও পেশা নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের দীর্ঘ গনপ্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের ইতিহাস। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৬'র স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান এবং গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সহ গণতান্ত্রিক সব সংগ্রামেই শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য।

৯০'র গণঅভ্যুত্থান থেকে ২০২৪-এর জুলাই – শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এগিয়েছে। ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে যুক্ত হয়েছেন রিকশাওয়ালা, দিনমজুর, দোকান কর্মচারী, গৃহশ্রমিক, গার্মেন্টস সহ অন্যান্য কারখানা ও প্রবাসী শ্রমিক, আছে শত শত শহীদের হাজারো স্বজনের বিক্ষত দেহ-মন। এই ত্যাগ নূতন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পাটাতন তৈরি করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের সামনে এনে দিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি চলমান বৈষম্যের ন্যায্য ও মানবিক রূপান্তরের সুযোগ।

বাংলাদেশ শ্রমজগতের ঐতিহাসিক রূপান্তরের প্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা

রাষ্ট্র এখনও দেশের সকল শ্রমিকের জন্য আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি; অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত দেশের প্রায় ৮৫% শ্রমিকই আইনের বাইরে রয়ে গেছে। বাংলাদেশে এখনও 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরি' নেই। ৮৫ ভাগ শ্রমিক, যারা শ্রম আইনের বাইরে, তাদের মজুরির কোনও মানদণ্ড নেই। কম মজুরি ও মজুরিবৈষম্যের কারণে তীব্র হয়ে উঠেছে আয়বৈষম্য। স্থায়ী কাজের বিপরীতে আউটসোর্সিং কর্মী নিয়োগের কারণে সরকারি চাকরিতে প্রান্তিক শ্রমজীবীদের প্রবেশের সুযোগ বন্ধ হয়েছে। সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অভাব রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য নেই পর্যাপ্ত বা বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ও হাসপাতাল। নেই আহত বা নিহত শ্রমিকদের জন্য বিমা ব্যবস্থা। কর্মজীবন শেষে শ্রমিকের দেখভাল করার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। নারীদের সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা না থাকায় শ্রমখাত থেকে ঝরে পড়ছে দক্ষ ও সম্ভাবনাময় নারী শ্রমিকরা। বিভিন্ন শ্রমখাতে অটোমেশনের কারণে চাকরি ও নিয়োগ কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি ও অন্যান্য শ্রমিকের জীবনে নতুন সংকট নিয়ে আসছে। অ্যাপভিত্তিক সেবার বিভিন্ন শ্রমখাত, যেমন খাদ্য ও পণ্য সরবরাহের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে দেশজুড়ে কোনও প্রকার আইনি স্বীকৃতি ও

সুরক্ষা ছাড়াই। অ্যাপ ভিত্তিক সেবা খাতের সময় ও টার্গেট-পূরণ ভিত্তক কাজ গিগ শ্রমিকদের জীবন অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। শ্রমখাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা এবং সক্ষম শ্রমশক্তির জন্য উপযুক্ত মজুরিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আজ জাতির সামনে উদ্ভাসিত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের যে উদ্যোগ আজ রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার হিসেবে গৃহীত এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ – সে সব ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জীবনধারণের উপযোগী মজুরি প্রাপ্তি, মর্যাদাপূর্ণ ও শোভন কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষা, উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি, সকল প্রকার হয়রানি থেকে নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা, দেশে-বিদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা, অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্বক শ্রমখাতকে অসন্তোষমুক্ত ও উৎপাদনশীল করা জরুরি। শ্রমিকের ন্যায্য আন্দোলনকে শ্রমিক অবান্ধব আইন ও আইন-বহির্ভূত কৌশলে 'অবৈধকরণ' এবং দমনের অজস্র উদাহরণ আছে বিগত সময়ে- এই চর্চা থেকে বের হয়ে আসা একান্ত জরুরি। শ্রমিকের অধিকার আন্দোলন শিল্প বিকাশের অন্তরায় নয়। শ্রমিকের সংঘটিত হওয়া ও শ্রম সঙ্ঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) এবং যৌথ দর-কষাকষি উৎসাহিতকরণ সুষ্ঠ শিল্প সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক। বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম যোগানদাতা প্রবাসী শ্রমিকদের 'রেমিটেন্স যোদ্ধা' বললেও বিদেশে তাদের 'অড জব' বা কম মজুরির বিপদজনক কাজ থেকে সুরক্ষিত রাখার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যথাযথ নয়। রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে দেশের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধাবিঘ্ন দূর করা যেতো সহজেই।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিসরে শ্রমিকদের প্রতি মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন নীতিকাঠামোতে শ্রমজীবী বা মধ্যবিত্ত সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণ, কর্ম ও পেশা উপযোগী দক্ষতা তৈরির প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োজন। ভোকেশনাল ও পলিটেকনিক শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন দরকার। বৈষম্য পুনরুৎপাদনকারী সকল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি। প্রয়োজন শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান তৈরির শিক্ষা।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণ ও জবাবদিহিতা

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা বিমার আওতাভুক্ত করা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ চর্চা অপ্রতুল এবং সকল কর্মক্ষেত্রে নেই। শ্রমখাতে জবাবদিহিতার চর্চাও অসম। তৈরি পোশাক শিল্পে জবাবদিহিতার যে চাপ তৈরি হয়েছে তা অন্য আর কোনও শিল্পে নেই। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি দপ্তরসমূহে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার ব্যাপক ঘাটতি আছে। আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিধি একে অপরের সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশ শ্রমনীতিতে কৃষি, অকৃষি অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক শ্রমখাতের কথা বলা হলেও আইন তৈরি করা হয়নি। এমনকি বাংলাদেশ স্বাস্থ্যনীতিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার: শ্রম নীতি, আইন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাঠামো

বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে'র আলোকে জাতীয় শ্রম নীতি, আইন ও পরিকল্পনা প্রণীত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম ও মানবাধিকার সংক্রান্ত যে সব আন্তর্জাতিক কনভেনশন স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে, সে সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন প্রণয়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে জবাবদিহিতা করতে দায়বদ্ধ। শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় আইন এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন কাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন ও যুগোপযোগী পরিবর্ধন জরুরি। বাংলাদেশের শ্রমশক্তিকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগী, দক্ষ ও সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং জবাবদিহিতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ জরুরি।

শ্রম জগতে বিদ্যমান অসমতা কেবল কার্যকর আইনি ব্যবস্থার অভাব নয় বরং নীতি নির্ধারকদের 'রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির' প্রয়োজন। সারাদেশের সকল শ্রমজীবী মানুষ শ্রম আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' দেশের সকল শ্রমজীবীর জন্য প্রযোজ্য নয়। সিংহভাগ শ্রমিকই রয়ে গেছে আইনের

আওতার বাইরে। ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য প্রণীত হয়েছে 'ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' যা একই দেশে দুই আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে সৃষ্টি করছে আন্তঃবৈষম্য।

শ্রমজীবীদের মুক্তির লক্ষ্যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার

স্বাধীনতার পাঁচ দশকে সংবিধান নির্দেশিত অঙ্গীকারের আলোকে রাষ্ট্র সব নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনি। স্ব উদ্যোগে যারা কর্মসংস্থান খুঁজে নিয়েছে তাদের জীবনধারণ উপযোগী মজুরির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। কৃষকের ফসল উৎপাদনে পুঁজি ও কারিগরি সহায়তা এবং কৃষিপণ্য নির্ভর শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মসংস্থানের বিকাশ হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, কৃষি শ্রমিক ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের জীবনধারণ ও মৌলিক চাহিদা পূরণ কিংবা উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমের পরিকল্পিত ব্যবহার নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগের অভাব আছে। সকলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাগরিক সৃষ্টির অঙ্গীকার থাকলেও, বিদ্যমান অসম শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রমিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানদের বিকাশ বাঁধাগ্রস্থ হয়ে চলেছে।

শ্রমখাতে রাজনৈতিক প্রভাবের ফল, শিল্প সম্পর্কের ব্যত্যয় ও ব্যাহত গণতন্ত্র

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে স্বাধীনতার পর থেকে নীতি ও আইন প্রণয়নে শ্রমিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়া এবং রাজনৈতিক দলসমূহে ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী, বড় শিল্পপতিদের প্রাধান্য ও প্রভাবে রাষ্ট্র তার মূল অঙ্গীকার ও প্রস্তাবনা থেকে সরে এসেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করার বদলে ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও অবস্থানের ওপর নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিল্প খাত।

শ্রম সংস্কার কমিশনের এই সুপারিশ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে, একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণে শ্রম জগতের এমন একটি অধিকারভিত্তিক রূপান্তর প্রস্তাবনা যেখানে শ্রমিকদের যেন আর কারও অবহেলা ও দয়ার মধ্যে চলতে না হয় তার পথনির্দেশ দিবে, শ্রমিক তাঁর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে চলবেন। এই রূপান্তর প্রস্তাবনা শুধু শ্রমিকদের অধিকারের জন্য নয়, এর বাস্তবায়ন বাংলাদেশে ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

১.২ উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি

শ্রম সংস্কার কমিশন শ্রম জগতের ঐতিহাসিক রূপান্তর ও বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সংস্কার প্রস্তাবনায় শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষ, তাঁর আইনি স্বীকৃতির পাশাপাশি নিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে সু-সমন্বিত শিল্প-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গুরুত্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে সকল বিষয়ে কাজ করেছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রম আইন সংস্কার, শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত সংস্কার, ট্রেড ইউনিয়ন, সংগঠিত হওয়া ও দরকষাকষির চর্চার পরিবেশ উন্নয়ন, শিল্পসম্পর্ক ও ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তি, কর্মসংস্থান ও চাকরির নিরাপত্তা, উপযুক্ত মজুরি ও ক্ষতিপূরণ, সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন, অভিবাসী শ্রমিক সুরক্ষা, শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমজীবী কিশোরী-কিশোরদের সুরক্ষা এবং পিছিয়ে রাখা শ্রমিক যেমন- নারী কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক, গৃহশ্রমিক, খামারভিত্তিক শ্রমিক, মৌসুমি শ্রমিক, আদিবাসী শ্রমিক, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর শ্রমজীবী গোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা ও অন্যান্য।

শ্রম সংস্কার কমিশন সুপারিশ প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশ সংবিধান, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, ঘোষণা ও নীতিমালা, মানবাধিকার, পরিবেশ, অভিবাসন ও ব্যবসা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলাদি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০, এলডিসি গ্রাজুয়েশনে অনুসরণীয় বিষয়াদি এবং উন্নয়ন সহযোগী ও ক্রেতা রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যাশা, শর্ত ও নীতিমালা ইত্যাদি পর্যালোচনা করেছে। একই সাথে মিডিয়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সারাদেশে অংশীজন ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আলোচনা ও জনগণের মতামত, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে মতবিনিময় এবং আইএলও সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সাথে মতবিনিময় করেছে।

বাংলাদেশের সকল (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক) শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবার জন্য শোভন কাজ—কাজের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা, সংগঠন ও দরকষাকষির অধিকার এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার—সুরক্ষা ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়ন করা যা সুষ্ঠু

শিল্পসম্পর্ক চর্চার পরিবেশ তৈরি এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদাকর বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভিযাত্রায় অবদান রাখবে।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ণ করেছে:

১. **শ্রম সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ পর্যালোচনা:** বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রম সংক্রান্ত সকল নীতি, আইন, বিধি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯, শ্রমনীতি ২০১২, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি নীতিমালা ২০১৩, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি ২০১৫, শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০ এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি করা;

২. **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সংস্কার:** শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে আইন ও নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ; যেমন— শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নে সুপারিশ করা;

৩. **ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্পসম্পর্ক ও ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন:** সকল শ্রমিকের সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি ও প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করা, প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর সামাজিক সংলাপ ও দরকষাকষি এবং গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড চর্চার পরিবেশ উন্নয়ন, কার্যকর ও সুসমন্বিত ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে জাতীয়, সেক্টরাল ও প্রতিষ্ঠান পযার্য়ের বিদ্যমান ব্যবস্থা; যেমন— ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ—টিসিসি'র কাঠামো ও কার্যপরিধি পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি করা; এ লক্ষ্যে বিগত সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্প অসন্তোষসমূহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় চিহ্নিত করা;

৪. **শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তি:** সকল শ্রমিকের ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা, অসন্তোষ নিরসন, শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির বিদ্যমান প্রক্রিয়া; যেমন— প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, সালিশ ও মধ্যস্থতা এবং শ্রম আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ও কার্যপ্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি করা;

৫. **কর্মসংস্থান, কাজের নিরাপত্তা ও দক্ষতা উন্নয়ন:** বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, কাজের ও নিয়োগের ধরন পরিবর্তন; যেমন— চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্লাটফরম/গিগ ইকোনমি, জনমিতির বিন্যাস এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান কাজের নিরাপত্তা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকের বিশেষ করে শিক্ষাধীন, (এপ্রেন্টিস), আউটসোর্সিং , মাস্টাররোলভিত্তিক শ্রমিক, সেবা খাতের শিক্ষানবিস ও যুব কর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি;

৬. **শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন, মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা:** শ্রমিক ও তার পরিবারের মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা, মৌলিক চাহিদা পূরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা— এসডিজি ও জাতীয় দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু ও নারীর জীবনমান উন্নয়নে ঘোষিত নীতিমালা এবং ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া, মানদণ্ড ও নিম্নতম মজুরি বোর্ডের গঠন ও কার্যপরিধি পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি;

৭. **পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা**: সবার জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নয়নে বিদ্যমান আইন, নীতি, পরিদর্শন ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড ও পরিশোধ প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট কাঠামোসমূহ যেমন— জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কাউন্সিল, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সেইফটি কমিটি, এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিমসহ অন্যান্য ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি। এ লক্ষ্যে বিগত সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্প-দুর্ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় চিহ্নিত করা;

৮. **সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম**: সকল শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর আওতা, প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান স্কিমসমূহ, শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিক ও তার পরিবারের বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে সুপারিশ করা। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা, উদাহরণসমূহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় চিহ্নিত করা;

৯. **অভিবাসী শ্রমিক সুরক্ষা:** অভিবাসন প্রত্যাশী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন, মর্যাদাপূর্ণ, হয়রানিমুক্ত ও নিরাপদ অভিবাসন, প্রবাসে সুরক্ষা, প্রবাসী শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা ও সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি ও প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার, প্রবাসকালীন শ্রমিকের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণ এবং প্রত্যাবর্তনকৃত শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান আইন, নীতি ও কাঠামো পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি;

১০. **নারী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা:** নারী শ্রমিকদের জন্য মর্যাদাকর, বৈষম্যহীন ও হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা সহ সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত এবং নারী— বিশেষ করে গ্রামীণ নারীর উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নকল্পে সুপারিশ তৈরি;

১১. **শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষা:** শিশুশ্রম নিরসন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ সরকারের নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি;

১২. **কৃষি, গ্রামীণ, খামারভিত্তিক ও মৌসুমি শ্রমিক সুরক্ষা:** কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ শ্রমিক, খামারভিত্তিক ও মৌসুমি শ্রমিকের আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, কর্মহীন সময়ে ও প্রাকৃতিক দুযোর্গে সুরক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, সংগঠিত হওয়া ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি;

১৩. **আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শ্রমিক সুরক্ষা:** আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈষম্যহীনতা, মর্যাদা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সুপারিশ তৈরি;

১৪. **গৃহভিত্তিক শ্রমিক ও গৃহশ্রমিক সুরক্ষা:** গৃহভিত্তিক শ্রমিক ও গৃহশ্রমিকদের আইনগত স্বীকৃতি, নির্যাতন থেকে সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সুপারিশ তৈরি;

১৫. **প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর শ্রমজীবী গোষ্ঠীর সুরক্ষা:** প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রতিবন্ধীবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরি এবং অনগ্রসর ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রমজীবী গোষ্ঠীর মর্যাদা, সুরক্ষা, বৈষম্যহীনতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকল্পে সুপারিশ তৈরি;

১৬. **রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ/বিরাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান ও শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা:** রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ/বিরাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান ও শ্রমিক অধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি; এবং

১৭. **সাপ্লাই চেইন তৈরি:** সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে বহুজাতিক ও জাতীয় কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত/সংযুক্ত সকল শ্রমিকের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও ঘোষণা অনুযায়ী অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে জবাবদিহিতাসহ দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে সুপারিশ তৈরি।

১.৩ কর্মপদ্ধতি, টেকনিকাল কমিটি পরিচিতি ও অংশীজন পরিচিতি

কমিশন তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, নীতি, দলিল এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ও সুপারিশ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কেস স্টাডি এবং মিডিয়া প্রতিবেদনও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অংশীজনদের মতামত গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক পক্ষের সংগঠন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন, যেমন আইএলও'র সাথেও মতবিনিময় হয়েছে। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণের মতামত সংগ্রহের জন্য অনলাইন ফর্ম, ইমেইল ও লিখিত পরামর্শ ব্যবহৃত হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে কমিশন একাধিক টেকনিকাল কমিটি গঠন করেছে (সংযুক্তি ১.৩.১ এ দেখুন), যারা শ্রম পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিক সুপারিশ তৈরি করেছে। গঠিত কমিটিগুলির মধ্যে রয়েছে— আইন ও নীতি কাঠামো, শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও গর্ভনেন্স, শ্রম অসন্তোষ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি, শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ। বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আরও আটটি কমিটি কাজ করেছে। এই কমিটিগুলি যথাক্রমে কাজের অধিকার ও অন্তর্ভুক্তি, মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, সংগঠনের অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি, শিল্প বিরোধ ও ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীনতা ও বিশেষ জনগোষ্ঠী এবং শিশু ও কিশোর শ্রম এবং জবরদস্তিমূলক শ্রম বিষয় নিয়ে কাজ করেছে।

কমিশনের এই কার্যক্রমে অংশীজনদের সরাসরি অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শ্রমিক সংগঠনের সাথে ৩৬টি, মালিক সংগঠনের সাথে জেলা পর্যায়ে ৮টি, শ্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ৬টি এবং পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ১৮টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও ব্র্যান্ড-বায়ারদের সাথে ৭ টি সভা, এবং শ্রম বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সাথে ৬ টি মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্তি ১.৩.২ এ দেয়া আছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মোট ২০২ টি দাবিনামা ও লিখিত মতামত কমিশনের কাছে পেশ করেছে, যা কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। দাবিনামা ও লিখিত মতামত প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্তি ১.৩.৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছ।

১.৪ রিপোর্টের বিভিন্ন ভাগ পরিচিতি

এই রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রম সংস্কারের জন্য একটি কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এতে সংস্কারের জন্য গ্রহণযোগ্য ভিত্তি, নীতিগত নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে একটি বিষয়ভিত্তিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রম সংস্কারের মূল কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশের শ্রমজগতের বর্তমান অবস্থা, শ্রমিকদের অধিকার এবং এর সঙ্গে জড়িত নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে এবং অংশীজনদের মতামত ও দাবির ভিত্তিতে সংস্কার অধিক্ষেত্র চিহ্নিত করে মৌলিক বিষয়ভিত্তিক, শ্রম খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, শ্রমগোষ্ঠীভিত্তিক এবং খাতভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে শ্রম শক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা, বাজেট, এবং শ্বেতপত্র প্রস্তুত সংক্রান্ত বিশেষ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২ শ্রম সংস্কার প্রস্তাবনা কাঠামো

২.১ সংস্কার কাঠামোর ভিত্তি

স্বীকৃত মানবাধিকার ও শ্রম মানদণ্ড

বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও নীতিমালা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানই এ দেশে শ্রমিক অধিকার এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিতের মূল ভিত্তি/হাতিয়ার। সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের কর্মের অধিকার, শোষণমুক্ত ও মানসম্পন্ন জীবনযাপন নিশ্চিতের পাশাপাশি বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংকল্পবদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ১৪ ও ১৫: বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-তে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী (মেহনতি) মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ সুনির্দিষ্টভাবে মৌলিক চাহিদা পূরণের সাথে সম্পর্কিত। এ অনুচ্ছেদ অনুসারে "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।"

অনুচ্ছেদ ১৯: সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার হলো (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন; (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ ২০: অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম—(১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন; এবং (২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন (কোনো) ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪: জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ— (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে (কোনোভাবে) লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ (আইনত) দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (২) এই অনুচ্ছেদের কোন (কোনো) কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে (ক) ফৌজদারী (ফৌজদারি) অপরাধের জন্য কোন (কোনো) ব্যক্তি আইনতঃ (আইনত) দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা (খ) জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

অনুচ্ছেদ ৩৭: সমাবেশের স্বাধীনতা—জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ৩৮: সংগঠনের স্বাধীনতা—জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোন (কোনো) ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন (কোনো) দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী (জঙ্গি) কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।

অনুচ্ছেদ ৪০: পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা—আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন (কোনো) পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন (কোনো) যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন (কোনো) আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন (কোনো) আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

আইন: বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬; বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩; বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫; বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯।

জাতীয় নীতিমালা: শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১১; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি ২০১১; জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২; জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩; প্রবীণ কল্যাণ নীতিমালা ২০১৩; গৃহ শ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬; জাতীয় যুবনীতি ২০১৭; জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০; জাতীয় কর্ম সংস্থান নীতি ২০২২; জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হিসেবে দায়বদ্ধতা

অনুস্বাক্ষরকৃত আইএলও কনভেনশন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন, ঘোষণা ও দলিলাদি: বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের প্রতি দায়বদ্ধ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি ও কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরকারী ও অনুসমর্থনকারী দেশ। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৮টি প্রধান মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি ও প্রটোকলের মধ্যে বাংলাদেশ ১৩টি অনুসমর্থন করেছে, যা দেশের মানবাধিকার প্রতিশ্রুতির ব্যাপ্তি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রতি দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে।

এই চুক্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে—সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৬৬), নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৬৬), নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সনদ (CEDAW, ১৯৭৯), শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯), বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এবং নির্যাতন, জোরপূর্বক অন্তর্ধান, অভিবাসী শ্রমিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন।

এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৯০টি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের মধ্যে ৩৫টি অনুসমর্থন করেছে, যার মধ্যে বহু দলিল মানবাধিকার, শ্রম সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে Fundamental Principles and Rights at Work–এ উল্লিখিত চারটি মৌলিক নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: ১। সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত দরকষাকষির অধিকার; ২। জবরদস্তিমূলক শ্রমের বিলোপ; ৩। শিশুশ্রমের বিলোপ; এবং ৪। কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ। এই নীতিগুলি আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের ভিত্তিভূমি এবং বাংলাদেশের শ্রমনীতির কাঠামোগত সংস্কারে অন্যতম নির্দেশক।

মানবাধিকার, পরিবেশ, অভিবাসন ও ব্যবসা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলাদি: আন্তর্জাতিক শ্রম, মানবাধিকার ও ব্যবসায়িক নীতির সমন্বয়ে গঠিত আধুনিক কাঠামোর অন্যতম অংশ হলো United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), যা রাষ্ট্র, করপোরেট সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটির মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষার একটি কাঠামো নির্ধারণ করে। Human Rights Due Diligence (HRDD) একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ, যা ব্যবসায়িক উদ্যোগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি চিহ্নিত, প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করার উপায় নির্দেশ করে। এই দলিলসমূহ বাংলাদেশের শ্রম বাজারের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ তারা গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের অংশ হিসেবে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করে এবং বহুজাতিক কোম্পানির নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতাকে স্বীকৃতি দেয়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ২০৩০): টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals - SDGs) হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানব মর্যাদা, সমতা ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি সর্বজনীন কর্মপরিকল্পনা। এসডিজি-এর মধ্যে লক্ষ্য ৮: "শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি" সরাসরি শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার অধীনে কাজের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, শোভন কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার রয়েছে। এছাড়াও লক্ষ্য ৫ (লিঙ্গ সমতা), লক্ষ্য ১০ (বৈষম্য হ্রাস) এবং লক্ষ্য ১৬ (শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে অনুসরণীয় বিষয়াদি: বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় শ্রম খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড মেনে চলা অপরিহার্য। গ্র্যাজুয়েশনের পর বাংলাদেশ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ছাড় হারাতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রম অধিকার রক্ষা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার নৈতিকতা নিশ্চিত করাই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখার অন্যতম উপায়। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

সরকারের শ্রমসংক্রান্ত চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহ: সরকার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শ্রমনীতি সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি ও কর্মপরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: National Action Plan on Business and Human Rights, Decent Work Country Programme (DWCP) এবং ILO Road Map on Labour Rights। এসব দলিল শ্রমিকদের অধিকার, অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

২.২ সংস্কার নীতি

শ্রম সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রণয়নে যে নীতিমালাগুলি অনুসরণ করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নয়। বরং বাংলাদেশ শ্রমনীতির ভবিষ্যৎ রূপায়ণে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে প্রতিটি নীতির যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

শ্রমের মর্যাদা, স্বীকৃতি ও অধিকার: সমাজের সকল স্তরে শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষার নিশ্চয়তা একটি মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো কাজকে শুধু উপার্জনের মাধ্যম নয়, বরং মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক ভূমিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, যা সমাজে শ্রমিকদের অবস্থানকে সম্মানজনক করে তোলে।

সর্বজনীনতা, বৈষম্যহীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার: ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী, লিঙ্গ, জন্মস্থান কিংবা অন্য যে কোনো পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে শ্রমিকদের প্রতি সমান আচরণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই এই নীতির কেন্দ্রবিন্দু। এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক নীতি, যেখানে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

অংশীদারিত্ব ও ন্যায্য হিস্যা: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শ্রমিকদের অবদানকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার সুফল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বিতরণের নীতি এই অংশীদারিত্বের ভিত গড়ে দেয়। এটি শ্রমিকের কর্মপ্রেরণা, উৎপাদনশীলতা এবং দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে।

সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক, প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ: প্রতিটি শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, তাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা একটি গণতান্ত্রিক শ্রম পরিবেশের পূর্বশর্ত। শ্রমিক-মালিক-সরকার এই ত্রিপক্ষীয় কাঠামোর মধ্য দিয়ে শিল্প সম্পর্কের ভারসাম্য ও সংহতি রক্ষা সম্ভব।

ন্যায় বিচার: প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং স্ব নিযুক্ত—সব ধরনের শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিকার ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের স্তম্ভ। এতে শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাস, রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা এবং সামাজিক শান্তি রক্ষা পায়।

২.৩ সুপারিশ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়গুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের বিদ্যমান শ্রম ও শ্রমিক অধিকার পরিস্থিতি, শ্রমিকের জীবনমান, কর্ম সংস্থানের গতিপ্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা এবং এর প্রেক্ষিতে উদ্ভূত জন-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একই সাথে কর্মজগতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও দেশের শ্রম বাজারের ভবিষ্যৎ চাহিদা এই কমিশনের সুপারিশ গঠনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পাশাপাশি টেকসই ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা ও উন্নত করার বিষয়টি কমিশন তার সুপারিশ তৈরিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

বিদ্যমান শ্রম ও অধিকার পরিস্থিতি

শোভন কর্মক্ষেত্রের মানদণ্ড ও ঘাটতি: শোভন কর্মক্ষেত্র বলতে বোঝায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়। ১৯৯৯ সালে প্রবর্তিত শোভন কাজের ধারণাটি শ্রমিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে বিশেষভাবে স্বীকৃত। শোভন কাজের অধিকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ধারণায়ও গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম এক লক্ষ্য এই শোভন কাজ। শোভন কাজের সর্বমোট ১০টি নির্দেশক যার অধীনে রয়েছে কর্মসংস্থান সুযোগ; পর্যাপ্ত উপার্জন এবং উৎপাদনশীল কাজ; শোভন কর্ম সময়; কাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য; বিলোপ করা উচিত এমন কাজ, কাজের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা; কর্মস্থলে সমান সুযোগ এবং ট্রিটমেন্ট; নিরাপদ কাজের পরিবেশ; সামাজিক নিরাপত্তা; এবং সামাজিক সংলাপ, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিত্ব। এ সকল নির্দেশকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শ্রমিকের শোভন কাজের পরিস্থিতি এবং বিদ্যমান সমস্যা ও ঘাটতিসমূহ এই সংস্কার কমিশন বিবেচনায় নিয়েছে, যাতে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা যায়।

বৈষম্য, বেকারত্ব, ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা: বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নানা ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান। কাজের স্বীকৃতি ও সুযোগ, অধিকার, মজুরি, সংগঠন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যসমূহ লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি রয়েছে বেকারত্বের উচ্চ হার এবং শ্রম বাজারের ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা। বেকারত্বের হার যুবকদের মধ্যে অত্যধিক। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অধিক বেকারত্ব বাংলাদেশের শ্রম বাজারের অন্যতম উদ্বেগের বিষয়। এছাড়া আকস্মিক কর্মহীনতা, দুর্ঘটনা এবং মজুরির অনিশ্চয়তাও দেশের শ্রম বাজার ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। এমতাবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঝুঁকি মোকাবেলার বিষয়টি কমিশন গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনেছে।

শ্রমক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, শিল্প ক্ষেত্রে বিবর্তন: বিগত দশকগুলিতে বাংলাদেশের শ্রমক্ষেত্রে আবির্ভূত বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রমবাজারে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক, পেশা ও কাজ এবং নিয়োগের বৈচিত্র্য দিন দিন বাড়ছে। একসময় যেখানে শ্রমবাজার ছিল মূলত কৃষিনির্ভর; সেখানে বর্তমানে গার্মেন্টস, আইটি, সেবা খাত, নির্মাণ শিল্প, ফ্রিল্যান্সিং, রাইড শেয়ারিংয়ের মতো বিভিন্ন সেক্টরে শ্রমিকদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রম বাজারে পুরুষের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগামী দিনগুলিতে আরো বৃদ্ধি পাবে। শ্রম বাজার ও শিল্পের এই বিবর্তন ও বৈচিত্র্য একদিকে যেমন নতুন সুযোগের সৃষ্টি করেছে; একই সাথে শ্রমিক অধিকার, সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতের ক্ষেত্রে তৈরি করছে নতুন চ্যালেঞ্জ, যেগুলি কমিশনের সুপারিশে বিবেচিত হয়েছে।

শিল্প সম্পর্ক, অসন্তোষ ও শিল্প বিরোধ: শ্রম অসন্তোষ ও শিল্প বিরোধ সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের পথে অন্তরায় যা শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং প্রকারান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন। বাংলাদেশে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, কাজের পরিবেশ এবং অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত দাবির কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং এর ফলে শুধুমাত্র শিল্প উৎপাদনই ব্যাহত হয় না, একই সাথে শ্রমিকের জীবিকা, টেকসই ব্যবসা এবং দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, টেকসই ব্যবসা ও স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য শ্রম অসন্তোষ ও শিল্প বিরোধ এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, রোবটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর মতো ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব শ্রমিকদের কাজের ধরন এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে পড়ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস, কৃষি, আসবাবপত্র, চামড়া প্রভৃতি শিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এ সকল শিল্পে/কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের জীবন, জীবিকা ও জীবনমানকে প্রভাবিত করেছে। তাই কমিশন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত ও কাজের ধরনের পরিবর্তন এবং শ্রমিকদের জীবনমানের পরিবর্তনের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশসমূহ প্রস্তুত করেছে।

শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজন

শ্রমিক অধিকারের পাশাপাশি শ্রমকল্যাণ নিশ্চিত করাও যেহেতু এই সংস্কার কমিশনের মূল লক্ষ্য, সেহেতু সুপারিশ প্রণয়নে কমিশন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজনকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়েছে। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মৌলিক চাহিদা; যেমন খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, চিত্ত বিনোদন ইত্যাদি এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে বিবেচনায় আনা হয়েছে যাতে করে শ্রমিক পরিবারগুলির জন্য একটি সমন্বিত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

জন-আকাঙ্ক্ষা, শ্রমজীবী মানুষের দাবি ও প্রত্যাশা

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন বৈষম্য ও শোষণ মুক্ত এক সমাজের প্রত্যাশা তৈরি করেছে। শ্রমজীবী/শ্রমিকেরা এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বিধায় তাদের মাঝে নতুন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ঐতিহাসিক ভাবেই দেশের শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের অধিকার ও কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দাবি জানিয়ে আসছে। এই কমিশন পরিবর্তিত পরিস্থিতে উদ্ভূত জন-আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার অর্জনের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়ে সুপারিশমালা প্রস্তুত করেছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসার ভাবমূর্তি উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ এখন গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্কিত এবং দিনে দিনে এই সম্পৃক্ততার পরিধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণির কর্মসংস্থান, অধিকার ও জীবনমানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের শিল্প খাতের ও ব্যবসায়ের সুনাম এবং ব্যবসার উন্নত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

পাশাপাশি শ্রম অধিকারের সুরক্ষা ও ব্যবসার নৈতিক দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখাও আবশ্যক, যা দেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কমিশন তার সুপারিশ প্রণয়নে এ সকল বিষয়কে বিবেচনায় নিয়েছে।

ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন

কমিশন তার সুপারিশ প্রণয়নে বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং একই সাথে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের ধারাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কাজের প্রতি মনোভাব, কাজের মূল্য ও স্বীকৃতি, নারীর শ্রম ও কাজের প্রতি সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন এবং এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনগুলি মাথায় রেখে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নীতিমালা ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৪ সংস্কার প্রস্তাবনার বিষয়ভিত্তিক কাঠামো

কাজের স্বীকৃতি, অধিকার, সুযোগ, দক্ষতা ও নিশ্চয়তা: শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি, চাকরির নিরাপত্তা, নিয়োগপত্র ও সার্ভিস বুক, আউটসোর্সিং, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রমিক/শ্রমশক্তির নিবন্ধন ও জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডার, শিক্ষানবিস ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (NEET তরুণদের জন্য) এবং STEM শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সুযোগ, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকের অধিকার।

মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা: জাতীয় ন্যূনতম মজুরি, সেক্টরভিত্তিক মজুরি, মজুরি মানদণ্ড ও জীবন ধারণ উপযোগী মজুরি, মজুরি কাঠামো, মজুরি পরিশোধ পদ্ধতি, মজুরি বৃদ্ধির হার, মজুরি পরিশোধের দায়, মজুরি বৈষম্য, বাধ্যতামূলক আপদকালীন তহবিল, কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ।

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ: শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করা শ্রম সংস্কারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচনায় নিতে হবে তা হলো কর্মস্থলের দুর্ঘটনা, পেশাগত ব্যাধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা; তথ্য সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ পেশা এবং বিপদাপন্ন গোষ্ঠী ও প্রকল্প।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ: সর্বজনীন পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি, রেশনিং, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, সেন্ট্রাল ফান্ড, কর্মহীনতা কালীন সুরক্ষা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, ডে-কেয়ার, শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন; বিশেষ শ্রম জনগোষ্ঠীর জন্য স্কিম/কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা।

সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি: সর্বজনীন সংগঠনের অধিকার, ইউনিয়নের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা ও আবেদন প্রক্রিয়া, ইউনিয়নের অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা; অসৎ শ্রম আচরণ ও এন্টি-ট্রেড

ইউনিয়ন ডিস্ক্রিমিনেশন; যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি, শিল্প বিরোধ উত্থাপন, অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের ক্ষেত্রে শিল্প বিরোধ উত্থাপন, ইউনিয়নে নারীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব, ত্রিপাক্ষিক প্রতিনিধিত্ব, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব।

শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি এবং **ন্যায় বিচার:** শ্রম আইনের অস্পষ্টতা এবং অসম্পূর্ণতা, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালতের সংখ্যা ও সক্ষমতা, স্বতন্ত্র অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।

সমতা, বৈষম্যহীনতা ও অন্তর্ভুক্তি: বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ, সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, বেতন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি, নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্ব, নারী শ্রমিকদের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা, নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পেশাভিত্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবস্থা।

শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম: কাজে প্রবেশের ন্যূনতম বয়স, কাজের মান ও পরিবেশ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা, কিশোর শ্রমিকের শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রম মানদণ্ড মনিটরিং ও পরিদর্শন, দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও শাস্তি; কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতে বিবেচ্য ও পূর্বের কার্যক্রম মূল্যায়ন; দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ।

২.৫ প্রস্তাবনার মূল কাঠামো

নিম্নোক্ত পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে এই কমিশনের মূল সংস্কার কাঠামো গঠিত।

আইন ও নীতি কাঠামোর মাধ্যমে সুরক্ষা: শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে শ্রম আইন ও শ্রমনীতির পাশাপাশি সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও নীতির এক সুসমন্বিত কাঠামো প্রয়োজন, যার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার ও শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতে কমিশন প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালার সংশোধন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গভর্নেন্স: শ্রম সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং গভর্নেন্স সিস্টেম থাকা জরুরি। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কমিশনের সুপারিশ তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও গভর্নেন্স ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিষয়গুলি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যা শ্রম সংস্কার কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যালোচনার অধীনে আনা হয়েছে:

- শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
- শ্রম অধিদপ্তর
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- শ্রম আদালত ও অ্যাপিলেট ডিভিশন
- ন্যূনতম মজুরি বোর্ড
- সেন্ট্রাল ফান্ড
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- শ্রমিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বিভাগ/প্রতিষ্ঠান

শিল্প সম্পর্ক, সংগঠন ও সামাজিক সংলাপ: শ্রমিক অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, সংগঠনের অধিকার ও সামাজিক সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে শ্রমিকের সংগঠনের অধিকার এবং সামাজিক সংলাপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও ঘাটতিসমূহ পর্যালোচনা করে সংগঠন ও সামাজিক সংলাপকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সংগঠন ও সামাজিক সংলাপের সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে এগুলিকে কার্যকর করা হলে এর মাধ্যমে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক এবং একটি সমন্বিত এবং অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ তৈরি হবে যেখানে শ্রমিকের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

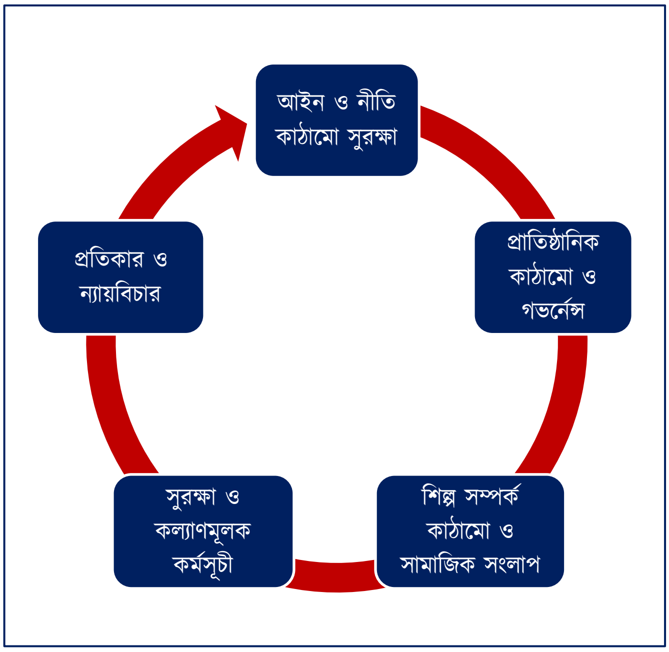

সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি: আইন ও নীতিমালার পাশাপাশি সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, যে সকল ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে কোনো শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতের সুযোগ সীমিত, সে সকল ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক স্কিম ও কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নতুন স্কিম/কর্মসূচির পাশাপাশি বিদ্যমান স্কিম/কর্মসূচিকে শ্রমিক বান্ধব করা দরকার। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, আউটসোর্সিং, হোমবেজড ওয়ার্ক, গিগ ওয়ার্ক, রাইড শেয়ারিং প্রভৃতি খাতে আইনি সুরক্ষার ঘাটতি মোকাবেলায় সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা ও অনুভূত প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা, বিমা, পেনশন, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব কর্মসূচি শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমানের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে অবদান রাখবে।

প্রতিকার ও ন্যায় বিচার: প্রতিকার ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার, সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকই যেন প্রতিকার ও ন্যায় বিচারের সুরক্ষা পায়। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের অভিযোগ বা সমস্যাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য একটি কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এই ব্যবস্থায় শ্রম আদালত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার/পরিবর্তন জরুরি।

৩. বিষয়ভিত্তিক মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবনা

৩.১ কাজ ও পেশার স্বীকৃতি, কাজের অধিকার, সুযোগ, দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং নিশ্চয়তা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের কাজ করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা পাশাপাশি "কর্মের অধিকার" (অনুচ্ছেদ ১৫) অনুযায়ী নাগরিকদের উপযুক্ত মজুরি এবং কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করা। "কর্মের অধিকার, কর্তব্য ও সম্মান" (অনুচ্ছেদ ২০) অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিককে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার" (অনুচ্ছেদ ৪০) নিশ্চিত করে নাগরিকদের পছন্দ মতো কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা। জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২, "কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী (তৈরি)" (উদ্দেশ্য ৪.০২) এবং "প্রান্তিক জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি" (উদ্দেশ্য ৪.০২.৮) নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের বৈষম্যহীন পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে।

তবে দেশের শ্রমবাজারে বেকারত্ব, বিশেষত যুবক ও নারীদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উপর নির্ভরশীলতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, বেকারত্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকা এবং লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত থাকলেও নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় কম এবং শহরের তুলনায় গ্রামীণ অঞ্চলে পরিস্থিতি আরও চ্যালেঞ্জিং। শিক্ষা এবং দক্ষতার মধ্যে অমিলও বেকারত্বের উচ্চ হার এবং শ্রমবাজারের অকার্যকর ব্যবস্থার লক্ষণ।

দেশের শ্রমবাজারে শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সংকোচন, কৃষি খাতে উচ্চ কর্মসংস্থান এবং সেবা খাতে ধীর প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। "অবশিল্পায়ন"-এর কারণে শিল্পখাতে কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে। একদিকে প্রায় ৮৫% শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, যা তাদের কর্মজীবনে নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাব সৃষ্টি করে। অন্যদিকে গিগ অর্থনীতির উত্থান নতুন সুযোগ তৈরি করলেও সেখানে সুরক্ষা এবং স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। তরুণদের মধ্যে কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। বিশেষ করে, যাদের উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি রয়েছে, তারা উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছেন না। এই বৈষম্য বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শ্রম বাজারের কাঠামোগত সমস্যাগুলিকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

৩.১.১ শ্রম আইনের সর্বজনীন প্রযোজ্যতা ও শ্রমিকের স্বীকৃতি

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কর্মসংস্থান, শ্রমিক-নিয়োগকারী সম্পর্ক, মজুরি, ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ও কর্মস্থলের স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিধান রাখলেও এটি মূলত প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য প্রযোজ্য। ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা—যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—বঞ্চিত থাকেন ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সংগঠনের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে। শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে শক্তিশালী ও সর্বজনীন শ্রম আইন অপরিহার্য। শ্রম আইনকে সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও ILO কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এটি শুধু ন্যায্যতা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে না, বরং উৎপাদনশীলতা ও মানব মর্যাদা রক্ষায়ও সহায়ক হবে।

শ্রম আইন সংস্কারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শ্রমিকদের অধিকারকে আরও শক্তিশালী করা। ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়; এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সংহতির পূর্বশর্ত। একটি ভারসাম্যপূর্ণ শ্রম আইন শ্রম অধিকার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখবে।

সকল শ্রমিক—যে কোনো খাত বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত—আইনের আওতায় আসা উচিত, যাতে তারা মৌলিক অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। এর জন্য দুটি পথ বিবেচনাযোগ্য: বিদ্যমান আইনের আওতা সম্প্রসারণ করে সংশোধন, অথবা একটি নতুন, সমন্বিত আইন প্রণয়ন। নতুন আইনি কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিটি শ্রমিক ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সংগঠনের অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বাস্তবিক আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম চুক্তি ও কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব রয়েছে।

একটি কার্যকর শ্রম আইন প্রণয়নে "শ্রমিক" ও "নিয়োগকারী" শব্দের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা জরুরি। "মালিক" শব্দের পরিবর্তে "নিয়োগকারী" শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া যায়। যদিও প্রতিষ্ঠানভেদে পদবি নির্ধারণের স্বাধীনতা থাকবে, তবে কোনো কর্মী, যিনি মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন, তাঁকে শ্রম আইনের বাইরে রাখা যাবে না। তবে সংগঠনের অধিকার কেবল তাঁদের থাকবে যাঁরা "প্রশাসনিক" বা "ব্যবস্থাপনাগত" দায়িত্বে নিয়োজিত নন। এরা ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিতে পারবেন। অন্যদিকে, "কর্মকর্তা" হিসেবে যারা প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন, তাঁরা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আলাদা সমিতি গঠন করতে পারবেন।

সকল শ্রমিকের মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে—যা হোক না কেন চাকরির ধরন বা খাত। শ্রম আইন সংস্কার, হোক তা সংশোধনের মাধ্যমে, নতুন আইন বা পৃথক খাতভিত্তিক আইনের মাধ্যমে, মূল লক্ষ্য হতে হবে সকল শ্রমিকের সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করা। পূর্বের অধিকার বা সুবিধা কোনোক্রমেই খর্ব করা যাবে না।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে-

ক। শ্রম আইনকে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং শ্রমিকদের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা আরও সুসংহত করা।

খ। বাংলাদেশের সকল শ্রমিক—যে কোনো শিল্প, খাত, বিশেষায়িত শ্রম অঞ্চল, কাজের ধরন নির্বিশেষে, প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত—সমানভাবে শ্রম আইনের সুরক্ষার আওতায় আসবে। এই লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যমান শ্রম আইনের ব্যাপক সংস্কার অথবা নতুন ও সমন্বিত এক বা একাধিক শ্রম আইন প্রণয়ন করা।

গ। শ্রম আইনের সর্বাত্মক সংস্কারের ক্ষেত্রে “মালিক” শব্দের পরিবর্তে “নিয়োগকারী” শব্দ ব্যবহার করা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদবি নির্ধারণের স্বাধীনতা থাকবে। তবে পদবির পার্থক্যের কারণে কেউ শ্রমিকের সুরক্ষার বাইরে থাকবে না।

ঘ। “শ্রমিক” শব্দের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করা এবং “নিয়োগকারী” শব্দের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা। “নিয়োগকারী” বলতে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হবে, যিনি কর্মী নিয়োগ, চাকরিচ্যুতি এবং চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণে চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন। এই সংজ্ঞার বাইরে থাকা সকল প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সকল ব্যক্তি কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন। নিয়োগকারী ব্যতীত সকলের ক্ষেত্রেই শ্রম আইন প্রযোজ্য হবে এবং শ্রম আইনের অধীনে প্রযোজ্য আইনগত অধিকার ও সুরক্ষার আওতায় আসবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ব নিয়োজিত ব্যক্তিরাও “শ্রমিক” হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঙ। শ্রম আইনের সর্বজনীন প্রযোজ্যতা ও শ্রমিকের স্বীকৃতি বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক (ইপিজেড, এসইজেড) শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত করা। একটি সুসংহত ও একক শ্রম আইন কাঠামো তৈরি করা, যার মাধ্যমে বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক ও বিশেষ অঞ্চল-বহির্ভূত শ্রমিকদের জন্য সমান শ্রম অধিকার নিশ্চিত হয়। বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক শ্রমিকদের সাধারণ শ্রম আইনের আওতায় আনা যাতে তারা দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য সম অধিকার ও সুরক্ষা পায়। তবে প্রয়োজনে ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য পৃথক আইন রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, ইপিজেড শ্রমিকদের শ্রম অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেশের সাধারণ শ্রম আইনের সাথে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিশেষ করে, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং আদালত ও আইনি সহায়তার সুযোগ ইপিজেড শ্রমিকদের জন্যও দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা বিইপিজেডএ (BEPZA)-এর আওতার বাইরে এনে স্বতন্ত্রভাবে শ্রম অধিদপ্তর (DoL) ও শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) মাধ্যমে পরিচালিত করা।

ছ। সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বিধান রাখা যেন ‘শ্রমিক’-এর সংজ্ঞা সম্প্রসারণের কারণে নতুনভাবে আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণের আর্থিক প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক বিধান করা যায়।

৩.১.২ শ্রমিকের চাকরির আইনগত সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের কাজের শর্ত ও পরিবেশের ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে। এসব আইনের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুতি প্রতিরোধ ও ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত

করা। তবে এসব বিধান থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা ন্যায্যতা ও সুরক্ষাবঞ্চিত হন। যেমন, নিয়োগপত্র বাধ্যতামূলক হলেও অধিকাংশ শ্রমিক তা পান না, ফলে তাদের চাকরি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। আবার, আইনের কিছু ধারা শ্রমিকদের প্রতি কঠোর। ধারা ১৩ অনুযায়ী, কেউ অবৈধ ধর্মঘটে অংশ না নিলেও মজুরি পান না। অসুস্থতার ছুটিতে ডাক্তারি সনদের বাধ্যবাধকতা দরিদ্র বা দূরবর্তী এলাকায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য একটি বড় বাধা।

ধারা ১৬ ও ২০ অনুযায়ী, ছাঁটাই বা লেঅফ ক্ষতিপূরণ পেতে নির্দিষ্ট সময় চাকরি করার শর্ত রয়েছে, যা অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য বৈষম্যমূলক। ধারা ১৯ অনুযায়ী, মৃত্যুকালে ক্ষতিপূরণ পেতে হলে দুই বছর চাকরির শর্ত রয়েছে, যা অমানবিক। ধারা ২৩(৩)-এ বলা হয়েছে, অসদাচরণে চাকরিচ্যুতি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না, যা অনেক সময় প্রমাণিত না হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়। ধারা ২৬ অনুযায়ী, নিয়োগকর্তা কারণ ছাড়াই চাকরি বাতিল করতে পারেন, এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত। এটি ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে, কারণ নিয়োগকারী এই ধারার অপব্যবহার করে সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে।

আইনি সীমাবদ্ধতার বাইরেও একটি বড় সমস্যা হলো, আইনে থাকা অধিকারগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন নেই। অনেক নিয়োগকর্তা আইনের তোয়াক্কা করেন না, আর আইনি প্রতিকার পেতে শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় মামলা চালাতে হয়। ধারা ৩৩ অনুযায়ী অভিযোগ দাখিল ও প্রতিকারের সুযোগ থাকলেও, তা দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতার কারণে কার্যকর হয় না। ফলে শ্রমিকরা অভিযোগ করতেও সাহস পান না।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন একটি কার্যকর, সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, যা শ্রমিকদের প্রশাসনিক বা আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বিচার পাওয়ার সুযোগ দেবে। যদি এমন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে শ্রমিকদের অধিকার কেবল কাগজে-কলমেই থাকবে। তাই যদিও শ্রম আইন একটি কাঠামো দিয়েছে, কিন্তু তার ফাঁকফোকর, দুর্বল প্রয়োগ এবং সীমাবদ্ধতা শ্রমিকদের প্রকৃত সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এই বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শ্রম আইন সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রমিকরা ন্যায্যতা ও মর্যাদা পান। এটি বিশেষভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে, যেকোনো অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থায় শ্রমিকদেরকে তাদের আইনগত অধিকার বা পাওনাসমূহ থেকে বঞ্চিত করা না হয়, বা যৌথ দরকষাকষি চুক্তি বা যেকোনো নিস্পত্তিনামায় বর্ণিত সুযোগ সুবিধা থেকে কম সুযোগ সুবিধা প্রদান করা না হয়।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে যে সকল শ্রমিকের চাকরির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। আইন শ্রমিকদের ন্যায্যতা, বিচার এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা দেবে। বিদ্যমান বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু অসংগতি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা হলো। তবে এই বিশ্লেষণ চূড়ান্ত নয়, বাস্তবায়নের সময় প্রতিবেদনের অন্যান্য অংশে প্রদত্ত সুপারিশগুলিকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

ক। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র অথবা কাজে নিয়োজিত করার প্রমাণপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে। যদি লে-অফ ১৫ দিনের বেশি হয় তাহলে লে-অফ চলাকালে শ্রমিকদের প্রতিদিন কর্মস্থলে হাজির হওয়ার বাধ্যবাধকতার শর্ত বাতিল করা। লে-অফ চলাকালে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

খ। প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিধান সংশোধন করে নিশ্চিত করা যে, অবৈধ ধর্মঘটে জড়িত না থাকা শ্রমিকরা মজুরি বা লে-অফ ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হবে না। শ্রমিকরা যদি মজুরি না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়, তবে সেটাকে অবৈধ ধর্মঘট হিসেবে গণ্য না করা। আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যে, নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি না পাওয়ার কারণে কাজ বন্ধ রাখা কোনোভাবেই আইনবহির্ভূত নয় এবং অনুরূপ কারণে তাদের কোনো সুবিধা কাটছাঁট না করা।

গ। অসুস্থতার ছুটি গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা দূর করা এবং অসুস্থতা ছুটি ০২ দিনের বেশি না হলে চিকিৎসা সনদ দাখিলের প্রয়োজন হবে না মর্মে শ্রম আইনে বিধান যুক্ত করা।

ঘ। অসদাচরণ সংক্রান্ত তদন্তের বিদ্যমান ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না বিধায় এ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ও নিয়োগকারী উভয়ই যেন প্রয়োজনে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করতে পারে সে জন্য শ্রম আইনের পর্যলোচনা করে একটি কার্যকর ব্যবস্থার বিধান রাখা।

ঙ। অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যগত কারণে ডিসচার্জের ক্ষেত্রে চাকরি অবসানের ন্যায় (termination) শ্রমিকদের চার মাসের মজুরি প্রদান করা এবং প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী বন্ধের কারণে চাকরির অবসানের ক্ষেত্রে চার মাসের নোটিশ প্রদান করা।

চ। যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির (সিবিএ ইউনিয়ন) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে শ্রম আইনের ২৬ ধারায় টার্মিনেট করা যাবে না মর্মে আইন সংশোধন করা।

৩.১.৩ জাতীয় শ্রমশক্তি নিবন্ধন সিস্টেম ও জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি ৪/৫ বছরের ব্যবধানে জাতীয় শ্রম শক্তি জরিপ পরিচালনা করে থাকে। এই জরিপের ফলাফলগুলি মূলত গবেষণা ও পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই জরিপের ফলাফল থেকে অর্থনীতির কাঠামোগত ও প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির সাথে মিল রেখে কর্ম সংস্থান পূর্বাভাসে সক্ষমতা অর্জন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়।

শ্রমবাজারে নিয়োজিত কর্মী, বেকার,[1] শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশাকারীর হালনাগাদ তথ্যের জন্য ট্রানজেকশনাল সিস্টেম প্রয়োজন, যা বর্তমানে অনুপস্থিত। এর ফলে শোভন কাজের মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করা যাচ্ছে না; কর্মীর দক্ষতা ও তার স্তর নির্ণয় করে বাজার চাহিদ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাচ্ছে না; বেকার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও বেকার ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না; শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ ও তাঁদের জন্য কর্মসংস্থান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাচ্ছে না; পেনশন ও বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তিতে যোগ্য নাগরিক চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না; বিশেষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাচ্ছে না।

বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ শ্রম বাজারের তথ্য ঘাটতি কিছুটা দূর করলেও তথ্য ঘাটতি এখনও বিদ্যমান। তথ্য ঘাটতির কিছু দিক হচ্ছে: মজুরি সংক্রান্ত তথ্য ও সূচকের ঘাটতি; অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের তথ্য ঘাটতি; লিঙ্গ, পেশা ও অঞ্চলের ভিত্তিতে মজুরি তথ্যের স্বল্পতা; দীর্ঘমেয়াদি তথ্যের অভাব; মজুরি বহির্ভূত সুবিধা উপেক্ষা; এবং নীতি প্রয়োজনের সাথে তথ্য সংগ্রহের অসঙ্গতি।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমের স্বীকৃতি

বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের স্বীকৃতি এবং তাদের পেশা, দক্ষতা, কাজের পরিচিতি ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক, শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী ও বেকার সকলের নিবন্ধনপূর্বক একটি জাতীয় ডিজিটাল শ্রম নিবন্ধন সিস্টেম ও তথ্যভাণ্ডার চালু করা। এই জাতীয় ডিজিটাল নিবন্ধন সিস্টেম ও তথ্যভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ: সকল শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয় ও নিবন্ধন নিশ্চিত করা; সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা কার্যকর করা; শ্রম বাজার বিশ্লেষণ, কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন; দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন। কর্মীর দক্ষতা ও তার স্তর নির্ণয় করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন; বেকার জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন। বেকার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও বেকার ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ; নতুন কর্মসংস্থান পরিকল্পনা করা। শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারীবৃন্দের চিহ্নিতকরণ ও তাঁদের জন্য কর্মসংস্থান পরিকল্পনা প্রণয়ন, পেনশনভোগী চিহ্নিতকরণ ও প্রবীণ শ্রমিকদের সুবিধা নিশ্চিতকরণ। পেনশন ও বয়স্কভাতা প্রাপ্তিযোগ্য নাগরিকদের চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ও সেবা নিশ্চিতকরণ; প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান। বিশেষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন; দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক শনাক্তকরণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন; কর্মসংস্থান

[1] আইএলও দ্বারা সংজ্ঞায়িত একজন বেকার ব্যক্তি হলেন ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের একজন ব্যক্তি যিনি একই সাথে তিনটি শর্ত পূরণ করেনঃ একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহের জন্য বেকার হওয়া; দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি চাকরি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা ; গত চার সপ্তাহে সক্রিয়ভাবে একটি চাকরি খুঁজেছেন বা তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে একটি শুরু খুঁজে পেয়েছেন। সূত্রঃ INSEE Definition - Unemployed person (according to the International Labour Organization (ILO) definition) | Insee https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1129

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; কর্মসংস্থান হালনাগাদ তথ্য ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করা, যার ভিত্তিতে শ্রমবাজারের চলতি প্রবণতা বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি হবে।

খ। তথ্যভাণ্ডারের সর্বজনীনতা

নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্যভাণ্ডার এমনভাবে নির্মাণ করা উচিৎ যেন এর সর্বজনীনতা নিশ্চিত হয়। তথ্যভাণ্ডারে আলাদা করা। এর মাধ্যমে যাঁদের চিহ্নিত করা যাবে: ক) প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক (নিবন্ধিত কর্মী, বেতনভুক্ত পেশাজীবী); খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক (দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক, গৃহকর্মী, গিগ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক); গ) অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং স্বনির্ভর শ্রমিক; ঘ) প্রবাসী শ্রমিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক; ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক; চ) শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী নাগরিক; এবং ছ) বেকার।

গ। অন্যান্য তথ্যভাণ্ডারের সাথে সংযুক্তিকরণ (Interoperability)

জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্যভাণ্ডার, জাতীয় দক্ষতা তথ্যভাণ্ডার সহ অন্যান্য পরিপূরক তথ্যভাণ্ডারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন (interoperability) করা, যেন যে কোনো কর্মী/নাগরিক দেশের যে কোনো স্থান থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারেন। উল্লেখযোগ্য তথ্যভাণ্ডারসমূহ-

- জাতীয় দক্ষতা তথ্যভাণ্ডার: শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগের সাথে সংযুক্ত করার জন্য।
- সামাজিক নিরাপত্তা ও পেনশন ব্যবস্থা: উপযুক্ত শ্রমিকদের জন্য প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য (যদি থাকে)।
- জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ব্যবস্থা: পরিচয় যাচাই ও সরকারি সেবাগুলি সহজলভ্য করার জন্য।
- প্রবাসী তথ্যভাণ্ডার: প্রবাসী কর্মীর সেবা ও পুনঃএকত্রীকরণ সেবা প্রদানের জন্য।

ঘ। ডিজিটাল ও বিকেন্দ্রীভূত প্রবেশাধিকার

- জাতীয় ডিজিটাল শ্রম নিবন্ধন, শ্রম ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডার এমনভাবে স্থাপন করা, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক, শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী ও বেকার সকলের ডিজিটাল ও বিকেন্দ্রীভূত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়। এ লক্ষ্যে নিম্নেলিখিত ব্যবস্থার বিধান থাকবে-
  - একাধিক মাধ্যমে (অনলাইন পোর্টাল, মোবাইল অ্যাপ, শ্রম অফিস) নিবন্ধনের ব্যবস্থা।
  - নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে শ্রমিকের তথ্য হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতা।
  - শ্রমিকের তাঁর কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার তথ্য সহজে দেখতে ও ব্যবস্থাপনা করার সুযোগ।

ঙ। তথ্য নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা

তথ্যভাণ্ডারটি আন্তর্জাতিক তথ্য সুরক্ষা মান অনুযায়ী পরিচালিত করা। শ্রমিকের ব্যক্তিগত তথ্য অপব্যবহার থেকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা।

চ। নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধন

- ২০২৬ অর্থবছর সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন কাজ শুরু ও ডিজিটাল শ্রম ব্যবস্থাপনা চালু করা।
- নিয়োগকর্তা কর্তৃক তথ্য রেজিস্টারে তথ্যভাণ্ডারে শ্রমিকদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকবৃন্দের জন্য মোবাইল নিবন্ধন কেন্দ্র চালু করে স্বনিবন্ধন উৎসাহিত করা।
- শ্রম পরিদর্শকবৃন্দ কর্তৃক নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধিবিধান পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ছ। নীতিগত পরিকল্পনা ও সুবিধা বিতরণে তথ্যভাণ্ডারের ব্যবহার

- ডিজিটাল শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, নিবন্ধন ও তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ সহ শ্রমশক্তি ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চালু করা।
- ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ, বেকার ভাতা এবং পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের জন্য তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

- ইউনিয়ন গঠন ও শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রাপ্য নিশ্চিত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারি কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংগঠন তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য পাবার সুযোগ রাখা।
- নিয়োগকর্তাবৃন্দ কর্তৃক তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে কর্মশক্তির পরিকল্পনা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করা।

জ। শ্রমশক্তি নিবন্ধন ও তথ্যভাণ্ডার বাস্তবায়ন কৌশল

- বাংলাদেশে জাতীয় শ্রম নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করতে প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রকল্প চালু করে একটি ছোটো পরিসরে তথ্যভাণ্ডারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।
- সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তা, উন্নয়ন সংস্থা) সম্পৃক্ত করা, যাতে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।
- পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে বিভিন্ন খাত ও অঞ্চলের শ্রমিকদের পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
- জাতীয় শ্রম নিবন্ধন সিস্টেম ও তথ্যভাণ্ডার চালু করার জন্য আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।

ঝ। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) সংশ্লিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতি ও সমাধান

অনেক শ্রমিকের সরকারিভাবে প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নেই। এছাড়া নানা বাধার কারণে কিছু শ্রমিক চাকরি পাওয়ার জন্য ভুয়া NID জমা দিতে বাধ্য হন। যদিও এটি আইনসিদ্ধ নয়, তবুও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা সঠিকভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। এ ধরনের শ্রমিক সবসময় চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে থাকেন এবং আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কমিশনকে আরও জানানো হয়েছে যে বৈধ NID না থাকার কারণে অনেক মৃত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যদি শ্রমিকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেস) তৈরি করা হয় যেখানে NID বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে এ সমস্যা আরও বাড়তে পারে। এই প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoLE) শ্রমিকবৃন্দকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের NID সংশোধন ও নতুন NID সংগ্রহের সুযোগ দিতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার (GoB) শ্রমিকের ক্ষেত্রে NID না থাকলে জন্ম সনদের ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

ঞ। জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত জরিপ

জাতীয় পর্যায়ে জরিপে যে সব ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে এবং আঞ্চলিক, খাত ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর জরিপের অভাব চিহ্নিত হয়েছে, তা দূর করতে আইএলও-এর সর্বশেষ শ্রম পরিসংখ্যানবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিএলএস) ২০২৩ অনুসরণ করে পরবর্তী জরিপসমূহ পরিচালনা করা। কেননা এতে গৃহীত মানদণ্ডে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত করাকে জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কাজ ও কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান ও আয়, পরিবারের আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান সম্পর্কিত মানদণ্ড উন্নত করা হয়েছে।

৩.১.৪ আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় স্থায়ী জনবল কাঠামোর কোনো পদে আউটসোর্সিং বা ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে বাস্তবে এই বিধান কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত এই ব্যবস্থার কারণে সমাজের একটি অংশের সরকারি চাকরিতে প্রবেশ এবং সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার সীমিত হয়ে পড়েছে এবং একই কর্মস্থলে একই ধরনের কাজে স্থায়ী ও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরি, ওভারটাইম পেমেন্ট, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য শ্রম-সুরক্ষা বিষয়ে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এছাড়া আউটসোর্সিং সংস্থাগুলির অনেক ক্ষেত্রে শ্রম আইন অনুসারে দায়িত্ব পালন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। তারা সাধারণত শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে না। ফলে শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষার ঘাটতিসহ চাকরির নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়।

এ প্রেক্ষিতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সরকারি দপ্তর এবং সংস্থাগুলিতে স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং ভিত্তিক নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হবে। যারা ইতোমধ্যে স্থায়ী ধরনের কাজে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিযুক্ত আছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

খ) স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ না করার বিদ্যমান আইনি বিধান কার্যকর করা।

গ) এটি নিশ্চিত করা যে-

- আউটসোর্সিং বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ কখনও শ্রমিকদের আইনি অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।
- শ্রমিকদের মজুরি, সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য অধিকার যেন স্থায়ী শ্রমিকদের সমমানের হয়। অর্থাৎ "সমান কাজের জন্য সমান মজুরি" নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা।
- নিয়োগকর্তা এবং আউটসোর্সিং সংস্থার যৌথ দায়িত্ব কঠোরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঘ) শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে (DIFE) একটি নির্দিষ্ট এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা আউটসোর্সিং বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করবে।

ঙ) আউটসোর্সিং সংস্থাগুলিকে শ্রম আইনের অধীনে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মতো বাধ্যতামূলক নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য নীতিমালা প্রস্তুত ও কার্যকর করা। এতে শ্রমিকরা যে নিয়োগ ব্যবস্থার অধীনেই থাকুক না কেন, তারা ন্যায্য আচরণ, চাকরির নিরাপত্তা এবং প্রযোজ্য সামাজিক সুরক্ষা পাবেন।

৩.১.৫ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কাজের অধিকার ও শোভন কাজের নিশ্চয়তা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য সাফল্য (২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।) অর্জন করলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেই সাফল্যের প্রতিফলন ততটা সুস্পষ্ট নয়। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ৩.৩২ শতাংশ, সেখানে ২০১৩ থেকে ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৩৩ শতাংশে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হওয়ার পরও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির এই ধারা কেন নিম্নমুখী তা বিশ্লেষণ করা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান নীতির দিকনির্দেশনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বেকারত্ব, বিশেষ করে যুব বেকারত্ব, বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় সমস্যা। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ধারণা অনুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশের শ্রম বাজারে প্রায় ২২ লাখ শ্রমিক প্রবেশ করে (শিল্প দক্ষতা পরিষদ পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১)। তবে শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার এখনও মাঝারি মাত্রায় রয়েছে—৬১.২% (এলএফএস, ২০২২)। যেখানে পুরুষদের অংশগ্রহণ হার ৮০%, সেখানে নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র ৪২.৭৭%, যা লিঙ্গবৈষম্যের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে যদিও শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৬১.২% (এলএফএস ২০২২), যা ২০১৬ সালের ৫৮.২% থেকে উন্নীত হয়েছে, তবে লিঙ্গবৈষম্য একটি বড় সমস্যা।

দেশের শ্রমবাজারের মূল সমস্যা সমাধান এবং সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগানোর জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাভিত্তিক এবং টেকসই নীতি কাঠামো প্রয়োজন। তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন, নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং শ্রম অধিকার রক্ষায় কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টির অগ্রাধিকার ও কর্ম পরিকল্পনা

- কর্মসংস্থানকে বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় অগ্রাধিকার বিবেচনায় কর্মসংস্থান দশক ঘোষণা করে দেশে ও বিদেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করতে বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎপাদনশীল ও শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- বর্তমান শ্রম বাজার ও ভবিষ্যতের শ্রম জগতের পরিবর্তন, সম্ভাবনা, চাহিদা ও প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় সক্রিয় শ্রম বাজার নীতি (Active labour market policy) অনুসরণ করা এবং এজন্য জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২-কে হালনাগাদ করে নতুন 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি' প্রণয়ন করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে কর্মসংস্থান নীতি হালনাগাদ করা।
- বেকার ও শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় "কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর" স্থাপন করা।[2]
- কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করতে বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা, যার সদস্য থাকবে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সমিতি, শ্রমিক সংগঠন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- মর্যাদাপূর্ণ, শোভন ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে শক্তিশালী করা, যেন দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানকে এই কাজে সম্পৃক্ত করা যায়।
- জাতীয় শ্রম নিবন্ধন সিস্টেম ও ডাটাবেসকে গবেষণার কাজে লাগানোর উপযুক্ত করা।

গ) কর্ম সৃজন প্রণোদনা

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে শ্রমঘন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা আবশ্যক, এ লক্ষ্যে করনীতির সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সংখ্যক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে এবং তা কেবল টেকসই হলে আনুপাতিক হারে কর রেয়াতের সুবিধা দেয়া। এই ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের জন্য বিশেষ কার্যকর করা।
- কর্মসংস্থানকে কেন্দ্রে রেখে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। এই পরিকল্পনায় দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য যথাযথ প্রণোদনা রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া, যেন কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আহরণ করা যায়।
- বড় সরকারি/বেসরকারি প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে এবং প্রণোদনার ক্ষেত্রে শোভন কর্মসংস্থানকে শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, যেন এই প্রণোদনা পদ্ধতি শ্রমঘন খাতসমুহকে অধিকতর উৎসাহিত করে।

ঘ) স্বকর্মসংস্থান

- কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের পাশাপাশি স্ব কর্মসংস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি চালু করা। এক্ষেত্রে আগ্রহী নারী পুরুষদের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কার্যকর ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র চালু এবং মেন্টরশিপ এবং কমন ফ্যাসিলিটি চালু করা।
- স্ব কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি খাতকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এসএমই (SME) নীতিমালা সংস্কার করা এবং একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা।
- সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের অবসরপ্রাপ্তির পূর্বেই প্রশিক্ষণ দিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা চালু করা।
- বিশেষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, নারী ও বেকার যুবসম্প্রদায়সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

---

[2] শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠমোর বিস্তারিত রূপ দেখুন সেকশন ৪ এ।

ঙ) কর্মঘণ্টা ও কাজের সুরক্ষা ও বেকারত্বকালীন সুরক্ষা

- কর্মীদের সুস্থতা ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে সকল শিল্প, খাত, বিশেষায়িত শ্রম অঞ্চল, কর্মসংস্থানের ধরন, প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে আইন অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা কাজের সময় কার্যকর করা। যেসব কর্মস্থলে অতিরিক্ত কাজের সময় প্রয়োজন, সেগুলিকে ৮ ঘণ্টার শিফটে রূপান্তরিত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অব্যাহতি সাপেক্ষে অরিতিক্ত কাজের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।
- কর্মহীন সময়ের জন্য পুনঃদক্ষতা (re-skilling) ও উচ্চতর দক্ষতা (up-skilling)-এ সম্পৃক্ত করে বিকল্প কাজের সুযোগ তৈরি করা। এই ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আইন প্রয়োগের প্রয়োজনে জীবিকার উপকরণ যেমন; মাছ ধরার জাল, ব্যাটারি চালিত রিক্সা, ফুটপাতের দোকান, ইত্যাদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বিনষ্ট করলে শাস্তির বিধান চালু করা। এক্ষেত্রে পুনর্বাসন পরিকল্পনার আওতায় বিকল্প ব্যবস্থা করার বিধান বাধ্যতামূলক করা।
- শ্রম বাজারে প্রবেশের ছয় মাসের মধ্যে চাকরি না পেলে কাজের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষানবিস ভাতা চালু করা।
- চাকরিরত শ্রমিক বেকার হয়ে পড়লে নতুন চাকরি না পাওয়া অবধি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে বেকার ভাতা চালু করা। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মহীন শ্রমিকের পেশা ও দক্ষতা অনুযায়ী অন্যান্য সম্ভাব্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ খাতে কাজের সুযোগ তৈরির ব্যবস্থা করা।

৩.১.৬ দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই ব্যবসা

বাংলাদেশের শ্রমশক্তি নিম্ন দক্ষতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতার এবং নিম্ন আয়ের একটি দুষ্ট চক্রে জর্জরিত। বাংলাদেশের সকল খাতে নিম্ন উৎপাদনশীলতা বিদ্যমান। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে দক্ষ এবং উচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমিক তৈরি করা সম্ভব। এর জন্য জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি (২০২২), জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৭ পর্যন্ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি ২০২০), বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশল (২০১৯), জাতীয় শিক্ষা নীতি (২০১০)–এর মত বিভিন্ন নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা বিদ্যমান থাকলেও তার কোনো বাস্তবায়ন নেই। জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলেও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন অবকাঠামো নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশে দক্ষতা তৈরিতে বেসরকারি উদ্যোগে এবং দাতব্য এনজিও পরিচালিত স্কিলিং, আপ-স্কিলিং, রি-স্কিলিং, এন্টারপ্রেনারশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষাসনদ জাতীয় বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। তবে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। একদিকে দ্রুতবর্ধমান অর্থনীতিতে দক্ষ শ্রমিকের তীব্র সংকট বিদ্যমান; অন্যদিকে উচ্চ বেকারত্ব বিশেষত যুব বেকারত্ব আমাদের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রমের গুণগত মান এবং কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) কর্ম পরিকল্পনা ও সমন্বিত উদ্যোগ

- শ্রমবাজারের গতি প্রবণতা (dynamics) অনুযায়ী চাহিদার যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে, সেই চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসা এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এপেক্স বডির সাথে যৌথভাবে কারিকুলাম সহ অবকাঠামো, দক্ষ প্রশিক্ষক দল সৃষ্টি করে চাহিদা পূরণে প্রস্তুত হওয়া। এই কাজে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করে দেশের সরকারি, বেসরকারি সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এর জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

- দেশের জনশক্তিকে দক্ষ উৎপাদনশীল কর্মীবাহিনীতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান বিভাগের নেতৃত্বে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা আবশ্যক।
- অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ধারা ও গতি-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা উন্নয়নের বিদ্যমান অবকাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণে সক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলা জরুরি।
- দক্ষতা উন্নয়নে সরাসরি নিয়োগকারীর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যেন তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত জনবল তৈরি সম্ভব হয়।
- স্বল্প সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৫টি দেশের সঙ্গে মিউচুয়াল রিকগনিশন (এমআরএ) চুক্তি স্বাক্ষর করা, যেন বাংলাদেশি কর্মীবৃন্দের কর্মসংস্থান উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন খাতে বেশি হয়। পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক শ্রমবাজারের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় দেশগুলির সাথে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই এমআরএ স্বাক্ষর করা।
- কর্মপূর্ব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মকালীন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাঝে সমন্বয় সাধন।
- দক্ষতা ভবিষ্যৎ চাহিদা (skills anticipation) ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ও ডিজিটাল পদ্ধতির সংমিশ্রণে আরও শক্তিশালী করা, যেন দক্ষতা মানদণ্ড নিয়মিত উন্নত করা যায়।
- বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মদক্ষতা (soft skills) এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা তৈরির জন্য কারিকুলাম সংস্কার করা।
- সংশ্লিষ্ট আইনে পরিবর্তন এনে নারী, তরুণ, প্রতিবন্ধীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে বৈষম্য কমিয়ে আনা।
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট খাতে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

খ) নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

- শ্রমবাজারের গতি প্রবণতা (dynamics) অনুযায়ী চাহিদার যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে, সেই চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসা এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এপেক্স বডির সাথে যৌথভাবে কারিকুলাম সহ অবকাঠামো, দক্ষ প্রশিক্ষক দল সৃষ্টি করে চাহিদা পূরণে প্রস্তুত হওয়া। এই কাজে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। এই লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করে দেশের সরকারি, বেসরকারি সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা আবশ্যক।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রত্যন্ত প্রশাসনিক জেলাগুলিতে "কর্মসংস্থান কেন্দ্র" (employment exchange) স্থাপন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রগুলি নিয়োগকর্তা এবং সম্ভাব্য কর্মচারীদের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করতে পারে।
- দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান নীতি নির্ধারণী ও বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানগুলির বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর বিরোধী অবস্থান দক্ষতা উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম অন্তরায়। বিশেষ করে এনএসডিএ ও বিটিইবি-র ম্যান্ডেটের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় আনার জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে সমন্বয় বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া।

গ) শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবিস এবং বেকারত্বের সুরক্ষা

- একটি সর্বজনীন বেকারভাতা চালু সময়সাপেক্ষ বিধায় শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারী তরুণদের জন্য বিদ্যমান নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিকল্পিত শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবিস কর্মসূচি চালু করা, যেন কেউ কর্মহীন না থাকে। এজন্য একটি জাতীয় তহবিল গঠন করা।
- সম্ভাবনাময় নতুন পেশা চিহ্নিত করে বিশেষায়িত দক্ষতা সৃষ্টিকারী খাতগুলি চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত নীতি সহায়তা প্রদান এবং এই খাতগুলির জন্য দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা আবশ্যক।

ঘ) আর্থিক বরাদ্দ

- জাতীয় বাজেটে শিক্ষা বাজেটের অধীনে উপখাত হিসেবে অথবা আলাদা খাত হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- গবেষণা ও উন্নয়নের (R & D) লক্ষ্য ভিত্তিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টিতে শিল্প খাতকে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা ও দক্ষতা খাতে জাতীয় বাজেটে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রণোদনা

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সাথে কর্মসংস্থান ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় ব্যবসার টেকসই প্রবৃদ্ধি রোডম্যাপ প্রণয়ন। এই রোডম্যাপে টেকসই ব্যবসার মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
- বেসরকারি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা সৃষ্টি করা, বিশেষত যে খাতগুলির অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা রয়েছে।

চ) শিক্ষা সংস্কার ও কারিগরি শিক্ষার মর্যাদা

- জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং তার সাথে দক্ষতা নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি।
- গণহারে স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবসম্মত করতে কারিগরি শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- টিভিইটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ স্তরের ডিগ্রি সহ একটি জাতীয় যোগ্যতার কাঠামো প্রস্তুত করার জন্য কাজ করা, যাতে টিভিইটি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীবৃন্দ তাঁদের জীবনের যে কোনও পর্যায়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেন।

ছ) দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা

- সরকারি প্রকল্প ভিত্তিক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যাপক দুর্নীতির কারণে অপচয় হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল প্রকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে টেন্ডারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব আছে এমন প্রতিষ্ঠানের কাজ পাওয়া। এক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। প্রকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে রেটিং প্রথা চালু করা এবং ন্যূনতম রেটিং প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ করার ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা।
- দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর প্রকল্পসমূহে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বাতিল করা, এর ফলে দক্ষতা উন্নয়নের নামে দুর্নীতি ও নৈতিক সংকট (moral hazard) সমস্যা দূর হবে এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ খাতে বিনিয়োগ আসবে।

৩.১.৭ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তরণের প্রস্তুতি

যে কোনো শিল্প বিপ্লবের পরে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। কাঠামোগত পরিবর্তনের কালে ব্যাপক বেকারত্ব সৃষ্টি হলেও অর্থনীতির সম্প্রসারণের সাথে সাথে নতুন কর্মসংস্থান ঘটে। এক্ষেত্রে পুরনো অনেক দক্ষতার কাজের অবলুপ্তি ঘটে এবং নতুন দক্ষতা চাহিদার আবির্ভাব ঘটে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে এবং শ্লোগান সর্বস্ব অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ এর সুবিধা নিতে এখনও পেরে ওঠেনি। 4IR সহ পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে সকল খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। কর্মসংস্থানে ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর অন্য একটি দ্বিমুখী কৌশল প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

কর্মসংস্থানে সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবেলা

ক। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিয়ায়নের পরিকল্পনার আলোকে নিয়োগ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যৌথভাবে নিরূপণ করা, যেন আকস্মিক ছাঁটাইয়ের কারণে শ্রম অসন্তোষ দেখা না দেয়। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের জন্য সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন করা। এর মধ্যে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত খাতের শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

খ। নতুন দক্ষতার চাহিদা আগাম নির্ধারণ করে দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি খাত যৌথভাবে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। আর নতুন দক্ষতার ঘাটতি মেটাতে বিদেশি কর্মী নিয়োগ এমনভাবে করা যেন পর্যায়ক্রমে দেশীয় শ্রমিক দিয়ে চাহিদা মেটানো যায়। এক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি কর্মী নিয়োগের একটি গ্রহণযোগ্য অনুপাত নির্ধারণ করা, যেন দেশীয় কর্মীবৃন্দ শিখে নিয়ে দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

গ। প্রযুক্তি ভিত্তিক কর্মী প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কার্বন করের মত কর্মসংস্থান কর চালু করা, আর এই অর্থ শ্রমঘন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রণোদনা প্রদান ও ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের পুনর্বাসনে কাজে লাগানো।

ঘ। বিদ্যমান শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলিকে (Indsutry Skills Council) শক্তিশালী করা এবং অগ্রাধিকার শিল্পগুলিতে (স্বাস্থ্য, জৈবপ্রযুক্তি, শক্তির বিকল্প উৎস, রোবোটিক্স এবং অটোমেশন সহ) নতুন শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা যাতে প্রশিক্ষণের অগ্রাধিকারের মধ্যে নতুন দক্ষতা চাহিদা পূরণে সক্ষমতা গড়ে ওঠে।

ঙ। শ্রমিকের বিদ্যমান দক্ষতাকে আপগ্রেড করে উচ্চতর দক্ষতা চাহিদা মেটাতে সকল খাতের শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

চ। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের জন্য বিশেষ রি-স্কিলিং কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণপূর্বক নতুন কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রস্তুতি

ক। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট খাতে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত)-এ দক্ষতা অর্জনের জন্য জাতীয় কর্মসূচি চালু করা, যার মধ্যে স্কলারশিপ, পেশাদারি প্রশিক্ষণ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অন্তর্ভুক্ত রাখা।

খ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য প্রধান প্রযুক্তিসমূহ যেমন; AI, রোবোটিকস এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির, ক্লাউড কম্পিউটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং, বায়ো টেকনোলজি, শ্রমিকদেরকে প্রস্তুত করতে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করা এবং এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক শ্রমবাজার ও উদীয়মান শিল্পের চাহিদার সঙ্গে বেসরকারি খাতের সমন্বয় সাধন।

গ। শিল্প খাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে STEM স্নাতকদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ করা। নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া।

ঘ। গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্য ভিত্তিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টিতে শিল্পখাতকে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঙ। প্রযুক্তি নির্ভর স্টার্টআপ ও উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা ভিত্তিক ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ১০০টি ইনোভেশন এবং উদ্যোগ হাব (Innovation and Entrepreneurship Hub) তৈরি করা।

৩.১.৮ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং সুষম নগরায়ণ

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাজ করছে, যা অসম শিল্পায়ন, অপ্রতুল নীতিগত সহায়তা এবং শ্রমনীতি ও আইন সংস্কারের অভাবের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প ও কর্মসংস্থান কেবলমাত্র কয়েকটি শহর কেন্দ্রিক হওয়ায়, বিশেষ করে ঢাকায় অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ শহরগুলির অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। আবার বাংলাদেশের অনেক অনুন্নত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় শিল্প অবকাঠামোর অভাব রয়েছে, যার ফলে উচ্চ বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক সুযোগের সীমাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমশক্তিতে দৃশ্যমান এবং কাঠামোগত আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর জন্য সংস্কারকৃত শ্রমনীতি, শ্রম আইন, কর্মসংস্থান নীতি, শিল্প নীতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতির আলোকে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে টেকসই এবং শোভন কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।

খ) টেকসই ও সুষম নগরায়ণ এবং সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ এবং বহুমুখীকরণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা, যেন শ্রমের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে শহরমুখী (বিশেষত ঢাকা) অভ্যন্তরীণ অভিবাসী সমস্যার সুরাহা করা।

গ) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে শ্রমঘন শিল্প, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা/শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া, যার সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা থাকে।

৩.১.৯ খাতওয়ারি কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি এখনও কৃষি খাত, যা কম উৎপাদনশীল হলেও সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে। অন্যদিকে শিল্প খাত, যা উন্নত অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। সেবা খাত বড় আকারে কর্মসংস্থান করলেও এর সম্প্রসারণে ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক গিগ অর্থনীতির উত্থান নতুন সুযোগ তৈরি করলেও কর্মীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা এবং স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য বাংলাদেশ একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হয়ে উঠছে। কিন্তু গিগ কর্মীরা প্রায়শই কাজের ন্যায্য মজুরি এবং সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। একইভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও কর্মীদের অধিকারের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

কৃষি

ক) যারা কৃষিতে মজুরি বা অন্য কোনোভাবে অন্যের জমিতে শ্রম দেয় তাদেরকে কৃষিশ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করা।

খ) কৃষিশ্রমিকদের কোনো ধরনের শর্ত ব্যতীত শ্রম আইনের সুরক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) কৃষিশ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, জেলা ও জাতীয়ভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশন করার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান সন্নিবেশ করা।

ঘ) কমিশনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ইউনিয়ন করার সুপারিশ বিবেচনায় প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ১০০জন কৃষিশ্রমিক একত্রিত হয়ে সংগঠন করা এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও দরকষাকষি করার অধিকার নিশ্চিত করা।

ঙ) মজুরি, প্রাপ্য এসব বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালত যাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে তার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ব্যর্থ হলে কৃষিশ্রমিকদের শ্রম আইন ১২৪ (ক) অনুযায়ী শ্রম পরিদর্শকের কাছে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

চ) কৃষিশ্রমিকদের পেশাগত বিশেষ করে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

ছ) কৃষিশ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ) কৃষিশ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত, বিশেষ করে সামাজিক বিমায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

শিল্প

ক) শ্রমঘন শিল্পের প্রসার: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ, উৎপাদনশীলতার ঘাটতির প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিম্নমুখী প্রবণতার বাস্তবতায় শ্রমঘন শিল্পসমূহকে চিহ্নিত করে শিল্পে কর্মসংস্থান পরিকল্পনা প্রণয়ন, যাতে শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার আগামী তিন বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করা যায়।

খ) বৈচিত্র্যকরণ: শিল্পে এবং পণ্যে বৈচিত্র্য এনে এবং নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার জাতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া। রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্প, বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন তালিকা প্রণয়ন।

গ) ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন: পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী পরিবার ভিত্তিক, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞার সংস্কার করে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। পরিবার ভিত্তিক, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা ঋণ প্রাপ্তির মধ্যে সীমিত নয়। পণ্য ও সেবা উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে তাঁরা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। অতীতে ঘোষিত সুবিধাগুলিও এই উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়নি। কর্মসংস্থানের বাস্তবতায় এই আকারের প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তাঁরা অবহেলিত। পরিবার ভিত্তিক, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, যেন এই খাতে বিদ্যমান কর্মসংস্থানের দ্বিগুণ কর্মসংস্থান আগামী তিন বছরের মধ্যে করা যায়।

ঘ) প্রযুক্তির উন্নয়ন: টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তির আহরণ বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং তদানুযায়ী শ্রমিকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানো।

সেবা খাত

ক)শ্রমিকের স্বীকৃতি: সেবাখাতের কর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্য পণ্য খাত থেকে ভিন্ন। এই খাতে গত দুই দশকে নতুন নতুন কর্মসংস্থান যুক্ত হয়েছে। সেবাখাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমের আধিক্য রয়েছে। শ্রম আইনে সেবাখাতের সব শ্রমিকের স্বীকৃতি প্রদান করা।

খ) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: সেবা খাতে কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে খাতসমূহকে চিহ্নিত করে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি আগামী তিন বছরে তিনগুণ করা।

অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ভিত্তিক কর্মসংস্থান

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:

- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সংখ্যা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- একাধিক জায়গায় নিবন্ধনের পরিবর্তে একটি একক নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা।
- নতুন নিবন্ধিত অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি কর কাঠামো নির্ধারণ করা, যেন অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দকে কর হয়রানির আতঙ্কে থাকতে না হয়। এজন্য পরিষ্কার এবং পূর্বানুমেয় সামঞ্জস্য কাঠামো প্রণয়ন করা যেন তা উদ্যোক্তাবৃন্দের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়।
- যে কোনো ধরনের সিএমএসএমই নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত প্রণোদনাসহ প্রচারাভিযান চালানো।

খ) সিএমএসএমই ভিত্তিক জাতীয় পরিকল্পনা ও রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:

- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যেখানে সিএমএসএমই-র সংখ্যা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা, জিডিপিতে সিএমএসএমই-র অংশীদারিত্বের অনুপাত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক বরাদ্দ দেয়া। এটি ২০২৫-২৬ অর্থ বছর থেকেই শুরু করা। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরূপ:
- সিএমএসএমই-র সংখ্যা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৭.৮ মিলিয়ন থেকে ২০২৬ সালে ৮.২ মিলিয়ন, ২০৩০ সালে ৯.৪ মিলিয়ন এবং ২০৪০ সালে ১১.৯ মিলিয়নে উন্নীত করা।
- কর্মসংস্থানে সিএমএসএমই-দের অংশীদারিত্ব (অপ্রাতিষ্ঠানিকসহ) বাড়িয়ে ২০৪০ সালে ৬০ মিলিয়নে উন্নীত করা।

গ) স্থানীয় পণ্যের ক্লাস্টার ভিত্তিক উদ্যোগে নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া।

ঘ) অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্যের ডিজাইন, প্যাকেজিং, মার্কেটিং, পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, ব্রান্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সাথে সেবা

প্রদানের ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য, শুধু প্রশিক্ষণের জন্য একটানা দীর্ঘ সময় তাঁদের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয় না। আবার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ তাঁরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। এজন্য ব্লেন্ডেড লার্নিং এবং মাইক্রো লার্নিং পদ্ধতি চালু করা।

ঙ) পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা থাকলেও ঐতিহ্যগত বাজার ও বিপণন ব্যবস্থার যে বিবর্তন ঘটেছে, তার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাবৃন্দ পরিচিত নন অথবা খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হননি। এজন্য পণ্য বিপণন সেবা চালু করা এবং অনলাইন বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা।

চ) অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীবৃন্দ বাকিতে পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য হন এবং বিক্রিত পণ্যের মূল্য আদায়ে হয়রানি ও বিলম্বের শিকার হন। এর থেকে মুক্তির জন্য ডিজিটাল সরবরাহ ঋণ চালু করা।

ছ) অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের স্বার্থ এবং তাঁদের নিয়োজিত শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার্থে (যেমন; নিয়োগপত্র, কাজের সময়, মজুরি) উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া।

জ) গৃহভিত্তিক ও পারিবারিক শিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জড়িত। এই ধরনের শিল্প সুরক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেয়া এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে রক্ষার জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা।

ঝ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের পুঁজি ভিত্তিক খরচ কমানো ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য জেলা ভিত্তিক অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা (Common Facility) সৃষ্টি করে ভাড়া ভিত্তিক ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা।

ঞ) অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের ঋণ প্রবাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের পাশাপাশি ব্যাংকের ঋণ প্রক্রিয়া খরচ ভর্তুকি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া। মান্যতার ঘাটতি (Compliance deficit) মোকাবেলায় বিকল্প ক্রেডিট রেটিং বাধ্যতামূলক করা যায়। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সাফল্যকে আরও সম্প্রসারণ করা।

ট) সিএমএসএমই সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রণোদনা দেয়ার জন্য উপাত্ত ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে প্রতি দুই বছর পর পর জাতীয় জরিপ ও প্রতি পাঁচ বছরে শুমারি পরিচালনা করা।

শিক্ষাধীনতা

ক) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাধীনতা কর্মসূচি চালু করা। এক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পছন্দমত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেয়ার অধিকার থাকবে।

খ) শিক্ষাধীনতা কারিকুলাম এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন শিল্পের বর্তমান চাহিদাকে প্রতিফলিত করে। এই কারিকুলামের মূল উপাদানগুলি হবে:

- উপযোগী প্রশিক্ষণ: নির্দিষ্ট খাতের দক্ষতার চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, যা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, এনএসডিএ এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ অংশগ্রহণে প্রস্তুতকৃত।
- হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা: শিক্ষাধীন কর্মী যেন ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যা সমাপ্তির পরে তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
- নিয়মিত ফিডব্যাক: নিয়োগকর্তারা প্রোগ্রামের প্রাসঙ্গিকতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উপর নিয়মিত ইনপুট প্রদান করবেন। এর ফলে উত্তীর্ণদের নির্বিঘ্নে কর্মক্ষেত্রে সংযোজিত হতে সহায়তা করবে।

গ) অনানুষ্ঠানিক খাতের শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবিসের অতীত সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে এনএসডিএ-র অধীনে অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য পৃথক কর্মসূচি চালু করা।

ঘ) যে সব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ১০ কোটি টাকার বেশি, তাঁদের জন্য শিক্ষাধীনতা লেভি চালু করা, এই অর্থে যে শিক্ষাধীন কর্মী প্রস্তুত হবেন, তাঁরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লেভি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাবেন।

ঙ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলিকে (এসএমই) এই শিক্ষাধীনতা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া, যেন তাঁরা দক্ষ জনবল পেতে এই প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে পারে। এই আর্থিক প্রণোদনা শিক্ষানবিস ভাতা অথবা কর রেয়াতের মাধ্যমে হতে পারে।

চ) শ্রম বাজারে প্রবেশের আগে এবং পরে শ্রমশক্তির জন্য ব্যাপক ক্যারিয়ার সহায়তা কর্মসূচি চালু করা, যার আওতায় ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবিস কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা।

৩.২ মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা

মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা শ্রমিকের অধিকার এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কাজ যেমন প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য তেমনি প্রত্যেকের যোগ্যতানুসারে এবং প্রত্যেকে কমার্নুযায়ী— স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২০)। সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুচ্ছেদ ১৫ (খ)-তে যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিষয় উল্লেখ আছেঃ শ্রমিকদের মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ হতে হবে যেন তা শ্রমিক ও তার পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।[3] সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনার আলোকে প্রণীত শ্রমনীতি ২০১২-এর উদ্দেশ্যসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড অনুযায়ী শোভন কাজ নিশ্চিত করা, শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রম বাজারে মজুরি সংক্রান্ত নানা বৈষম্য ও সমস্যা বিদ্যমান, যা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকবৃন্দ প্রাতিষ্ঠানিক খাতের তুলনায় যথাযথ ন্যায্য মজুরি থেকে অধিকতর বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকবৃন্দ ওভারটাইম কাজ করলেও যথাযথ ভাতা পান না এবং বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধির কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা নেই। উপরন্তু শ্রমিকবৃন্দ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুনাফার অংশীদার হন না। মজুরি পরিশোধে অনিয়ম, বিলম্ব ও বিভিন্ন অবৈধ কৌশল শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তাকে দুর্বল করে তুলছে।

বেশিরভাগ শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি পেয়ে থাকলেও সেটি দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকায় তারা আর্থিক সংকটে ভুগছেন। শ্রমিকদের অধিকাংশের আয় দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকে, বিশেষ করে কৃষি, চা শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, রিকশা শ্রমিক এবং গৃহ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই চিত্র প্রকট। কম মজুরির কারণে শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা তাদের জীবনমানের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। বিশেষত, খাতভিত্তিক মজুরির মানদণ্ডের অনুপস্থিতি শ্রমিকদের আয়কে অনিশ্চিত করে তুলেছে। ফলে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ হয় মালিকপক্ষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে মজুরির অসামঞ্জস্যতা এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যও একটি বড় সমস্যা। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কেয়ার ওয়ার্কারস, গৃহশ্রমিক, রাইড শেয়ারিং কর্মী, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মী এবং হকারদের মতো পেশায় কর্মরত শ্রমিকরা নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরির অভাবে সবসময় আর্থিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় থাকেন।

বাংলাদেশে সম্পদের ব্যবধান, অর্থাৎ ধনী-গরীবের ব্যবধান স্বাধীনতার পর থেকে আরও বিস্তৃত হয়েছে, যা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। শীর্ষ আয়ের মানুষের সঙ্গে নিম্ন আয়ের মানুষের আয়ের ব্যবধান আকাশচুম্বী।[4] ২০২১ সালে গিনি সহগ ০.৪৯৯-এ পৌঁছে যায় এবং দেশের ১০ শতাংশ শীর্ষ ধনীর কাছে জমা বেড়ে হয়েছে মোট আয়ের ৪০.৯২%। আরও ভয়াবহ হলো দেশের সবচেয়ে ধনী ৫% মানুষের আয় এখন দেশের মোট আয়ের প্রায় ৩০%। অর্থাৎ দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ আয় যাচ্ছে দেশের ধনী ৩০ শতাংশ মানুষের হাতে এবং বাকি ৭০ শতাংশ মানুষের আয় মোট আয়ের অবশিষ্ট ১ ভাগ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ এখন উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

৩.২.১ সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এবং খাত, অঞ্চল ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি

বাংলাদেশে কোনো সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা নেই। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ মজুরি বোর্ড কিছু কিছু খাতে ন্যূনতম মজুরি বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করেছে। মজুরি বোর্ড ঘোষিত বিভিন্ন খাতের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির তালিকা থেকে মজুরির যে হার দেখা যায়, তা অবিশ্বাস্য ভাবে কম। ঘোষিত খাতগুলির ন্যূনতম মজুরির হার

[3] এছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ১৪-তে বলা হয়েছে যে, *"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী (মেহনতি) মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা"।* অর্থাৎ রাষ্ট্র কৃষক ও শ্রমিকসহ জনগণের শোষণমুক্তি নিশ্চিত করবে এবং সমাজের সকল শ্রেণির ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করবে।

[4] World Inequality Database (2021) World Inequality Report 2022 - WID - World Inequality Database https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/#:~:text=The%20World%20Inequality%20Report%202022%20presents%20the%20most,than%20one%20hundred%20researchers%20from%20around%20the%20world.

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৩৯টি খাতের ২২টিতেই ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি দারিদ্র্য সীমা থেকে কম।[5] এই তালিকা অনুসারে স' মিলে নিম্নতম মজুরি সব থেকে বেশি (১৭,৯০০ টাকা), এরপর রয়েছে নির্মাণ ও আসবাবপত্র শিল্পে (১৬,২৪০ টাকা), তার জাহাজ ভাঙা শিল্পে (১৬,০০০ টাকা)। অনেক খাতের মজুরি গত চল্লিশ বছরেও হাল নাগাদ করা হয়নি। অনেকগুলি খাতে শ্রমিকের পাশাপাশি কর্মচারীর ন্যূনতম মজুরিও ঘোষিত হয়েছে। এখানেও ১৮টি খাতে কর্মচারীর মজুরি দারিদ্র্য সীমার নিচে। শ্রমিক-কর্মচারী উভয়ের জন্য সবখাতের ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি জীবনী মজুরির (living wage) অনেক নিচে।

জীবন ধারণ উপযোগী মজুরি (living wage) ও প্রকৃত গড় মজুরি তুলনা করলে বোঝা যায়, কম মজুরিতে জীবন যাপনের জন্য শ্রমিক ও তার পারিবারিক জীবনে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে। তার মধ্যে রয়েছে চরম দারিদ্র্যে নিকৃষ্ট জীবনধারণ, অপুষ্টি ও ঋণ চক্র।

নিম্ন মজুরির কারণে উৎপাদনশীলতা কমে এবং কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কম হয়। শিল্প-কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণগুলি হচ্ছে মজুরি ও ওভারটাইম বোনাস পরিশোধে বিলম্ব (বিশেষত ঈদ কেন্দ্রিক) (৭৬.৭ শতাংশ), মজুরি (বা পিস রেট) বৃদ্ধির দাবি (৫২.২ শতাংশ), দীর্ঘ সময়ের বকেয়া পারিশ্রমিক (২১.৩ শতাংশ)।

ব্যাপক বেকারত্বের সঙ্গে বিদ্যমান মজুরি কাঠামো ও বৈষম্য একটি অসহনীয় অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে, শ্রমখাতের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তার একটি প্রকাশ মাত্র। এই অসন্তোষ বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতার অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে।

সর্বজনীন জাতীয়, খাত, অঞ্চল ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি

- বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের জন্য একটি সার্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা, যার ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিকসহ সকল খাতের নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি অর্থনীতির সকল খাত এবং সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে মজুরির মানদণ্ড না থাকায়, এই খাতে মজুরি বৈষম্য দূর করতে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক।
- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মর্যাদাকর জীবনযাপন উপযোগী মজুরি/বেতনের (living wage) ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা।
- সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রতি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ করা এবং প্রতি বছর সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার মান বিবেচনায় সমন্বয় করা।

খ) সেক্টর/খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি

- জাতীয় ন্যূনতম মজুরিকে ভিত্তি হিসেবে রেখে কাজের প্রকৃতি, খাতভিত্তিক চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ, ঝুঁকি এবং অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য বিবেচনায় বিশেষ খাত ও পেশার জন্য পৃথক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি কোনো অবস্থাতেই জাতীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হবে না; বরং তা অবশ্যই জাতীয় ন্যূনতম মজুরির সম পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক হবে।
- বিশেষ খাত ও পেশার ক্ষেত্রে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি জাতীয় ন্যূনতম মজুরির থেকে কম হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় ন্যূনতম মজুরির সম পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

গ) যৌথ দরকষাকষি

বিশেষ খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আইনগত যৌথ দরকষাকষির অধিকার বহাল রাখা। যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি জাতীয় বা খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হতে পারবে না।

---

[5] অন্য পাঁচটি খাতের ঘোষিত মজুরি পিস রেটে অথবা দিন হিসেবে প্রদত্ত হয়।

ঘ) মজুরি নির্ধারণে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য শ্রম, শ্রম অর্থনীতি ও মজুরি বিষয়ে অভিজ্ঞ/দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ এবং শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করা।
- সেক্টর/খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশনের অধীনে এক বা একাধিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ কমিটি গঠন করা।
- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশনের কাঠামো ও কার্যপরিধিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কার/সংশোধন করা।
- মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে যৌথভাবে নিয়মিত সংলাপের আয়োজনের বিধান রাখা এবং ন্যায্য মজুরির সুফল বিষয়ে গবেষণা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা।

ঙ) মজুরি বৈষম্য নিরসন

- মজুরি কাঠামোয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে ভারসাম্য নিশ্চিত করা।
- সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে মজুরি বৈষম্য কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীসহ সকল শ্রমিকের জন্য সমান মজুরি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা। জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে শ্রমিকের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন যেন সংগতিপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করা।

৩.২.২ মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড ও মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি

বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অধিকাংশ খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। মজুরি নির্ধারণের বর্তমান কাঠামো যুগোপযোগী নয়, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে ন্যায্য মজুরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ন্যূনতম মজুরি/বেতন/পারিশ্রমিকের স্তরসমূহ নির্ধারণ এবং ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ফরমুলা নির্ধারণ কঠিন। যদি ন্যূনতম মজুরি খুব কম নির্ধারণ করা হয়, তবে শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে মানবেতর জীবন যাপনের দিকে ঠেলে দেয়, যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মৌলিক উদ্দেশ্য কর্মক্ষম নাগরিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার ন্যূনতম স্তর নিশ্চিত করা, মজুরি বৈষম্য নিরসন করা, বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য। এছাড়াও ন্যূনতম মজুরি নীতি, কর্মসংস্থান নীতির একটি উপাদান, যেখানে যুব কর্মসংস্থান কৌশলে তরুণ কর্মীবৃন্দের জন্য সুবিন্যস্ত মজুরি/বেতন কাঠামো সৃষ্টির ভিত্তি প্রস্তুত করে।[6]

মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড ও মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক. মজুরি কাঠামো মানদণ্ড

- পরিবারের একক উপার্জনকারী ব্যক্তিকে বিবেচনা করে ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ নির্ধারণ করা, যাতে একজন শ্রমিকের আয় তার পরিবারের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়।
- মোট মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল মজুরি, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং যোগাযোগ ভাতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মূল মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে ভাতা-সহ ঘোষিত মোট মজুরির ৫৮% এর কম না হয়।
- অন্য সকল ভাতা, যথা: খাদ্য ভাতা, পরিবহণ ভাতা, শিক্ষা ভাতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে চালু থাকা রেশন সুবিধা মজুরি কাঠামোর বাইরে রাখা।
- পিসরেট বা ঠিকা ভিত্তিক কাজের মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে আট ঘণ্টার কাজের বিনিময়ে একজন কর্মী ন্যূনতম মজুরির সমান আয় নিশ্চিত করতে পারেন।

[6] ILO (2014) General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135). Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution). Report III (Part 1B), - Geneva, pg. 200.

খ. মানদণ্ডভিত্তিক জাতীয় মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি ও উপাত্ত

- মাসিক পারিবারিক খাদ্য ব্যয়: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত বেঁচে থাকার জন্য সুষম খাদ্য তালিকা এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নির্ধারিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গড় বাজার দর। আর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ধরা হবে সরকারি পে-স্কেলের নির্ধারিত সংখ্যায়।
- মাসিক পারিবারিক বাসস্থান ব্যয়: জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত চার সদস্যের পরিবারের জন্য বাসস্থানের পরিমাণ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নির্ধারিত গড় ভাড়া অনুসারে এই ব্যয় নির্ধারণ করা। এখানে কর্মীর নিজস্ব বাসস্থান আছে কি না, তা বিবেচনায় নেওয়া হবে না।
- মাসিক পারিবারিক স্বাস্থ্য ব্যয়: পরিবার প্রতি গড়ে চারজন ধরে, স্বাস্থ্যবিমার ন্যূনতম প্রিমিয়াম অথবা বাংলাদেশ খানা আয়-ব্যয় জরিপ এবং বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ অনুসারে মূল্যস্ফীতি সমন্বিত গড় স্বাস্থ্য ব্যয়।
- মাসিক পারিবারিক শিক্ষা ব্যয়: পরিবারে গড়ে দুইজন সদস্য ধরে বাংলাদেশ খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি সমন্বিত গড় শিক্ষা ব্যয়।
- মাসিক পারিবারিক সামাজিক ও বিনোদন ব্যয়: ব্যক্তিগত (যেমন; যত্ন, পোশাক, জুতা, আসবাবপত্র, মোবাইল, ইন্টারনেট, আর্থিক লেনদেন), সামাজিক (যেমন; অতিথি আপ্যায়ন, উপহার, পারিবারিক অনুষ্ঠান) এবং বিনোদন (যেমন; সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ভ্রমণ, বাইরে খাওয়া) খাতে পরিবারের চার সদস্য বিবেচনায় এই ব্যয় নির্ধারণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে এই খাতের ব্যয় মোট মজুরির ১০ শতাংশ হিসেবে ধরা হবে। তবে গবেষণা-উপাত্ত অনুযায়ী পরবর্তী কালে তা সংশোধনযোগ্য।
- মাসিক পারিবারিক যাতায়াত ব্যয়: পরিবারের চার সদস্য ধরে মৌসুমভিত্তিক যাতায়াত, কর্মস্থলে যাতায়াত, সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াত এবং দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত বিবেচনায় এই ব্যয় নিরূপণ করা হবে।
- ন্যূনতম মাসিক সঞ্চয়: সর্বজনীন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে আইএলও-এর জীবন ধারণ উপযোগী মজুরি নির্ধারণের অনুসরণীয় নীতিমালা অনুযায়ী শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক সঞ্চয়ের অনুপাত নির্ধারণ করা।
- উপরি-উক্ত সকল ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও মানদণ্ড ব্যবহার করা।

৩.২.৩ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যৌক্তিকীকরণ ও পিসরেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণ

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো কোনো খাতে মজুরি বৃদ্ধির পর শ্রমিকদের জন্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের কাজটি এবং পিসরেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণ একপাক্ষিক ভাবে মালিকের পক্ষ থেকে করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকের মতামত নেয়ার কোনো সুযোগ রাখা হয় না। এক্ষেত্রে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

- পিসরেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণের জন্যে একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া তৈরি করা, যাতে প্রযোজ্য শিল্পে নির্দিষ্ট কাজ ভিত্তিক শ্রমিকের জন্য 'সর্বোচ্চ এবং/অথবা সর্বনিম্ন দৈনিক পিস তৈরির লক্ষ্যমাত্রা' এবং পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণ করা যায়।
- এ লক্ষ্যে কারখানা পর্যায়ে নিয়োগকারী ও শ্রমিক পক্ষ এবং টাইম-স্টাডি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় শ্রমিকের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং মজুরি ঠিক করা।
- যে সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়ন থাকবে, সেখানে এই টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩.২.৪ মজুরি বৃদ্ধির হার ও মজুরি পরিশোধ প্রক্রিয়া

মজুরি বৃদ্ধির মানদণ্ড নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির হার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণের ক্ষেত্রে গড় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। মজুরি বৃদ্ধির হার নির্ধারণের জন্য আইএলও'র ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত দলিল "Meeting of experts on wage policies, including living wages" অনুসরণ করা যেতে পারে।.

খ) সকল মজুরি ও ভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক করা।

৩.২.৫ শ্রমিকদের অর্জিত প্রাপ্য

একজন শ্রমিকের বেতন ভাতা সহ যাবতীয় উপার্জন প্রাপ্তি মৃত্যু, যে কোনো ধরনের চাকরিচ্যুতি বা অন্য কোনো কারণে বঞ্চিত করা শ্রম অধিকার ও মানবাধিকার পরিপন্থী। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নানা অজুহাতে শ্রমিকবৃন্দ তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, যা তাঁদের পরিবারকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে। এক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের।

শ্রমিকদের অর্জিত প্রাপ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য দুই বছরের চাকরির শর্ত বাতিল করে এক বছর করা।

খ) শ্রমিককে কোনো কারণেই তার অর্জিত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। বরখাস্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার বিধান বাতিল করে শ্রমিকদের পূর্ববর্তী চাকরির ভিত্তিতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বা গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা।

গ) গ্র্যাচুইটি বা ক্ষতিপূরণ শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধা, যা থেকে তাদের কোনোভাবেই বঞ্চিত করা যাবে না। যেহেতু গ্র্যাচুইটি বা ক্ষতিপূরণ শ্রমিকদের পূর্বের সেবার বা চাকরির সাথে সম্পর্কিত, তাই শ্রমিকদের চাকরি যেভাবেই শেষ হোক না কেন, সবার জন্য গ্র্যাচুইটি বা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আইনি নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৩.২.৬ বাধ্যতামূলক তহবিল ও আপদকালীন মজুরি বিমা

অনিয়মিত মজুরি, বকেয়া বেতন একটি স্থায়ী সমস্যা। আর ছাঁটাই জনিত আয় হারানো, একটি শ্রমিক পরিবারকে চরম দুর্দশা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের ছাটাইয়ের গুরুতর পরিণতি অব্যাহত রয়েছে যা নতুন সামাজিক বিমা কর্মসূচির বিবেচনায় আনতে বাধ্য করে। মজুরি বিমা একটি অভিনব নীতি, যার মাধ্যমে চাকরিচ্যুত শ্রমিক যারা চাকরি হারায় এবং কম মজুরিতে পুনরায় নিযুক্ত হয়, অস্থায়ীভাবে সেই শ্রমিকদের আয়ের ব্যবস্থা করে।

বাধ্যতামূলক আপদকালীন তহবিল ও মজুরি বিমা বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) রপ্তানিমুখি শিল্পের সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধ প্রক্রিয়ার কখনো কখনো ব্যত্যয় ঘটতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীর মূল্য পরিশোধ করতে সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত শ্রমিকরাই দুর্ভোগের শিকার হয়। প্রায়শই প্রতিষ্ঠানের পুর্বপ্রস্তুতির অভাবে শ্রমিকের দুর্ভোগ বাড়ে ও প্রশাসন অসহায় বোধ করে এবং জনদুর্ভোগও বাড়ে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় কমিশন মনে করে রপ্তানিমুখি শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার একটি আপদকালীন তহবিল গঠন করবে, যেখানে নিয়োগকারী কারখানা/প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ২ মাসের মজুরি/বেতনের সমপরিমাণ টাকা উক্ত তহবিলে জমা রাখবে। এই তহবিল প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারী, সরকার ও উক্ত শিল্পের মালিকদের এসোসিয়েশনের (যদি থাকে) যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। তবে কোনো কারণে নিয়োগকারীর অবর্তমানে সরকার জরুরি পরিস্থিতিতে নিজস্বভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

খ) দেউলিয়া আইনের সংশোধন করে প্রথমে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করা, তারপর সরকারের পাওনা পরিশোধ নিশ্চিত করা।

গ) একটি জাতীয় মজুরি নিশ্চয়তা বিমা স্কিম চালু করা, যাতে করে কোনো প্রতিষ্ঠান মজুরি প্রদানে ব্যর্থ হলে, কোনো শ্রমিক ছাঁটাই হলে, পুনরায় কম বেতনে নিযুক্ত হলে, এই বিমার আওতায় তা পরিশোধ করা যায়। এই বিমা স্কিমে নিয়োগকারী ও সরকার বাৎসরিক অর্থ প্রদান করবে। এই স্কিমের ব্যবস্থাপনা কমিশনের আওতায় রাখা যেতে পারে।

৩.২.৭ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা

ন্যূনতম মজুরি নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মজুরি বাস্তবায়ন এবং কার্যকারিতা। যুক্তরাজ্যে কঠোর নিয়ন্ত্রক তদারকি এবং জরিমানা ব্যবস্থা চালু করেছে, যা ন্যায্য শ্রম অনুশীলন বজায় রাখতে সাহায্য করে (UK Government, 2023)। অন্যদিকে বাংলাদেশ বড় আকারের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, দুর্বল শ্রম সুরক্ষা এবং কাঠামোগত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় (Government of Bangladesh, 2014)। ILO

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি নীতি কাঙ্ক্ষিত সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়। কারণ এটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না, যার ফলে শ্রমিক শোষণ, মজুরি দমন এবং স্থায়ী দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়।[7] এক্ষেত্রে যথাযথ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

এপ্রেক্ষিতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রতি মাসের মজুরি পরিশোধের তথ্য অনলাইনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে (DIFE) জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখা। অধিদপ্তর শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি সংক্রান্ত বিধান বাস্তবায়ন করবে এবং মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণ দপ্তর ও জেলা-উপজেলা প্রশাসন এই বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে জাতীয় ও সেক্টরভিত্তিক মজুরি বাস্তবায়নের তথ্য প্রকাশ করা। এই তথ্য ত্রিপক্ষীয়ভাবে পর্যালোচনা করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যবহার করা।

গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের বিধান সংযোজন করা।

ঘ) মজুরি প্রদান বকেয়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে যৌক্তিক সময়কাল পূর্বেই তা শ্রমিক ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে লিখিতভাবে জানানো। আইন দ্বারা নির্ধারিত তারিখের সাতদিন আগে বিলম্বের বিষয়ে শ্রমিককে অবহিত করা। সেক্ষেত্রে ডাইফি'র মধ্যস্থতায় শ্রমিক ও নিয়োগকারীদের প্রতিনিধির মতামতের ভিত্তিতে মজুরি প্রদানের তারিখ নির্ধারিত হবে। পুনর্নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মজুরি প্রদান করা না হলে উক্ত তারিখের পর হতে নির্দিষ্ট ০.৫% হারে ক্ষতিপূরণ (সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য) নির্ধারণ করা।

ঙ) যদি ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে মজুরি বকেয়া থাকে, তাহলে বিদ্যমান আইনের বিধান কার্যকর হবে।

৩.২.৮ সম্পদবৈষম্য ও ন্যায্য হিস্যা

শ্রম আইন অনুসারে একটি কোম্পানিকে তার নিট মুনাফার ৫% 'শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল', কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ৮০:১০:১০ অনুপাতে প্রদান করতে হয়। আইন অনুযায়ী প্রতিটি শ্রমিক-কর্মচারী সমান অনুপাতে শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিলের সুবিধাভোগী এবং তহবিলে অংশগ্রহণের যোগ্য। তবে যে শ্রমিক-কর্মচারী এক বছরে তাদের চাকরির ৬ মাস শেষ করেননি, তারা সেই বছরের ক্ষেত্রে তহবিলে অংশ নেওয়ার যোগ্য নন।

মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছে।

ক) শ্রমিকদের (উপকারভোগী) মুনাফা ভাগের বিদ্যমান বিধান বহাল রাখা এবং তা সকল শ্রেণীর শ্রমিকের— যারা বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত এবং যেগুলি লাভজনকভাবে পরিচালিত হয়—মধ্যে সম্প্রসারিত করা এবং এক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত প্রাপ্য নিশ্চিত করা।

খ) বর্তমানে স্পষ্ট নিয়মের অভাবে কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা ও অসংগতি থাকায় প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ তহবিল লিখিত ও নির্দিষ্ট বিধি-বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত করা।

গ) স্বচ্ছতার স্বার্থে তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ট্রাস্টি বোর্ডকে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও ক্ষতির পূর্ণ তথ্য জানার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক দলিলাদি যাচাই করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।

ঘ) সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান করা।

৩.২.৯ শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই ব্যবসা

শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাবৃন্দ ন্যায্য মজুরির ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করেন, সেগুলি হলো: নিম্ন দক্ষতা, উচ্চ উৎপাদন খরচ, উৎপাদিত পণ্যের নিম্ন বিক্রয় মূল্য, রপ্তানি খাতে বিদেশি ক্রেতাদের সাথে সীমিত দরকষাকষির সক্ষমতা

[7] International Labour Organization. (2022). *Global Wage Report 2022–23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power.* Geneva: International Labour Office. Retrieved from /mnt/data/ILO%20Wage%20Report%202024.pdf

এবং দুর্নীতি। একথা অনস্বীকার্য যে ব্যবসার অনানুষ্ঠানিক আর্থিক খরচ এবং জটিল আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক জটিলতা একদিকে অনানুষ্ঠানিক খাতকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় আসতে বাধাগ্রস্ত করছে, অন্যদিকে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। উচ্চ উৎপাদন খরচের জন্য যেসব বিষয় দায়ী, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর কাঠামো, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, ব্যবসা নিবন্ধন এবং পরিচালনায় জটিল ও বহুমাত্রিক অনুমোদন প্রক্রিয়া, প্রভাব ও ঘুষ ছাড়া সহজে ও দ্রুত অনুমোদন না পাওয়া, সাপ্লাই চেইনের অদক্ষতা ইত্যাদি।

উৎপাদনশীলতা ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের সমন্বয়ের জন্য প্রণীত আইএলও-র শোভন কাজের উৎপাদনশীলতা প্রতিবেশ অনুসারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে:

ক) জাতীয় পর্যায়

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং টেকসই এন্টারপ্রাইজ বিকাশের কাঠামোগত বাধা শনাক্ত করতে নীতিগত পরিবেশের মূল্যায়ন, যার মাধ্যমে অর্থনীতির ডিজিটাল এবং সবুজ রূপান্তর সংঘটন।
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কাজের পরিবেশ, উদ্যোক্তা, উদ্ভাবন এবং আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য ব্যাপক কৌশল এবং নীতিগত সংস্কার।
- উৎপাদনশীলতা এবং শালীন কাজের উপর অর্থপূর্ণ সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালী করা।

খ) খাত ভিত্তিক

- উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও উন্নত কর্মসংস্থানের জন্য কাঠামোগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করতে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার খাতভিত্তিক মূল্যায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ন ।
- অভীষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ভ্যালু চেইন, বিধি ও সহায়ক কার্যাবলির কার্যকারিতা উন্নত করে এবং খাত ভিত্তিক উৎপাদনশীলতা ও উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অর্থবহ সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালী করে উচ্চ-অগ্রাধিকার খাত গুলিতে উৎপাদনশীলতা ও কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া।

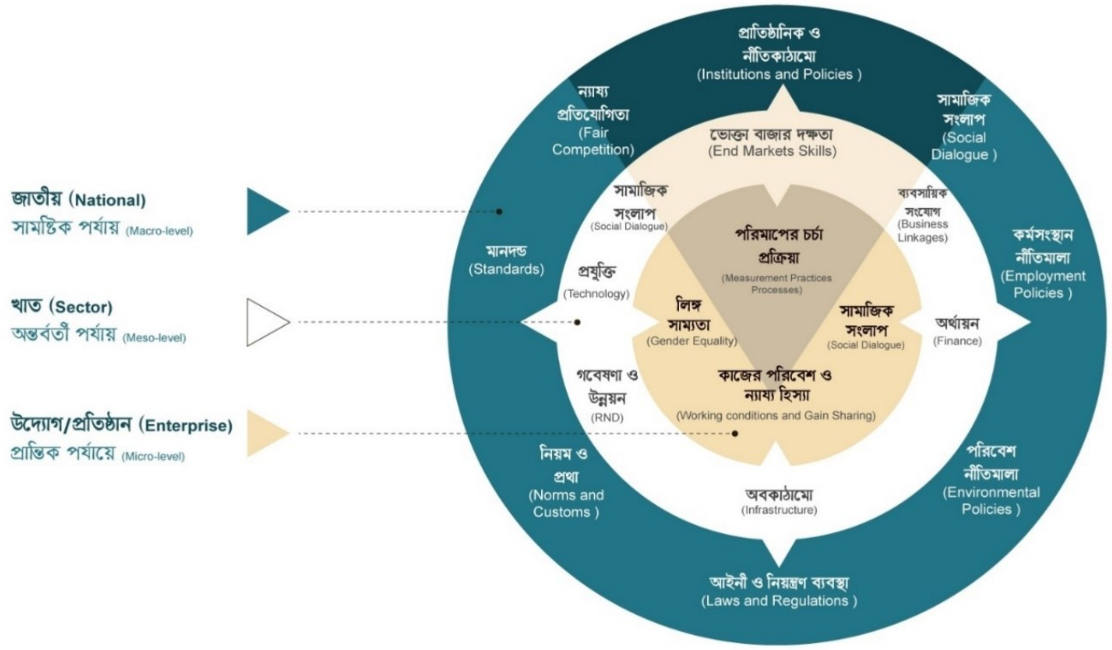

চিত্র ৩.২.৩ আইএলও প্রণীত শোভন কাজের উৎপাদনশীলতা প্রতিবেশ

গ) প্রতিষ্ঠান পর্যায়

- ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ, কাজের অবস্থার উন্নতি, অর্থপূর্ণ সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালী করা, সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি, টেকসই উৎপাদনে রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা, ব্যবসায়ের টিকে থাকার সক্ষমতা ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি এবং কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত করতে এবং ন্যূনতম দক্ষতার স্তর এবং অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ।

- টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ।

ঘ) উচ্চ উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কর কাঠামোর সংস্কার করা, যেন পরোক্ষ কর কমিয়ে প্রত্যক্ষ করের সঙ্গে সমন্বয় করা যায়। এছাড়া আমদানি শুল্ক এমনভাবে সমন্বয় করা, যেন তা দেশীয় শিল্প বিকাশে ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

ঙ) মজুরি সংক্রান্ত আইএলও -র সনদ সমূহ অনুস্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

চ) আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ওয়ান স্টপ পদ্ধতি চালু করা, ব্যবসা নিবন্ধন এবং পরিচালনায় জটিল ও বহুমাত্রিক অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা।

ছ) সাপ্লাই চেইনের অদক্ষতা দূর করতে ডিজিটাল পদ্ধতি ও প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানোর প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন ও এতে বিনিয়োগ করা।

জ) মালিক ও উদ্যোক্তাবৃন্দের মানসিকতা পরিবর্তনে রাষ্ট্রকে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতি ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিদ্যমান নিম্ন দক্ষতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, নিম্ন মজুরি, অধিক বৈষম্য ও অস্থিতিশীলতার চক্র থেকে বের হয়ে নিয়োগকারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার কাজ একই সঙ্গে চলমান রাখা।

ঝ) মজুরিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ন্যায্য মজুরিকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা।

৩.৩. নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য – একটি মানবাধিকার, যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির মৌলিক ভিত্তি। জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হওয়া উচিত এবং এর বাস্তবায়ন সরকার, মালিক ও শ্রমিকসহ সকল অংশীদারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হবে। ২০১৩ সালে প্রণীত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালায় শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক এবং সরকারের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। আইনের ৫ম থেকে ৮ম অধ্যায়ে কর্মস্থলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা সুবিধা সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষত, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখার বিধানসহ, শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন ২০২২ এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে মৌলিক কনভেনশন ১৫৫ এবং ১৮৭ সম্মান করার দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং এ দুটি কনভেনশন অনুসাক্ষর করা জরুরী।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬-এ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার এবং ন্যায়সঙ্গত ও সুবিধাজনক কর্মের অধিকার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর প্রথম অধিবেশনে পেশাগত স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত করা হয়। যা ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত ১২তম অধিবেশনে সংজ্ঞাটি নিম্নরূপে সংশোধন করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে:

(ক) সকল পেশায় শ্রমিকদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের সর্বোচ্চ পর্যায়ের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) শ্রমিকদের মধ্যে তাদের কাজের পরিবেশের কারণে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ দূর করা;

(গ) স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল কারণগুলির ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা;

(ঘ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিরূপ প্রভাব থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা;

(ঙ) শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেশাগত নিরাপদ পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা।

এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) লক্ষ্য ৮.৮ এবং ৩.৯-এ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং কর্মস্থলে পরিবেশগত দূষণ ও বিপজ্জনক রাসায়নিকের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার অঙ্গিকার রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরসহ নির্মাণ, পোশাক, চামড়া, পরিবহণ ও গৃহশ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

বহু খাতে শ্রমিকরা অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হন, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কেয়ার ওয়ার্কারস, গৃহশ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, চামড়া শিল্পের কর্মী, বন্দর শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক, চা শ্রমিক এবং জাহাজ ভাঙা শিল্পের শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করেন, যেখানে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

৩.৩.১। সবার জন্য নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও নীতিমালা সর্বজনীন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং হালনাগাদ করা।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অধিকারকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ বিধান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল-২০১৯, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করছে। এতদসত্ত্বেও পেশাজীবী এবং শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা এবং রোগব্যাধি রোধ করার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সুনিদিষ্ট কোনো সংজ্ঞা" নেই। সঠিক সংজ্ঞা ও দিকনির্দেশনা না থাকার কারণে শ্রমিকদের ঝুঁকি, নিরাপদ পরিবেশ নিরূপণ সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। সেই জন্য আর্ন্তজাতিক শ্রমমান মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ একজন শ্রমিক যদি মনে করে কাজ করলে তার মৃত্যু বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, তাহলে কাজকে না বলার কোনো বিধান নেই। যদিও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ তফসিল ৪-এ সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সেইফটি কমিটির বিপজ্জনক কাজ নিষিদ্ধ করার এখতিয়ার রয়েছে, কিন্তু শ্রমিকের সরাসরি কাজকে না বলার কোনো বিধান নেই। এছাড়া দেশের সকল প্রকার শ্রমকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় বিভিন্ন গ্রেডে/মাত্রায় ভাগ না করার জন্য সঠিক ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৩২৩ অনুযায়ী সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠন করে। কিন্তু বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা না থাকায় কাউন্সিলের লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হওয়ার সাথে সাথে এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব দেখা দিয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ৫৫ (১২) ধারায় বিদ্যমান প্রশিক্ষিত (সেইফটি) কর্মকর্তার কথা বলা হয়েছে, যা শুধুমাত্র অগ্নি নিরাপত্তার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে - যা কর্মস্থলে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৬১ (৮), ৮৯, ৯০, ৯০ (ক) সহ বিভিন্ন ধারায় শ্রমিক/কর্মচারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল শ্রেণির ব্যক্তির জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির অধিকার রয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধানসমূহের প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শ্রমিক/কর্মচারী শব্দ ব্যবহার করার জন্য কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি এই আইনের সুবিধাদি পাচ্ছে না।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৯০ (ক) অনুযায়ী ৫০ জন বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় "সেফটি কমিটি" গঠন করতে হবে। কিন্তু ৫০ জনের কম শ্রমিক কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি তৈরি করার বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে ৫০ জনের কম কাজ করে এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি গঠন করা হয় না। একইভাবে সেইফটি কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ধারা ৩৫১ (৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়) বলা আছে যে, এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত করা যাবে (যেমন; আর্দ্রতার মান নির্ধারণ)। এখন পর্যন্ত এই ধারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাধা তৈরি হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে এবং তারা দীর্ঘ মেয়াদে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও শ্রম আইনে কোনো ঝুঁকিভাতার ব্যবস্থা নেই।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারী-পুরুষের প্রতি হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিদিনকার ঘটনা। এইজন্য ২১ জুন ২০১৯-এ ILO Convention কর্মজগতে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসন কনভেনশন ১৯০ গৃহীত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ১৯০ কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করার দায়বদ্ধতা রয়েছে।

এই সামগ্রিক অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং সবার জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করার আইনি কাঠামো, আইন ও নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করে নতুন বিষয়াদি বা ইস্যু যুক্ত করার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির আইনি কাঠামো যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সংজ্ঞা যুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাসমুহের পরির্বতন ও পরিমার্জন করা। এর মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কর্মীর কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সর্ম্পকিত অধিকার সমুন্নত থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে একটি প্রতিরোধমূলক ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শ্রমিক কোনো প্রকার ঝুঁকি, দুর্ঘটনা বা শারীরিক, মানসিক অসুস্থতায় পড়বে না এবং রোগ ও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হলে আইনগতভাবে যথাযথ চিকিৎসা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবে।

খ) ঝুঁকিপূর্ণ/অনিরাপদ কাজের তালিকা হালনাগাদ করা ও ঝুঁকি নিরূপণের জন্য আইনি সংশোধনী। অনিরাপদ বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজকে 'অস্বীকৃতি জানানো'র আইনি অধিকার শ্রম আইনে যুক্ত করা।

- ঝুঁকি নিরূপণ করার জন্য ঝুঁকি নিরূপণ চেকলিস্ট ফরম/ফরমেট যুক্ত করা এবং শ্রম বিধিমালার অধীনে-রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ঝুঁকিসমুহ চিহ্নিত করার বিষয়গুলি চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা।
- শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর তফসিল ৪-এর অধীনে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ঝুঁকিসমুহ চিহ্নিত করার বিষয়গুলি চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বাংলাদেশ শ্রম আইনে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ও পেশা, বিশেষ করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত (হাসপাতাল, রাসায়নিক, ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক্স, জৈব ও ল্যান্ডফিল ইত্যাদি) খাত ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রাপ্তির বিধান যুক্ত করা।

গ) সেইফটি কর্মকর্তা, সেইফটি কমিটির জন্য সংশোধনী এবং হালনাগাদ করা:

- ধারা ৯০ (ক) সেফটি কমিটি গঠন করার বাধ্যবাধকতায় ৫০ জনের পরিবর্তে ২০ জন শ্রমিক নির্ধারণ করা। শ্রমিকের সংখ্যা ২০ বা ৫ জনের নিচে কাজ করে এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ০২ জনের (সম্ভব হলে ০১ জন নারী ও ০১ জন পুরুষ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সরকার স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ (অফলাইন/অনলাইন) গ্রহণ করা।
- শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ও শ্রমিকদের আবাসিক এলাকা ভিত্তিক সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন এবং মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, সামাজিক অংশীজন ও এলাকার জনসাধারণকে নিয়ে এই সেইফটি কমিটি গঠন করা।
- সেইফটি কমিটি যাতে কাজ করতে পারে সেজন্য শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ৮১, ৮৪ ও ৮৫ ধারায় সংস্কার এনে সেইফটি কমিটির সদস্যদের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা। বিধিতে ৫০ জনের কম শ্রমিকসহ প্রতিষ্ঠানের জন্য সেইফটি কমিটি সম্পর্কিত বিধান সুনির্দিষ্ট করা।
- সেইফটি কমিটির এখতিয়ারের মধ্যে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ নিজ স্বাক্ষরে/বিনা স্বাক্ষরে ঝুঁকির বিষয়ে পরিদর্শককে সরাসরি অবহিত করতে পারবেন মর্মে বিধান রাখা।
- ঠিকাদারি সংস্থা কোনো মালিকের অধীন কোনো শ্রমিক বা কর্মী নিয়োগ করার ক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সুযোগ করে দেওয়ার সাথে সাথে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা বিষয়কে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আইনে এবং শ্রম বিধিমালায় বিধি ১৬ (৩)-এ অন্তর্ভুক্ত করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা (OSH Management System) বিষয়টি (প্রতিষ্ঠানের জন্য পলিসি তৈরি, কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি) সেইফটি কমিটির কর্ম পরিধির মধ্যে যুক্ত করা।
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর ৫৫ (১২) ধারায় বিদ্যমান প্রশিক্ষিত (সেইফটি) কর্মকর্তার পরিবর্তে একজন প্রশিক্ষিত "পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা" নিয়োগের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা। কাজের ঝুঁকি বিবেচনায় ৩০০ জনের কম শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে এমন কারখানায় এই বিধান প্রযোজ্য হতে পারে, যা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হবে এবং পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তার যোগ্যতা (প্রস্তাবিত):
    - সর্বনিম্ন স্বাতক/ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী হতে হবে।
    - "পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য অফিসার" সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষিত হতে হবে অথবা প্রশিক্ষিত না হলে নিয়োগকারী অনুরূপ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ৩ মাসের মধ্যে অনুরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অথবা ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৩ সপ্তাহ/৬ ক্রেডিটের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে অথবা ১৫/২০ পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ঘ) কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা।

- কৃষিকাজ ও তামাক চাষ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা।
- তদারকি করার জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, স্বাস্থ্য ও শ্রম বিভাগের সমন্বয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা ও নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধ করা।

ঙ। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল, নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা:

- নতুন সমস্যা, যেমন; এআই, ডিজিটালাইজেশন, অনলাইন প্লাটফর্ম, অতিমারী-কোভিড সহ যে কোনো সংক্রামক রোগ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ করা।
- যুব শ্রমিকদের, কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আওতায় থাকা সেক্টর যেমন; এআই, রোবোটিকস, আধুনিক যন্ত্রপাতি, গিগ এবং ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারী শ্রমিকদের ঝুঁকির বিষয়গুলি নীতিমালায় যুক্ত করা।
- বর্তমান পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল এবং কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) ৫ বছর পর পর হালনাগাদ করা এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সাথে সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এসএমই, শিল্প সেইফটি ইউনিট (ISU), জখমের বিমা স্কিমের বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা। এই জন্য সরকার কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করে কারিগরি প্রযুক্তিগত ও পদ্ধতিগত পরামর্শ প্রদানসহ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা।

চ) 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিল'কে কার্যকর করা:

- 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিল'কে কার্যকর করার জন্য একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনে সেক্টর ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে যুক্ত করা।
- তফসিল ৪-এর সাথে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিদর্শনের জন্য 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলে'র সেক্টর ভিত্তিক চেকলিস্ট তৈরি করা।

ছ) পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ বিষয়ক আলাদা আইন করা। প্রস্তাবিত সংশোধনী করার পর ভবিষ্যৎ সমস্যা মোকাবিলা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ বিষয়ক আলাদা আইন প্রণয়ন করা, যা সকল শ্রেণি ও পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের সর্বোত্তম স্বার্থ বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য (মানসিক, শারীরিক), নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন মোকাবেলার ভূমিকা রাখবে। এছাড়া প্রয়োজনে বিশেষ শ্রমগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আইন (OSH Law) প্রণয়ন করা। এটা হবে দীর্ঘমেয়াদি একটি কাজ।

জ) Occupational Safety and Health Administration/Authority প্রতিষ্ঠা করা। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা, কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়ন ও তদারকি করার জন্য Occupational Safety and Health Administration/Authority প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়ন ও অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবে। এটা হবে দীর্ঘমেয়াদি একটি কাজ।

ঝ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করা:

- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক মৌলিক কনভেনশন ১৫৫ এবং ১৮৭ ও অনুস্বাক্ষর করার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- কর্মজগতে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসন ILO কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা।

৩.৩.২। শ্রম আইন ও শ্রম পরিদর্শন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্মস্থলের নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই সংস্থাগুলি ও বিভাগের দক্ষতা, জনবল ও সঠিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মকৌশল না থাকার জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরির লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

শ্রম পরিদর্শনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে, সকল খাতের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর পরিদর্শন ব্যবস্থা নেই এবং সংশিষ্ট সংস্থা/বিভাগের মধ্যে সমস্বয়হীনতার অভাব রয়েছে। প্রতিটি অধিদপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানের আলাদা চেকলিস্ট বা তালিকা রয়েছে যার মাধ্যমে শিল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন (inspection) কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়গুলি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। এই সমন্বিত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিক এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আলাদা চেকলিস্ট ও সেক্টর অনুযায়ী চেকলিস্ট না থাকার কারণে পেশাগত রোগ চিহ্নিতকরণ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বর্তমান প্রচলিত শ্রম পরিদর্শন সমাপ্ত করার পর প্রতিষ্ঠানটিকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক কোনো ধরনের স্বীকৃতি বা মূল্যায়নপত্র দেওয়ার বিধান নেই। এই বিধান না থাকার কারণে কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে না। পেশাগত রোগ, ব্যাধি এবং দুর্ঘটনার তথ্য বছরে ০১ বার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে শ্রম পরিদর্শনের প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় যা যথেষ্ট নয়।

শ্রম আইন ও শ্রম পরিদর্শন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূর করার লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম পরিদর্শনের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠনের মাধ্যমে সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা:

- শ্রম পরিদর্শনের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন এবং বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে সমন্বিত শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা চালুকরণ। এইজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মালিক-শ্রমিক পক্ষের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা । এই টাস্ক ফোর্স এবং সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা তদারকি ও পরামর্শ দিবেন।
    - প্রধান বয়লার পরিদর্শক ও কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর যৌথ পরিদর্শন কার্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রধান বয়লার পরিদর্শককে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্তকরণ। এটা হবে মধ্যমেয়াদি কাজ।

খ) সেক্টর অনুযায়ী আলাদা চেকলিস্ট প্রণয়ন, মূল্যায়নপত্র প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা:

- সেক্টর অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয় বাস্তবায়ন করার জন্য আলাদা চেকলিস্ট প্রণয়ন করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শন চেকলিস্ট হালনাগাদ করা।
- শ্রম পরিদর্শনের প্রতিবেদন বা মূল্যায়নপত্র প্রদান এবং প্রর্দশনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। পরিদর্শন প্রতিবেদন বা মূল্যায়নপত্র সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

গ) রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার প্রতিবেদন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট তৈরি, সেইফটি কমিটির সঠিক বাস্তবায়ন করা:

- রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রতি ৩/৬ মাস অন্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট তৈরি করা। মালিকদের প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট তৈরি করতে হবে যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত।
- সেইফটি কমিটির সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এই বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করা।

ঘ) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর সংশোধিত ২০২২-এ বিধি ৭৫ বাস্তবায়ন করা দরকার। এই বিধি বাস্তবায়নের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান রেখে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা।

৩.৩.৩। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, আপদ চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশগত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ

বাংলাদেশে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০১৩-তে পেশাগত মানদণ্ড তৈরির বিষয়টি বলা হলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এছাড়া বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন নতুন মানদণ্ড যুক্ত করার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের সমস্যা ও আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৯, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫, বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩, বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড-২০২০, বিস্ফোরক আইন-১৮৮৪, বয়লার আইন-২০২২-তে মানদণ্ডগুলি বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প, ট্যানারি, রং তৈরি, সার, কীটনাশক, রি রোলিং মিল, সার কারখানা, কৃষি, ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে ৫০০ ধরনের (আনুমানিক) রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ সময় এইসব রাসায়নিক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন; আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকটি বিবেচনা করা হয় না। এইসকল রাসায়নিক পরিবহণ, লোড আনলোড শ্রমিক এবং অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জীবনে রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রাসায়নিক আমদানি, সংরক্ষণ, ব্যবহার, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য সরকারিভাবে আইনগত কোনো প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে রাসায়নিক পদার্থের যথেচ্ছা ব্যবহারের জন্য শ্রমিক, পরিবেশ এবং শিল্প এলাকার মানুষের ঝুঁকি তৈরি হয়ে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ ধারা ৬৮-তে বর্ণিত বিপজ্জনক কাজসমূহের সঙ্গে সময়ের প্রয়োজনে এবং শিল্পায়নে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে নতুন নতুন বিপজ্জনক কাজ যুক্ত হচ্ছে, যেগুলিকে আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, আপদ চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশগত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক মানদণ্ড (OSH Standard) তৈরি ও ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করা:

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক একক ও সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় মানদণ্ড (National OSH Standard) তৈরি করা। এই বিষয়ে সরকার, মালিক, শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সেইফটি কাউন্সিল কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা।

- কারখানা বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ব্যবস্থাপনা (OSH Management System) [পলিসি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, দায়িত্ব ইত্যাদি] কার্যক্রম বাস্তবায়ন। পলিসি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থাসমূহকে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়মিত মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রদান করা।

খ) রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বির্পযয়, বিপজ্জনক কাজের তালিকা হালনাগাদ করা, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন করার দায়িত্ব:

- রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ঝুঁকিসমুহ চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা। অথবা শ্রম বিধিমালা ২০১৫ তফসিল ৪ (৪)-এর সাথে ফরম আকারে যুক্ত করা।
- শ্রম বিধিমালার ৬৮ বিধিতে উল্লেখকৃত বিপজ্জনক কাজের তালিকা হালনাগাদ করা। হালনাগাদকৃত তালিকা স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- সরকারিভাবে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন করার জন্য যোগ্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া এবং তা শ্রম আইনের ৬ অধ্যায়ে যুক্ত করা।
- অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে এলাকার আশে পাশে পানি, মাটি, বায়ু, কৃষি জমি, পশুপাখি, মাছ, শ্রমিক এবং এলাকার মানুষের জীবন ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা। এই বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা

গ) সেক্টর ভিত্তিক বিভিন্ন মানদণ্ডের জন্য SOP (Standard Operating Procedure) তৈরি করা।

৩.৩.৪। পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়, রিপোর্ট করার প্রক্রিয়া ও ক্ষতিপূরণ

বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্যের বর্তমান চিত্র খুবই নাজুক। যদিও আইনি কাঠামোতে কিছু বিষয় বলা হয়েছে তবে তা যথেষ্ট নয়। এই কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক, কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা যে পেশাগত রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তা আইনি দুর্বলতার কারণে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এছাড়া যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্যযোগ্য তা হলো বাংলাদেশে পেশাগত রোগ ও ব্যাধির কোনো তথ্য নেই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদন (২০১৯-২০২২),[৪] পর্যালোচনা করে পেশাগত রোগ ও ব্যাধির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল এবং উপেক্ষিত। স্বাস্থ্যনীতি ২০১১-তে পেশাগত রোগ ও ব্যাধি একেবারেই উপেক্ষিত।

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার, বৈশ্বিক জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন পেশাগত রোগের আর্বিভাব হচ্ছে। এই রোগগুলিকে পেশাগত রোগ হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে শ্রমিক এবং কর্মরত সকলের জীবনে ঝুঁকি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকেরা চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হয়।

পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। অন্যদিকে একটি রোগকে পেশাগত রোগ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন জেলার সিভিল সার্জন যা কিনা এই প্রক্রিয়াকে জটিল এবং সময় সাপেক্ষ করে তোলে। ফলশ্রুতিতে ভুক্তভোগী শ্রমিক পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়ের জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হয়।

দেশে বিষেশায়িত চিকিৎসা ক্ষেত্রের উন্নতি হলেও অন্যান্য বিশেষায়িত বিভাগের মত করে পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য আলাদা বিভাগ এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব রয়েছে এবং পেশাগত রোগের জন্য আলাদা কোনো বিশেষায়িত হাসপাতাল ও পরীক্ষাগার গড়ে উঠেনি। এছাড়া শিল্প অঞ্চলে এবং শ্রমঘন এলাকায় সাধারণ মানের হাসপাতালের সংখ্যাও কম। এর ফলে শ্রমিক তার সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমানে কাজের বহুমাত্রিকতার কারণে শ্রমিক এবং কর্মরত মানুষের মাঝে নতুন নতুন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয় এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করা শ্রমিকরা বা বসে কাজ করা শ্রমিকরা সামগ্রিকভাবে

[৪] কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, https://dife.gov.bd

১৯.০% ক্লান্তিতে (১৯.০%) এবং ব্যক্তিগতভাবে ২৯.৯% ক্লান্তিতে ভোগেন।[9] এই সমস্যাগুলির সঠিক দিকনির্দেশনা বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ না থাকার কারণে শ্রমিকদের রোগব্যাধি ও শারীরিক সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক ব্যবহার করার ফলে কত শ্রমিক পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার কোনো তথ্য নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসায়নিক কাজে পেশাগত রোগ নির্ণয়ের কোনো ক্লিনিক বা হাসপাতাল নেই।

পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়, রিপোর্ট করার প্রক্রিয়া ও ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) পেশাগত রোগব্যাধির তালিকা হালনাগাদ, মানসিক স্বাস্থ্য (স্ট্রেস) ও শারীরিক (আরগনমিক্স) এবং অতিরিক্ত শ্রমঘণ্টা ও রোগব্যাধির শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন তৈরি সহজতর এবং আইনি কাঠামোসহ সকল বিষয় হালনাগাদ করা:

- শ্রম আইনে পেশাগত রোগব্যাধির তালিকাটি হালনাগাদ/যুগোপযোগী করা: অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে নতুন পেশাগত ঝুঁকি, রোগব্যাধি বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর তফসিল ২-এর অধীন বিদ্যমান পেশাগত রোগব্যাধির তালিকা হালনাগাদ/যুগোপযোগী করা এবং প্রতি ৩-৫ বছর অন্তর হালনাগাদ করা। কোভিডের মতো অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি ও ক্রমবর্ধমান শিল্প ও পেশা থেকে উদ্ভূত ব্যাধিকে পেশাগত রোগের তালিকায় সন্নিবেশিত করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের জন্য এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৫০০০-এর কম শ্রমিক কর্মরত আছে এমন কারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে শিল্প এলাকায় ক্লাস্টার ভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। ৫০০০ ও তদূর্ধ্ব শ্রমিক কর্মরত আছে এমন কারখানায় শ্রম আইনের বিদ্যমান বিধান কার্যকর হবে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ মানসিক স্বাস্থ্য (স্ট্রেস) ও শারীরিক (আরগনমিক্স) এবং অতিরিক্ত শ্রমঘণ্টার কারণে সৃষ্ট রোগব্যাধি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ সংযুক্ত করা। শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা।
- শ্রম আইনে পেশাগত রোগব্যাধি শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন তৈরি সহজতর এবং হালনাগাদ করা। এই জন্য একটি সহজবোধ্য ফর্ম শ্রম আইনে তফসিল আকারে যুক্ত করা।
- শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ নারী শ্রমিকদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য, হয়রানি বা সহিংসতার উত্তরণের জন্য কাউন্সিলিংয়ের বিধান রাখা।

খ) পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য বিশেষায়িত ল্যাব হাসপাতালে বিশেষায়িত OSH ইউনিট বা ক্লিনিক স্থাপন ও কেন্দ্রীভূত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা। কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন একটি বিশেষায়িত ল্যাব এবং বিশেষায়িত ডাক্তারদের সমন্বয়ে একটি বিভাগ বা ইউনিট স্থাপন করা।

- পেশাগত রোগ নির্ণয় করার জন্য নিপসম (NIPSOM)-এর অধীনে একটি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা।
- সকল জেলার শিল্প অঞ্চলে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি ও বেসরকারি বড়ো বড়ো হাসপাতালে পেশাগত রোগব্যাধির জন্য বিশেষায়িত ইউনিট বা ক্লিনিক স্থাপন করা। যেখানে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করবে।
- শ্রমঘন এলাকা জাহাজ ভাঙা ও স্টিল-রিরোলিং শিল্পখাতে নিয়োজিত এবং রাসায়নিক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য ক্লিনিক বা হাসপাতাল তৈরি করা এবং চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- পাথর ভাঙা শ্রমিকদের জন্য প্রতি বছর রোগব্যাধি নির্ণয় করার জন্য আইনি বিধানসহ সমন্বিতভাবে হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ শ্রম অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর সমন্বিতভাবে হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা।

●[9] Sarmin Sultana" Shanta Dutta' Rabeya Yasmin' SK Akhtar Ahmad' Shafiur Rahman Irin Hossain, MH Faruquee, Manzurul Haque Khan (2019), FATIGUE AMONG THE GARMENT WORKERS INA SELECTED INDUSTRY, Journal of Preventive and Social Medicine 38(1), November 2019, pp 45-53; Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/337049033

- রোগব্যাধির জন্য কেন্দ্রীভূত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা। এটি গঠিত হবে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের (NOSHTRI) অধীনে।

গ) চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একাডেমিক কারিকুলাম যুক্ত করা:

- বাংলাদেশে চিকিৎসকদের জন্য একাডেমিক কারিকুলামে (MBBS) আলাদা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা কোর্স বা বিষয় যুক্ত করার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। এইজন্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নার্স ও মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের শিক্ষা কারিকুলামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আলাদা অধ্যায় বা কোর্স সংযুক্ত বা চালু করা।

ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকায়ন করা:

- শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকায়ন, চিকিৎসক, প্রয়োজনে জনবল ও যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য পেশাগত রোগব্যাধি ও কাউন্সেলিং চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
- নারীশ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধাদি নিশ্চিত করাসহ ন্যায্য মূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা করা।

ঙ) শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ও প্রতিবন্ধিতা সেবা:

- শ্রবণশক্তিকে আইনি কাঠামোতে যুক্ত করা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর তফসিল ২-এর অধীন বিদ্যমান পেশাগত রোগব্যাধির তালিকাটিতে যুক্ত করা।
- দৃষ্টিশক্তি যত্নের বিষয়টি আরো বিস্তারিত আইনে যুক্ত করা এবং পেশাগত রোগ ও ব্যাধির তালিকায় পেশাগত রোগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।
- প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩.৩.৫ দুর্ঘটনা এবং অভিযোগ করার প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন

বাংলাদেশে পেশাগত দুর্ঘটনা বিষয়ে বিলস কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গত ১২ বছরে (২০১৩-২০২৪) ১০,২১০ জন নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশ শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ অনুযায়ী ১৪৬ জন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। সেইসাথে ২০১৯-২০২২ পর্যন্ত লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদনে পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে ৩০৩ জন নিহত হয়েছে।[10] নিহতের সংখ্যা ২০২০-২১ তুলনায় ২০২১-২২-এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের শিল্প খাতে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি গুরুত্বের সাথে সামনে আসে ২০১৩ রানা প্লাজা কমপ্লেক্সের মর্মান্তিক ভবন ধ্বসের পরে, যেখানে ১,১৩৪ জন নিহত হয়। সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ প্রণয়ন করে এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা (বিএলআর) ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন অধিকতর সংশোধন করা হয়, যদিও পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে আইনে বারবার পরিবর্তন হলেও এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী সামান্য/মারাত্মক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার আইনগত বিধান থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী সামান্য/মারাত্মক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় না এছাড়া মালিকপক্ষ শুধু মৃত্যুবরণ করলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। কিন্তু সামান্য/মারাত্মক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয় না, এমন কি লিপিবদ্ধও করা হয় না। শ্রম আইন ২০০৬-এর ৮০ ধারা দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিসে কোনো দুর্ঘটনা হলে শ্রমিক বা শ্রমিক পক্ষ হতে বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক সরাসরি দুর্ঘটনার অভিযোগ প্রদানের কোনো বিধান না থাকার কারণে শ্রমিকরা সরাসরি কোনো তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে না।

বাংলাদেশে যে সমস্ত শিল্পকারখানা/ প্রতিষ্ঠানে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে (যেমন; সারাকা গার্মেন্টস, স্পেক্ট্রাম গার্মেন্টস, রানা প্লাজা, তাজরিন গার্মেন্টস, টাম্পাকো ফয়েলস, এফআর টাওয়ার, বিএম ডিপো, সজীব ফুডস, নিমতলী ট্র্যাজেডি,

[10] লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২২, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, https://dife.gov.bd

বেইলি রোড ট্র্যাজেডি, এস এন কর্পোরেশনের গ্রিনইয়ার্ড ইত্যাদি) এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করা হয়েছে, তার প্রতিবেদন কখনই জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। ফলে দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা অন্ধকারে রয়ে গেছে।

এখানে উল্লেখ যে, রানা প্লাজা ও তাজরিনসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী বা অক্ষম শ্রমিকদের সমাজে এবং পরিবারে পুনর্বাসিত হতে বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় ও সামাজিকভাবে অসহায়বোধ করে।

২০২৪ সালে জুলাই অভ্যুত্থানে ৮২০ জন শহিদ (নিহত) ও ১১৮৫০ আহত হয়।[11] এর মধ্যে শ্রমিকদের নিহত ও আহতের হার উল্লেখ্যযোগ্য। এই শ্রমিকদের সুচিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বিধি ৭০-এ সামান্য দুর্ঘটনার নোটিস: শ্রমিকের কাজে অনুপস্থিতির সময় ২০ দিন হলে তা সামান্য দুর্ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত হবে। এই ক্ষেত্রে ২০ দিন দীর্ঘ সময় হওয়ার কারণে শ্রমিকের কাজে যোগদান এবং অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণের যে বিধান রাখা হয়েছে তা বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যথেষ্ট না। ইতোমধ্যে রানা প্লাজার দুর্ঘটনা পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণের সমাধানের একটা অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ধরে ক্ষতিপূরণের সমাধানের জন্য আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সময়ের দাবি।

দুর্ঘটনা এবং অভিযোগ করার প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনে বিষয়ে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ, পঙ্গুত্ববরণকারী, অক্ষম শ্রমিকদের পুনর্বাসন, দুর্ঘটনার তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা:

- শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৫০ ও ১৫১-এ বিশেষ ধারা যুক্ত করাসহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- পঙ্গুত্ববরণকারী, অক্ষম শ্রমিকদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংগঠন এবং জনগণকে সম্পৃক্তকরণ করার মাধ্যমে সামাজিক ও প্রশিক্ষণসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, নিয়মিত চিকিৎসা ও ডিভাইস পরিবর্তন করা। এই ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে সংযুক্ত করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান, পুর্নবাসনের ব্যবস্থা ও আহত শ্রমিকের জন্য জীবনব্যাপী উন্নত চিকিৎসা এবং সেবার নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- ২০২৪ সালে জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদ (নিহত) ও আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে হেলথ কার্ড প্রদানসহ বিনামূল্যে সেবা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা।
- দুর্ঘটনায় সামান্য ও মারাত্মক দুর্ঘটনার তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা এবং তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের (NOSHTRI) অধীনে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তথ্যভাণ্ডার গঠন এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ ও প্রকাশ কর।
- বর্তমান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপ্রতুল বিধায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা এবং একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইএলও কনভেনশন ১২১ ও হাইকোর্ট কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণে মানদণ্ড নির্ধারণ করা। ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের উৎসাহিত করতে কোর্ট ফি রদ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বাধীন, তদন্ত কমিটি গঠন এবং সঠিক ও বিস্তারিত প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রকাশ করা:

- বাংলাদেশের সমস্ত শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে নিরপেক্ষ, স্বাধীন, তদন্ত কমিটি গঠন এবং সঠিক ও বিস্তারিত প্রতিবেদন ও সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে এবং মিডিয়াতে প্রকাশ করা।

---

[11] জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন,২২ মার্চ ২০২৫, Retrived from https://jssfbd.com

- দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তরকে দুর্ঘটনার সঠিক রিপোর্ট এবং তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা।

গ। দুর্ঘটনারোধে সমন্বিত পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা:

- বিস্ফোরক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শ্রম পরিদর্শনের সাথে যুক্ত করে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বয়লার পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদনসহ উপযুক্ত ইন্সপেকশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
- জাহাজ ভাঙা শিল্পখাতের জন্য সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ। জেলে শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক ও বজ্রপাতের কারণে মৃত্যুবরণকারী শ্রমজীবী কৃষকদের আইনি কাঠামোতে যুক্তকরণ:

- জেলে শ্রমিকদের দুর্ঘটনা কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য আইনি কাঠামোতে যুক্তকরণ। নিহত, আহত ও নিখোঁজদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বজ্রপাতের কারণে এবং জলজ ও বন্য হিংস্র পশুর আক্রমণে মৃত্যুবরণকারী শ্রমজীবী এবং কৃষকদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণের স্বীকৃত দেওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৫০-এর দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করা।
- নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৫০ ও ১৫১ ধারায় বিশেষ ধারা যুক্ত করা সহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

ঙ) আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার পথে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও ক্ষতিপূরণ:

- আইনি কাঠামোতে আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার পথে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণের বিধান যুক্ত করা।
- আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে আবাসস্থলে যাওয়ার পথে কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, যাতে প্রাণহানি বা শারীরিক জখম হয়, বিমার আওতায় ক্ষতিপূরণের বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.৩.৬ শ্রমিকের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা তার অধিকার। এই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কর্মরত শ্রমিকের প্রতিবছর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। শুধুমাত্র বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে ধারা ৬৮ উপবিধি ৫ বিপজ্জনক চায়লনার সাথে জড়িত শ্রমিকদের বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে যা সমস্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ন। এছাড়া শ্রম বিধিমালা ২০১৫তে ১৯ (৪)-এ নিয়োগপত্রের তথ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি অনুপস্থিত।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে ধারা ৬৮ উপবিধি ৫ বিপজ্জনক চালনার সাথে জড়িত শ্রমিকদের জন্য সংক্রামক ব্যাধি ও রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। যা বিপজ্জনক কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

শ্রমিকরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজে থাকে। আর বেশিরভাগ হাসপাতালগুলি রাতের বেলা বন্ধ থাকার কারণে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা নিতে পারে না।

শ্রমিকের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নত ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তার লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) চিকিৎসা সুবিধার জন্য শ্রমিকবান্ধব হাসপাতাল, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার সুবিধাসহ ন্যায্য মূল্যে ওষুধ প্রদান, ইন্সুরেন্স ও কার্ডের ব্যবস্থা করা:

- শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকবান্ধব হাসপাতাল বা স্যাটালাইট ক্লিনিক স্থাপন করতে হবে যেখানে শ্রমিকরা তাদের সুবিধা বা সময় অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে পারে।
- শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার সুবিধাসহ ন্যায্য মূল্যে ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- শ্রমিকদের ইন্সুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসা ও কার্ডের ব্যবস্থা করা যার মাধ্যমে শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার অধিকার পাবে।

খ) শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা:

- ঝুঁকিপূর্ণ/Hazardous শিল্পে কর্মরত সকল শ্রমিকদের জন্য বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধান যুক্ত করা। অন্যান্য শিল্পের জন্য ২/৩ বছরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধান যুক্ত করা। এরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ৬৮ (৫) উপবিধি বিপজ্জনক চালনার সাথে জড়িত শ্রমিকদের জন্য সংক্রামক ব্যাধি ও রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন; আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পিপিই সরবরাহ করা।

৩.৩.৭। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা-২০১৩ তে সরকারের দায়িত্ব (২৭)-এ বলা হয়েছে যে, শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বর্তমানে শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে শিল্প-সম্পর্ক শিক্ষায়তনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চলমান কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয়। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে সামান্য একটি অংশ রয়েছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে, যা দক্ষতা বা জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট নয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে কর্মস্থলে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি করার মাধ্যমে পেশাগত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অভাবে পেশাগত রোগকে চিহ্নিত এবং উপযুক্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া গবেষণালব্ধ উপযুক্ত তথ্য ও উপাত্তের অভাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা দেখা দিচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ঝুঁকি কমানোর জন্য সেইফটি কালচার বা সংস্কৃতি গড়ে তোলা জরুরি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি নিরাপদ, শোভন কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা দরকার। এ লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন করা।

খ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বাস্তবায়ন করা। এই জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কারিকুলাম প্রণয়ন এবং সংযুক্ত কারিকুলামসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা।

গ) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং আলাদা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ। এক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে কর্মরত বিশেষায়িত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তকরণ।

ঘ) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের অধীনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা এবং কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন করা।

ঙ) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের (NOSHTRI) অধীনে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান যেমন; মাস্টার্স, ডিপ্লোমা কোর্স ও প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।

চ) সকল শিল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যম সারির ব্যবস্থাপকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান ও সার্বিক স্বাস্থ্য ও সেইফটি শিক্ষা চালু করা।

ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) কারিকুলামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়কে কোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

জ)পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম হালনাগাদ ও প্রয়োজনে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৩.৩.৮। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলি বিশেষ পেশা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের জন্য প্রযোজ্য এবং বাস্তবায়নে প্রকল্প

বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত বিশেষ পেশা এবং বিপদাপন্ন পেশার জন্য বিদ্যমান পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক আইনি কাঠামোতে সঠিক কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। বিশেষ পেশা, বিপদাপন্ন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গোষ্ঠী, ব্যক্তিপর্যায়ে সাময়িক বা স্থায়ী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত বা নিয়োজিত কর্মীগণ, নতুন প্রযুক্তি বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট পেশা এবং অভিবাসী বা প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিদ্যমান শ্রমনীতি, শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে সরাকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫ লক্ষ সেলুন ও পার্লার আছে যেখানে প্রায় ২৫-৩০ লাখ পুরুষ ও নারী কাজ করছে এবং কোটি কোটি মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।[12] এই সেবা দেওয়ার সময় নিজেরা ও সেবাগ্রহিতা সঠিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি না মেনে চলার কারণে নিজেরা ও সেবাগ্রহিতারা অজান্তেই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৪০০,০০০ বর্জ্য সংগ্রহকারী রয়েছে। শুধুমাত্র ঢাকাতেই, প্রায় ১২০,০০০ এই পেশার সাথে জড়িত। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ বর্জ্য সংগ্রহকারী শ্রমিকদের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো আইনি দিক নির্দেশনা নেই।

বাংলাদেশে মোট প্রায় ৩.২ মেট্রিক টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়। ই-বর্জ্যে বিপজ্জনক পদার্থ থাকে, যা পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ঢাকায় প্রায় ১২০,০০০ দরিদ্র মানুষ অনানুষ্ঠানিক ই-বর্জ্য কাজের সাথের জড়িত, যার মধ্যে ৫০,০০০ শিশু। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ ই-বর্জ্য কাজের সাথের জড়িত শ্রমিকদের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা নেই।

বাংলাদেশে শ্রেণি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযান ৫৭,৫৯,৩৫৩[13]। এই মোটরযান চালক ছাড়াও অটোচালক, সিএনজি চালক, ভ্যান ও রিক্সাচালকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি প্রয়োগ ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার কোনো রূপরেখা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ অন্তর্ভুক্ত নেই।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলি বিশেষ পেশা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের জন্য প্রযোজ্য করতে এবং বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) "ঝুঁকিপুর্ণ" এবং "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর" ও আউটসোর্সিং, সেলুন এবং বিউটি পার্লার, ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প, বর্জ্য সংগ্রহকারী ও ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে যুক্ত করা:

- "ঝুঁকিপুর্ণ" এবং "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর" ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক আইনি কাঠামোতে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। তাদেরকে বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আউটসোর্সিং বা বিশেষ পেশায় নিয়োজিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যকর আইনি নির্দেশনা এবং সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যক্রম নেই বিধায় তাদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বর্জ্য সংগ্রহকারী ও ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে সংযুক্ত করা।
- সেলুন এবং বিউটি পার্লার কাজের সাথে জড়িত শ্রমিক এবং গ্রাহকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চত করার জন্য আইনি কাঠামোতে সংযুক্ত করা।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ও অভিবাসী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন, সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ:

[12]How the beauty industry is adapting to the new normal, Dhaka Tribune, 9 June, 2021_ https://www.dhakatribune.com/business/economy/249129

[13] বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩_ https://brta.gov.bd

- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণা প্রদান, তথ্য জানানো, এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ করা।
- প্রবাসী/অভিবাসী কর্মীদের বিদেশ গমনের পূর্বে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা। উক্ত প্রশিক্ষণে শ্রমিক যে দেশে গমন করবে সেই দেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন-কানুন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) পেশাদার গাড়িচালক, বেসরকারি গণপরিবহণের চালক, ব্যক্তিগত গাড়িচালক, অটোচালক, সিএনজি চালক, ভ্যান ও রিক্সাচালকদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ সহ হাসপাতাল, হেলথ কার্ড, টার্মিনালে ক্লিনিক, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় তহবিল গঠন:

- পেশাদার গাড়িচালক, বেসরকারি গণপরিবহণের চালক, ব্যক্তিগত গাড়িচালক, অটোচালক, সিএনজি চালক, ভ্যান ও রিক্সাচালকদের শ্রম আইন ২০০৬-এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ করার পাশাপাশি হাসপাতাল, হেলথ কার্ড, টার্মিনালে ক্লিনিক, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় তহবিল গঠন করা।
- একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ যা সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন জরুরি।

৩.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

সামাজিক নিরাপত্তা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ঘ)-এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, বেকারত্ব, রোগব্যাধি, শারীরিক পঙ্গুত্ব, বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা, বার্ধক্য অথবা এ ধরনের অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার কারণে সৃষ্ট অভাব-অনটনের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

জাতীয় শ্রম নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো দেশি ও অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বিশেষ করে, শ্রমিক শ্রেণিকে অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রম নীতিতে বলা হয়েছে:- *"জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। তাই সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিকসহ সকল পর্যায়ে কর্মরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি শর্ত প্রতিপালনের জন্য সরকার সচেষ্ট থাকবে।"* বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে, বিশেষ করে, মাতৃত্বকালীন সুবিধা (ধারা ৪৫-৫০); কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ঘটলে শ্রমিক বা তার পরিবার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার (ধারা ১৫০-১৫৬); পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড (২৬৪-২৭৩), গ্রুপ ইন্সুরেন্স (ধারা ৯৯,), গ্রাচুইটি (ধারা ২(১০)। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন; শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণার্থে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অক্ষম ও অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতা, অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা ও আর্থিক সহযোগিতা, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা, শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যদের শিক্ষা বৃত্তি এবং যৌথবিমা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১০২ (১৯৫৩) সামাজিক সুরক্ষার ৯টি ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে—যার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা সুবিধা, অসুস্থতাজনিত সুবিধা, বেকারত্ব সুবিধা, বয়স্কভাতা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা, পারিবারিক সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, অক্ষমতা সুবিধা এবং বিধবাভাতা। কনভেনশন ১২১ (১৯৬৪) কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, ১২৮ (১৯৬৭) অক্ষমতা ও বার্ধক্যজনিত সুবিধা, ১৩০ (১৯৬৯) চিকিৎসা ও অসুস্থতাজনিত সুবিধা, ১৬৮ (১৯৮৮) বেকারত্ব সুরক্ষা, ১৮৩ (২০০০) মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা এবং ১৮৯ (২০১১) গৃহকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে সদস্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশের শ্রম খাতে এখনও সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণে বড় ঘাটতি রয়েছে। কর্মহীনতাকালীন সুরক্ষা, ঝুঁকি ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা, কর্মস্থলে নির্যাতন প্রতিরোধ, নিরাপদ আবাসন, টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য বিমা ও তহবিলের ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকদের জীবন ও কর্মপরিবেশ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

৩.৪.১ সকল শ্রমিকের জন্য 'জীবন-চক্র ভিত্তিক' সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ শ্রমিকের মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। এজন্য, সকল শ্রমিকের (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব-নিয়োজিত, কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত) জন্য 'জীবন-চক্র ভিত্তিক' সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা যার মাধ্যমে অবসরকালীন সুবিধা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য সুবিধা, মৌসুমি শ্রমিকদের আকস্মিক বেকারত্ব, সকল নারী শ্রমিকের জন্য মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, নিরাপদ যাতায়াত ও আবাসন সুবিধা এবং বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ক) নীতি কাঠামো: শ্রমিকদের কর্মজীবন, অবসরকাল ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করতে 'অধিকার ও জীবন-চক্র ভিত্তিক' সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এ লক্ষ্যে সকল শ্রমিকের (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত, কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত) জন্য একটি সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা ও একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠন করা প্রয়োজন, যেখানে নিয়োগকারী, সরকার ও শ্রমিকরা যৌথভাবে অবদান রাখবে।

খ) সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ কর্মসূচির আওতা: এই আইনের কাঠামোর আওতায় সর্বজনীন জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক বিমা/সুরক্ষা কর্মসূচি, সর্বজনীন মাতৃত্ব সুরক্ষা ও কল্যাণ, আকস্মিক কর্মহীনতা সুরক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত, কৃষি, প্রবাসী, ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের জন্য নিশ্চিত করা এবং এর আওতায় ভুক্তভোগী ও পরিবারের নির্ভরশীলদের সুরক্ষায় 'সারভাইভার বেনিফিট/সুরক্ষা বন্ড' চালু করা।

গ) প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য সুবিধা: এই নীতিমালায় শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সুবিধাগুলি নিশ্চিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক করা যেখানে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ঐচ্ছিক থাকবে। কর্মস্থল পরিবর্তন হলে শ্রমিকরা তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড স্থানান্তর করতে পারবেন। জাতীয় পেনশন স্কিমের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে শ্রমিক-বান্ধব স্কিম চালু করা এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/কারখানারকে সরকার কর্তৃক বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা। অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে, কর্মক্ষমতা হারানো শ্রমিকদের জন্য বিমা কর্মসূচি চালু হবে, যাতে তারা আর্থিক সহায়তা এবং চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন। কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং আকস্মিক কর্মহীনতার জন্য কিছু সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা। এছাড়া সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা, যার আওতায় ন্যূনতম ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পূর্ণ বেতন, ডে কেয়ার সুবিধা এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে বৈষম্যমুক্ত কর্মস্থল নিশ্চিত করা।

ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য সুবিধা: এই নীতিমালায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সুবিধাগুলি নিশ্চিত করার জন্য প্রথমত, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিমের প্রিমিয়ামের একটি অংশ সরকার ও নিয়োগকারীকর্তৃক বহন এবং শ্রমিকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় কর্মসূচি চালু করা। এছাড়া শ্রমিকদের অবসরের পর স্বাস্থ্যসেবা ও জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা দিতে জীবন বিমা সুবিধাসহ উপযুক্ত কর্মসূচি চালু করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য বিশেষ পেনশন স্কিম চালু করা, যা বিমা সুবিধার আওতায় থাকবে এবং শ্রমিকের আয় অনুসারে কন্ট্রিবিউটরি, নন-কন্ট্রিবিউটরি বা ভলান্টারি হতে পারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রান্তিক শ্রমিকদের পেনশনের চাঁদা সরকার ও নিয়োগকারী যৌথভাবে বহন করবে। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা দেওয়ার সুযোগ থাকবে। সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য পৃথক বিমা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে, যেখানে কর্মক্ষমতা হারালে আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসা সেবা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ, মেডিকেল বিমা ও মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা সুবিধা দেওয়া হবে। আকস্মিক কর্মহীনতার জন্য একটি সময়সীমা পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রান্তিক শ্রমিকের বিমার প্রিমিয়াম সরকার বহন করবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্ব নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পূর্ণ বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হবে, যা সরকারি সহায়তা ও নিয়োগকারীর যৌথ তহবিলের মাধ্যমে দেওয়া যাবে।

ঙ) ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সুরক্ষা: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য একটি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু করা এবং তাদেরকে পেনশন, স্বাস্থ্য বিমা ও দুর্ঘটনা সুবিধার আওতায় আনা আবশ্যক। ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সুরক্ষার জন্য গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সরকারি আইন ও বিধিবিধানের আওতায় আনা প্রয়োজন, যাতে তারা সামাজিক সুরক্ষা, মজুরি সুরক্ষা ও শ্রম অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারেন।

চ) অভিবাসী শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা: বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে পেনশন, বিমা ও পুনর্বাসন সুবিধা।

৩.৪.২ কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সুরক্ষা ও কল্যাণ

বর্তমানে দুর্ঘটনার পর শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ অপ্রতুল এবং প্রাপ্তির প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। পোশাক খাত ছাড়া অন্য খাতে দুর্ঘটনা বিমার সুযোগ কম, ফলে শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হন। ২০২২ সালে পোশাক খাতে দুর্ঘটনা বিমা চালু হলেও অন্যান্য খাতে EIS না থাকায় এবং সচেতনতার অভাবে শ্রমিকরা আর্থিক সংকটে পড়েন। কর্মক্ষমতা হারালে

শ্রমিক ও তার পরিবার চরম সংকটে পড়ে; নিরাপত্তাহীনতা ও মানসিক চাপ বাড়ে। এর ফলে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটে ও শিল্পের স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয় এবং দক্ষ শ্রমিক হারানোর ঝুঁকি বাড়ে।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বর্তমান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপ্রতুল বিধায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা এবং একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইএলও কনভেনশন ১২১ ও হাইকোর্ট কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

খ) দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার পর শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা ও দীর্ঘমেয়াদি ভাতা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী ও দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের জন্য আজীবন চিকিৎসা, ভরণপোষণ এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা প্রদান।

গ) সকল খাত এবং সকল শ্রমিকের জন্য দুর্ঘটনা বিমা/এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম বাধ্যতামূলক করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধন করা।

ঘ) দুর্ঘটনায় মৃত অথবা আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারানো শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যতদিন না তারা উপার্জনক্ষম হয়। এ সকল শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের জন্য চাকরি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি প্রণয়ন।

ঙ) শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিলের জন্য ডিজিটাল আবেদন পদ্ধতি চালু করা এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য ত্রিপক্ষীয় নিরীক্ষা ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা। শ্রমিক কল্যাণ এবং বিমা তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টাল চালু করা। আবেদন এবং ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা দিয়ে ডিজিটাল তহবিল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। প্রতি তিন মাসের পরিবর্তে প্রতি মাসে পরিচালনা কমিটির সভা আয়োজন বাধ্যতামূলক করা। কল্যাণ সুবিধার আওতা বৃদ্ধি করে সব খাতের শ্রমিককে (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত, গিগ/অ্যাপবেজড কর্মী) অন্তর্ভুক্ত করা এবং শ্রমিকদের পরিবারের জন্য সহায়তার পরিধি বৃদ্ধি করে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধন করা।

৩.৪.৩ বেকারত্ব ও আকস্মিক কর্মহীনতা থেকে সুরক্ষা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মঘটের কারণে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়ে জীবিকায় বড় বাধার সম্মুখীন হন। নির্দিষ্ট সহায়তা না থাকায় তারা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্বে পড়ে সঞ্চয় হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হন। বাংলাদেশে কৃষি ও মৎস্য খাতের মৌসুমি শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে কর্মহীন হয়ে পড়েন। হাওড়, পার্বত্য এলাকা এবং ফল চাষিদের জন্য বর্ষায় প্রায় পাঁচ মাস কর্মহীনতা দেখা যায় এবং মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে আয়হীন অবস্থায় থাকেন। কার্যকর কর্মসূচি ও তালিকাভুক্তির অভাবে এই শ্রমিকরা সরকারি সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হন এবং দারিদ্রের চক্রে আটকে যান।

মৌসুমি শ্রমিকদের অনিশ্চিত কর্মসংস্থান তাদের আর্থিক নিরাপত্তা হ্রাস করে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনমানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ করে, বাজার সংকুচিত করে এবং অপরাধপ্রবণতা বাড়াতে পারে। তাই মৌসুমি শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্বাসনমূলক নীতিমালা গ্রহণ করা জরুরি।

বেকারত্ব ও আকস্মিক কর্মহীনতা থেকে সুরক্ষায় শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) ১০০ দিনের কর্মসূচির মতো উদ্যোগ গ্রহণ, যা মৌসুমি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময়েও কাজের সুযোগ ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, যাতে মৌসুমি শ্রমিকদের জন্য টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়। আধুনিক তথ্যব্যবস্থা (কমিশন প্রস্তাবিত তথ্য ভাণ্ডার) ব্যবহার করে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজ ও কার্যকর করা।

খ) শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যরেখে মৌসুমি শ্রমিকদের কর্মমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনঃকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনকে অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করা এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ও বেকারদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করতে বিশেষ নজরদারি ও মূল্যায়ন সেল গঠন।

গ) জাতীয় বাজেটে মৌসুমি ও বেকার শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে মৌসুমি শ্রমিকদের তালিকা প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদ করা। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও এনজিওদের একত্রিত করে কর্মসংস্থান উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা।

ঘ) প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে বিশেষ তহবিল গঠন।

ঙ) কমিশন প্রস্তাবিত সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে বেকারত্ব ভাতা/'আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট স্কিম' চালু করা এবং এ লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠন করা, যার মাধ্যমে বেকারত্বের সময় শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। তহবিল গঠনে নিয়োগকারী, শ্রমিক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নের ব্যবস্থা এবং বাজেটে বরাদ্দ রাখা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর' বেকারত্ব ভাতা পরিচালনা করবে।

৩.৪.৪ মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও কল্যাণ

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকরা কিছুটা মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার অধিকার পেলেও গৃহকর্মী, কৃষি শ্রমিক ও ছোট শিল্পের কর্মীরা এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত। মাতৃত্বকালীন ছুটির অভাবে নারীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও যত্ন নিতে পারেন না, যার ফলে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে। পিতৃত্বকালীন ছুটির অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা হয় ও পারিবারিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়। আর্থিক সুরক্ষা না থাকলে, শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন সময়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে, যা তাদের জীবনযাত্রার মানে বিপর্যয় ঘটায় এবং পরিবারে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে শ্রমিকদের মর্যাদা হ্রাস ও কর্মজীবনে ফিরে আসতে না পারায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও কল্যাণে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) যে কোনো শ্রমিকের ন্যূনতম ৬ মাসের মজুরিসহ সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর সক্ষমতা বিবেচনায় শ্রম আইনের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ৪ মাসের সবেতন ছুটির সাথে প্রয়োজনে বাকী দুইমাসের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তহবিল অথবা সরকারের অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার অধীনে সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও স্ব-নিয়োজিত শ্রমিকের জন্য নিয়োগকারীর পাশাপাশি, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার একটি কাঠামো তৈরি করা। সরকারের বিদ্যমান সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এসকল কর্মসূচির আওতা এবং সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

গ) পিতৃত্বকালীন ছুটির জন্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ছুটির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

ঘ) সামাজিক বিমার মাধ্যমে ফ্রি-ল্যান্স সহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ঙ) নারী শ্রমিকের গর্ভকালীন সময় ও সন্তান জন্মদান পরবর্তী সময়ের জন্য নমনীয় কাজের পরিবেশ ও সহায়তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে মাতৃত্বকালীন ছুটির অতিরিক্ত ঐচ্ছিক দুই বছরের ছুটি (বিনা বেতনে), অতিরিক্ত কাজ থেকে অব্যাহতি, নমনীয় কাজের সময়সূচি এবং কাজের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্রামের সুযোগ।

চ) বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম নীতিতে নমনীয় কাজ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধান ও দিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.৪.৫ অবসরকালীন ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষা

সর্বজনীন পেনশন স্কিম শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তির সীমাবদ্ধতা, সচেতনতার অভাব, অর্থায়নের চাপ এবং প্রশাসনিক জটিলতায়এর কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নিম্ন আয়ের শ্রমিকরা নিয়মিত চাঁদা দিতে না পারায় অনেকেই স্কিমের বাইরে থাকেন। ক্রীড়া, পাঠাগার, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম না থাকায় শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সংযুক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবসরকালীন বিনোদনের অভাব

পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ও কর্মক্ষমতা কমায়। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশে ৭ কোটি ৯ লাখ ৮৩ হাজার কর্মী আছেন, তবে মাত্র ৪.৯% সরকারি চাকরি করা ব্যক্তি ভবিষ্য তহবিল এবং গ্রাচুইটি পান।[14] বাকি ৯৫% শ্রমিক এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যা তাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দুর্বল করে ফেলে, ফলে তাদের জীবনমান এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সংকটাপন্ন হয়।

অবসরকালীন ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের আওতায় সরকার কর্তৃক চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিক বান্ধব পেনশন স্কিম চালু করা। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম পেনশন সুবিধা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য সরকারি সহায়তা প্রদান করা। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও কেন্দ্রীভূত পেনশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শ্রমিকদের সহজেই অন্তর্ভুক্তি এবং পেনশন দাবি নিশ্চিত করা। আঞ্চলিক পর্যায়ে পেনশন অফিস স্থাপন ও একটি মনিটরিং ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন।

খ) পেনশন তহবিল সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করা, যার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। শ্রমিকদের জন্য সহজলভ্য আইনি সহায়তা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সহজতর করতে আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করা। শ্রম কল্যাণ ন্যায়পাল নিয়োগ করে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা, যা সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করবে। শ্রমিকদের অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ এবং সমাধান করার জন্য একটি হেল্পলাইন বা টোল-ফ্রি নম্বর চালু করে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা। পেনশন ব্যবস্থাপনা ও আবেদন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে শ্রমিকদের তথ্য আপডেট, পেনশনের চাঁদা জমা এবং দাবি করার প্রক্রিয়া সহজ করা। পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা মনিটর করার জন্য একটি মনিটরিং ইউনিট গঠন করা এবং অনিয়ম রোধে ত্রিপক্ষীয় নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

গ) পেনশন তহবিল ব্যবহারের জন্য নিরীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা। প্রতিটি শিল্পে কার্যকর অভিযোগ পদ্ধতি চালু করে নিয়োগকারী, শ্রমিক এবং সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা। তহবিল ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা এবং অনিয়ম রোধে নিয়মিত মনিটরিং এবং অডিট করা। তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি নিরীক্ষক কমিশন গঠন করা। নিয়োগকারী, শ্রমিক এবং সরকারের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি গঠন এবং পেনশন নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম গঠন করা। শ্রমিক সংগঠনগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার ও সুবিধাগুলি সচেতনভাবে বাস্তবায়ন করা।

ঘ) শ্রমিকদের অবসরকালীন বিনোদন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন করা এবং সরকারি সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে/শিল্পাঞ্চলে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা।

৩.৪.৬ শ্রমিকের পরিবার ও সন্তানের সুরক্ষা

বর্তমানে নিম্ন আয়ের শ্রমিকরা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মজুরি বৈষম্যের কারণে কঠিন জীবনযাপন করছেন। কার্যকর বাজার ও রেশনিং ব্যবস্থার অভাবে তাদের মৌলিক অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা উপবৃত্তির ব্যবস্থা না থাকায় নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের সন্তানরা ভালো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শ্রমিকরা মানসম্পন্ন শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদিও এটি সংবিধান ঘোষিত অধিকার।

শ্রমিকের পরিবার ও সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শিল্পাঞ্চল এবং গ্রামীণ এলাকায় ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে 'রেশন শপ' সুবিধা চালু করা। শ্রমিকদের জন্য 'কার্ড ভিত্তিক রেশনিং' ব্যবস্থা চালু করা, যাতে তারা ন্যায্য মূল্যে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পেতে পারেন। এছাড়া মজুরির সঙ্গে ভর্তুকি ভিত্তিক খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

---

[14] Bangladesh Bureau of Statistics. (2024, May 6). Quarterly Labour Force Survey (QLFS) Q4:2024. Bangladesh Bureau of Statistics. Retrieved from https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/2024-05-06-06-58-10aa7c13d49318982373a0f47252ae5f.pdf

খ) রেশনিং ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত কারখানা ও শিল্পঘন এলাকা ভিত্তিক 'ওএমএস'-এর মাধ্যমে পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

গ) নিম্ন আয়ের শ্রমিক পরিবারের সন্তানের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির নীতি প্রণয়ন ও বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করা। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শ্রমিক পরিবারের সন্তানের জন্য বৃত্তির সুবিধা বাড়ানো ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে সাধারণ শ্রমিক পরিবার থেকে নেওয়া এবং তাদের শিক্ষার ব্যয় সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা।

ঘ) শ্রমিকের সন্তানদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করা, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

৩.৪.৭ ডে কেয়ার সুবিধা

শ্রমিকঘন এলাকায় ডে কেয়ার ও দুগ্ধপান কর্নারের অভাব কর্মরত মা ও শিশুদের জন্য একটি বড় সমস্যা। অনেক নারী সন্তান লালন-পালনের চাপে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পেশাগত উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। কমিউনিটি ভিত্তিক ডে কেয়ার সুবিধার অভাব, ব্যয়সাপেক্ষতা এবং সচেতনতার অভাব নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সীমিত করছে। এই অভাব শিল্পের প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ডে কেয়ার সুবিধা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) সকল কর্মস্থল/অঞ্চল ভিত্তিক ডে-কেয়ার চালুর বিধান চালু করা এবং এ লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা। বর্তমান শ্রম আইন ও নীতিতে ডে কেয়ার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে "ডে কেয়ার সুবিধা নীতি" প্রণয়ন করা, যা কর্মস্থলে ডে কেয়ার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করবে।

খ) কারখানা/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ডে-কেয়ারের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল ও শ্রমিকের বসবাসের এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি ভিত্তিক ডে-কেয়ার কেন্দ্র স্থাপন।

গ) স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি ভিত্তিক ডে-কেয়ারসমূহের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা।

ঘ) ডে-কেয়ার সমূহের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা।

৩.৪.৮ স্বাস্থ্য সুরক্ষা

শিল্পঘন এলাকায় শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবার অভাব একটি বড় সমস্যা, বিশেষত নারী শ্রমিকদের জন্য। স্বাস্থ্যবিমার অভাবে শ্রমিকরা আর্থিক সংকটে পড়েন এবং পুনর্বাসনের সুযোগ না থাকায় বারবার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হন, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে, তাদের কর্মদক্ষতা কমে যায়, যা জাতীয় উৎপাদনশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং পরিবার সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় তাদের জীবনমান ও কর্মক্ষমতা কমে যায়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা এবং তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা, সঠিক পরামর্শ এবং সেবা নিশ্চিত করা। শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে সান্ধ্যকালীন সেবা চালু করা।

খ) প্রতিটি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে দক্ষ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া যারা শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য, পেশাগত রোগ চিহ্নিত করে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করবেন। নারী শ্রমিকদের জন্য নারী চিকিৎসক, নার্স এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা।

গ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য 'শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড' চালু করা, যা তাদের স্বাস্থ্য তথ্য ও প্রাপ্য সুবিধাদি গ্রহণে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, ২৪ ঘণ্টা 'টোল ফ্রি' টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা, যাতে শ্রমিকেরা যে কোনো সময় স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারেন, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে।

ঘ) শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা। এই সেবার মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

ঙ) শ্রমিকদের জন্য "স্বাস্থ্য সঞ্চয় প্রকল্প" চালু করা, যাতে তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সঞ্চয় করতে পারেন। এছাড়া সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যবিমা চালু করা, যার মাধ্যমে শ্রমিকরা কম খরচে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা লাভ করতে পারবেন।

চ) দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা আবার নিরাপদভাবে কর্মক্ষম হতে পারে।

৩.৪.৯ প্রতিবন্ধী শ্রমিক সুরক্ষা

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা ও সহায়তা এখনো পর্যাপ্ত নয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চেকলিস্টে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং ও সহায়ক কর্মপরিবেশের অভাব তাদের কর্মজীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। দুর্ঘটনায় অক্ষম শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সুযোগ সীমিত, ফলে তারা কর্মস্থলে ফিরতে পারেন না। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব, প্রবেশগম্যতা ও সহায়তার অভাবে তারা দীর্ঘমেয়াদে কর্মজীবন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন, যা তাদের আয়ের নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করে এবং পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করে। প্রতিবন্ধী শ্রমিক সুরক্ষায় শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম আইনে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা। যেমন; কর্মক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান সংযোজন; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চেকলিস্টে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ মানদণ্ড সংযোজন; দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার ক্ষেত্রে আজীবন চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা দিতে সামাজিক সুরক্ষা আইনে বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা; শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা; দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার ক্ষেত্রে আজীবন চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা।

খ) নিয়োগকারী, শ্রমিক সংগঠন ও সরকারের মধ্যে সামাজিক সংলাপ জোরদার করে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা। দুর্ঘটনায় অক্ষম হয়ে পড়া শ্রমিকদের পুনর্বাসনে সরকার ও নিয়োগকর্তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

৩.৪.১০ শ্রমিকের আবাসন

নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের অভাবে শ্রমিকরা অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হন, যা তাদের শারীরিক-মানসিক সুস্থতা ও উৎপাদনশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সরকারি-বেসরকারি আবাসন প্রকল্প সীমিত হওয়ায় শ্রমিকদের চাহিদা পূরণ হয় না, বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে সমস্যা আরও প্রকট। অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম শ্রমিকদের জন্য আবাসন সুবিধার অনুপস্থিতি তাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বাড়ায়। অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও নীতিগত দুর্বলতার কারণে শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না, যা শিল্পখাত ও অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নিরাপদ আবাসন না থাকায় কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি ও চাকরি পরিবর্তনের প্রবণতা বাড়ছে, যা শিল্পের ধারাবাহিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে।

শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমিকদের আবাসনকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি "শ্রমিক আবাসন নীতি" প্রণয়ন করা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্প ও শ্রমঘন এলাকায় সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা।

খ) জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালায় প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যাতে করে প্রতিটি জেলায় বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে আবাসন ও কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত হয়।

গ) সকল শ্রমিকের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন নিশ্চিতে 'শ্রমিক আবাসন তহবিল' গঠন এবং শ্রমিকদের জন্য স্বল্পসুদে গৃহঋণ, আবাসন ভর্তুকি এবং আবাসন তহবিল গঠনের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে স্বল্পসুদে গৃহঋণ সুবিধা চালু। এছাড়া শ্রমিকদের আবাসন নিশ্চিতে শিল্প মালিককে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান এবং এ লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা।

ঘ) শ্রমিকদের আবাসন সুবিধার বাস্তবায়নে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠন করা। শ্রম মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৩.৪.১১ প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ

প্রবাসে নিহত শ্রমিকদের পরিবার যথাযথ ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে পড়ে, আর আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে তারা চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ২০০৮ থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ৪৫,৩০১ জন প্রবাসী শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে এসেছে, যার মধ্যে ৬৩% উপসাগরীয় দেশ থেকে।[15] শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বহনে অক্ষমতা, হতাশা, মানসিক চাপ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের জীবনকে আরও সংকটাপন্ন করে তোলে। আহত শ্রমিকরা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে সম্মানজনক জীবনের সুযোগ হারান এবং কর্মসংস্থানের অভাব দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের হতাশা বাড়িয়ে দেয়, যা পরিবার ও সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রবাসে নিহত শ্রমিকদের পরিবারের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা। প্রতারিত ও আহত শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিশ্চিতকরণ এবং এক্ষেত্রে প্রবাসী শ্রমিকের বিমা থেকে প্রাপ্ত আয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত বিমা তহবিল অলাভজনক হিসেবে ব্যবহার করা।

খ) প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক জীবনবিমা চালু, যাতে দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবার ক্ষতিপূরণ পায়। ফিরে আসা শ্রমিকদের (সক্ষম অথবা আহত) দেশের অর্থনীতিতে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির জন্য জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

৩.৪.১২ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি ইউনিট/সেল থাকবে যার দায়িত্ব হবে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী ও শ্রমিকের মাঝে সচেতনা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।

---

[15] The Daily Star. (2024, May 6). The sickening silence over Bangladeshi migrant worker deaths. The Daily Star. Retrieved from https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/the-sickening-silence-over-bangladeshi-migrant-worker-deaths-3198546

৩.৫ সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি

নাগরিকের সংগঠন করার স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদ নাগরিকদের সংগঠন করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে, "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা—নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে (অনুচ্ছেদ ৩৮)।" সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার আইএলও কর্মক্ষেত্রের মৌলি নীতি ও অধিকারের অংশ এবং এমন একটি উপায় যা শিল্পে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক, গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা, ভারসাম্যপূর্ণ, স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় বিচার ও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব কার্যকর করার পূর্ব শর্ত। তাই একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থা গড়তে হলে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার, তাদের মতামত প্রকাশের এবং কোনো বাধা ছাড়াই নিয়োগকারীদের সঙ্গে যৌথ দরকষাকষির সুযোগ থাকতে হবে। আইনগত বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব, যা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশের শ্রমনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের আলোকে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা। শোভন কর্মক্ষেত্রের অন্যতম শর্ত হলো শ্রমিকের 'প্রতিনিধিত্ব'। শ্রমনীতিতে শ্রমিকদের সংগঠন করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে, "শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শ্রমিকদের আইনানুগ অধিকারসমূহ রক্ষা এবং আয়বৈষম্য কমিয়ে আনাসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সুস্থ ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের সংবিধান, শ্রম আইন ও আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি কার্যক্রমকে (গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ) উৎসাহিত করতে সরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে (১৩.০১. ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ)" শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার তথা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬—এ বিধিবিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৯৪৮ (নং ৮৭) এবং সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৯৪৯ (নং ৯৮) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি দলিল। অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী, শ্রমিক ও মালিকদের সংগঠনগুলির স্বাধীনভাবে তাদের সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। এটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করার নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা সংগঠনের স্বাধীনতা এবং কার্যক্রমকে সুরক্ষিত রাখে। অনুচ্ছেদ ৫-এ আরও বলা হয়েছে, শ্রমিক ও মালিক সংগঠনগুলির ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার অধিকার থাকবে এবং তারা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারবে, যা আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং সহযোগিতা বাড়াতে সহায়ক। একইভাবে কনভেনশন নং ৯৮ (১৯৪৯) শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ২০১০ (নং ১৮৯) অনুযায়ী গৃহশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ গৃহশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠনের বিধান অনুযায়ী সংগঠন, ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যোগদান করার অধিকার সুরক্ষিত করবে (অনুচ্ছেদ ৩)। সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তজার্তিক কনভেনশন ১৯৯০ অনুযায়ী সকল অভিবাসী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের বিষয়ে অধিকার দেওয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৬)।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে অভীষ্ট ৮ (Decent Work and Economic Growth) শ্রমিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত হয়েছে। এই লক্ষ্যের মধ্যে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং শোভন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সামাজিক সংলাপ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং সমষ্টিগত দরকষাকষির অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়, যা শ্রমিকদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুরক্ষার জন্য আইএলও শোভন কাজ বাংলাদেশ কর্মসূচি (DWCP ২০২২-২০২৬) বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। এই কর্মসূচির কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে: আন্তর্জাতিক শ্রম মান ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার উন্নত করা, শ্রমবাজার শাসন শক্তিশালী করা এবং সামাজিক সংলাপের সুযোগ বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রমিকদের সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আইএলও কনভেনশনগুলির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়ন সাধন করা। এই কর্মসূচির একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো সমষ্টিগত দরকষাকষি এবং সামাজিক সংলাপের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাংলাদেশে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা (Tripartite Consultation) কাঠামো শক্তিশালী করা এবং শ্রমিক ও মালিক সংগঠনগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠন এবং মালিক সংগঠনরা শিল্প সম্পর্কিত সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবে, যা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও উন্নতির জন্য সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন নং ৮৭ এবং ৯৮-এর অনুসমর্থনকারী দেশ হলেও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং দরকষাকষির চর্চার ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির মাত্র কম-বেশি ১৫ শতাংশ শ্রমিক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত যারা শ্রম আইনের আওতাভুক্ত। তাদের মধ্যেও একটি বড় অংশ পদ-পদবির কারণে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া বিদ্যমান শ্রম আইনে নিবন্ধন ব্যতীত ইউনিয়ন হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ রয়েছে যা শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে সংকুচিত করছে। ইউনিয়ন গঠনের জন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট শ্রমিকের ন্যূনতম ২০% এবং প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে নির্ধারিত অঞ্চলের মোট শ্রমিকের ন্যূনতম ৩০% সদস্যের শ্রম আইনের বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক শ্রম মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় যা প্রমাণের জটিলতা ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

ইউনিয়ন নিবন্ধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা শ্রম অধিদপ্তরের আইনের বিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াগত জটিলতা ইউনিয়ন নিবন্ধনকে আরো কঠিন করে তোলে যেমন; প্রস্তাবিত ইউনিয়নের প্রাতিষ্ঠানিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির স্বাক্ষর কার্যবিবরণী খাতায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং আবেদনকৃত ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কর্মক্ষেত্রে মোট শ্রমিকের সংখ্যা, তার মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সঠিকভাবে উল্লেখ করে এবং সদস্যরা কেউ ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত হয়নি বা দণ্ডিত হলেও শাস্তির মেয়াদের পরে দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এই মর্মে ঘোষণা দিয়ে নিবন্ধনের আবেদনের সাথে প্রত্যয়ন দিতে হয়। অথচ শ্রমিক ও ইউনিয়নের পক্ষে শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা জানার কোনো আইনগত উপায় নেই। এর ফলে তাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শ্রম অধিদপ্তর তার সন্তুষ্টি বিবেচনার ক্ষমতা (Descretion and Good Faith) এমনভাবে ব্যবহার করে যা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে আরও কঠিন করে তোলে।

ইউনিয়ন গঠনে বাধার মধ্যে ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের সুরক্ষার অভাব প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রম আইন ২০০৬-এর ২৬ ধারায় বরখাস্ত, ইত্যাদি ব্যতীত অন্যভাবে মালিক কতৃর্ক শ্রমিকের চাকরির অবসান করার একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ধারা ১৮০ অনুযায়ী যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত বা কর্মরত না থাকলে ইউনিয়নের নেতৃত্ব হারান। একজন সংগঠক যে কোনো সময় চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে থাকেন আর চাকরি হারানোর ফলশ্রুতিতে তারা ইউনিয়নের সদস্যপদ বা নেতৃত্বের অবস্থান হারান যা সুষ্ঠু ও স্বাধীন সংগঠনের চর্চায় বাধা সৃষ্টি করে।

৩.৫.১. সর্বজনীন সংগঠন ও অন্তর্ভুক্তির অধিকার

শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংঘবদ্ধ হওয়া, কর্মস্থলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা, প্রতিনিধিত্ব এবং যৌথ দরকষাকষিতে অংশ নেওয়ার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। এই অধিকারগুলি জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (UDHR), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মূল কনভেনশন, জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic and Cultural Rights, 1966) বাংলাদেশের সংবিধান এবং শ্রম আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। আইএলও স্যোশাল ডায়লগ ইনডিকেটরে প্রত্যেক শ্রমিকের নিয়োগের ধরন, পেশা, পদবি নির্বিশেষে এবং স্ব নিয়োজিত, দিনমজুর শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, প্রত্যেক নিয়োগকারীর সাথে প্রতিনিধিত্ব, দরকষাকষি এবং সামাজিক সংলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে।

সর্বজনীন সংগঠন ও অন্তর্ভুক্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের জন্য যে কোনো শিল্প, খাত বা কর্মসংস্থানের ধরন যা-ই হোক না কেন, তা প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক—সমানভাবে শ্রম আইনের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ইউনিয়নে যোগদান, প্রতিনিধিত্ব এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকের দরকষাকষি, নিজ এবং সমষ্টিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োগকারীর সাথে দরকষাকষি, বিভিন্ন সরকার, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার সাথে প্রতিনিধিত্ব অ্যাডভোকেসি ও সংলাপে অংশগ্রহণের অধিকার আইন দ্বারা নিশ্চিত করা। দরকষাকষির অধিকার সুরক্ষা ও চর্চার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সব ধরনের বাধা দূর করা।

৩.৫.২ সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো প্রস্তাবনা

বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের বাস্তবতা স্বীকার করে এমন একটি সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো গঠন করা জরুরি, যা সকল শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করবে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য কখনোই সংগঠিত হওয়ার বাধা হওয়া উচিত নয়। শ্রমিকদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে এবং শ্রম সুরক্ষা জোরদার করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নলিখিত ইউনিয়ন কাঠামো প্রস্তাব করছে:

ক) প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ইউনিয়ন গঠন

- একক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইউনিয়ন: নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন নিশ্চিত করা।
- চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোর্স শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি: কোনো প্রতিষ্ঠানে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে নিয়োজিত শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের ও যোগদানের অধিকার থাকবে এবং তাঁরা তাঁদের মালিক অর্থাৎ কন্ট্রাক্টর বা কন্ট্রাক্টিং এজেন্সিতে গঠিত ইউনিয়নে যোগ দিতে পারবেন। এতে নিশ্চিত হবে যে সাব-কন্ট্রাক্টের আওতায় থাকা শ্রমিকরা ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্ব ও শ্রম সুরক্ষার বাইরে পড়বে না।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ইউনিয়ন গঠন

- একটি নির্দিষ্ট শিল্প বা ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।
- প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের জন্য গঠিত ইউনিয়ন উক্ত প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের জন্য গঠিত নিয়োগকারীদের এসোসিয়েশনের সাথে দরকষাকষির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত একক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের পক্ষে অসন্তোষ নিরসন বা দরকষাকষি করার অধিকার থাকবে।

গ) নির্দিষ্ট শ্রেণির শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার

নির্দিষ্ট শ্রেণির শ্রমিকদের যেমন; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিক্রয় প্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ভিত্তিক ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকবে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের তাদের কর্মস্থলে যেখানে তারা নিযুক্ত রয়েছেন, সেখানেও ইউনিয়ন গঠন বা যোগদানের অধিকার থাকবে।

ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ইউনিয়ন গঠন

অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির শ্রমিক, যাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি নেই, তাদেরও তাদের যৌথ স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের প্রায়শই প্রচলিত শ্রম সুরক্ষা এবং যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়। যার ফলে তাদের ইউনিয়ন করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এমন আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- গৃহকর্মী ও ব্যক্তিগত সহকারী: তাদের অন্যান্য কাজের পরিবেশ—প্রায়শই বিচ্ছিন্ন পরিবেশে কাজ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তির অভাব— গৃহকর্মী, মালী, নিজস্ব ড্রাইভার সহ বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তির (যেমন ডাক্তার, আইনজীবী)

ব্যক্তিগত সহকারীদের সংগঠিত হওয়া, ইউনিয়ন গঠন এবং ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য আলোচনা করার অনুমতি প্রদান।

- দৈনিক মজুর ও অস্থায়ী কর্মী: যেসব কর্মী অস্থায়ী বা দিন ভিত্তিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত, তাদের ন্যায্য মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা, উন্নত কাজের পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষার সুবিধার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকা উচিত।
- হকার্স ও স্ব কর্মে নিয়োজিত কর্মী: স্ব কর্মে নিয়োজিত কর্মীদেরও সংগঠন গঠন ও যোগদানের অধিকার থাকা উচিত, যাতে তারা জোরপূর্বক উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষা, ন্যায্য পৌর নিয়ম, আইনি সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য দাবি জানাতে পারে।
- পরিবহণ কর্মী: সকল ধরনের রিকশাচালক, রাইড-শেয়ারিং, প্রাইভেট ড্রাইভার এবং সার্ভিস ডেলিভারি কর্মীদের মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবহণ কর্মীদের ন্যায্য আচরণ, নিরাপদ কাজের পরিবেশ, নিয়ন্ত্রণমূলক সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার সুবিধার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকা উচিত।
- কৃষি কর্মী (যারা কৃষি খামারে কাজ করে না): অনেক কৃষি কর্মী কাঠামোবদ্ধ কৃষি খামারের বাইরে কাজ করে, যেমন; মৌসুমি শ্রমিক, ভাগ চাষি বা স্বাধীন চাষি। এই কর্মীদের ন্যায্য মজুরি, জমির অধিকার, মধ্যস্বত্বভোগী বা ভূমি মালিকদের শোষণ থেকে সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার সুবিধার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকা উচিত।

ঙ) স্ব নিযুক্ত কর্মীদের দ্বারা ইউনিয়ন গঠন

- গিগ কর্মী, ফ্রিল্যান্সার, কারিগর এবং স্বাধীন ঠিকাদারসহ স্ব নিযুক্ত কর্মীদের তাদের সম্মিলিত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইউনিয়ন বা সংগঠন গঠনের অধিকার থাকা উচিত।
- এই ইউনিয়নগুলি ন্যায্য নিয়মকানুন, সামাজিক সুরক্ষা এবং সমান কাজের পরিবেশের পক্ষে advocacy করতে পারে, যার মধ্যে ন্যূনতম আয়ের গ্যারান্টি, স্বাস্থ্য সুবিধায় প্রবেশাধিকার এবং অন্যায্য চুক্তি সম্পাদন থেকে সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।
- এই ধরনের ইউনিয়নগুলি জাতীয় ফেডারেশন গঠনের অধিকার পাবে, যা স্ব নিযুক্ত কর্মীদের ইউনিয়নের খাত ভিত্তিক জাতীয় ফেডারেশন নামে পরিচিত হবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলির অধীনে গঠিত হবে।
- স্ব নিযুক্ত কর্মীদের পেনশন তহবিল, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জরুরি আর্থিক সহায়তা সহ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

চ) পেশাজীবীদের দ্বারা ইউনিয়ন গঠন

- শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, শিল্পী সহ বিভিন্ন পেশাজীবী এবং ব্যাংক, বিমা, আইটি কোম্পানিতে কর্মরত শিক্ষানবিস/জুনিয়র কর্মকর্তাদের তাদের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের উদ্বেগ এবং খাতগত সমস্যাগুলির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইউনিয়ন গঠন ও দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা।
- এই ধরনের ইউনিয়ন জাতীয় এবং অঞ্চলভিত্তিক হতে পারে এবং ইউনিয়নগুলি জাতীয় ফেডারেশন গঠনের অধিকার পাবে।
- পেশাজীবীদের নিজস্ব ইউনিয়নের পাশাপাশি নিজস্ব কর্মস্থলেও ইউনিয়ন গঠন এবং যোগদানের অধিকার থাকবে।

৩.৫.৩ সংগঠিতকরণকালীন ইউনিয়নের সুরক্ষা

শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে, শ্রমিকদের অবশ্যই ইউনিয়ন গঠন এবং ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সব ধরনের সুরক্ষা থাকতে হবে, যাতে তারা অযৌক্তিক বিধিনিষেধ, চাকরিচ্যুতি বা হয়রানির সম্মুখীন না হয়। এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত আইনের নির্দিষ্ট বিধানগুলিকে সীমিত না করে শ্রম অধিদপ্তরের আইনগত ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করে বিদ্যমান এসওপি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করা, যেন ইউনিয়ন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে শ্রম অধিদপ্তর সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩.৫.৪. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া

একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ব্যবস্থা বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য। বর্তমান শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে, সকল ধরনের ট্রেড ইউনিয়নের জন্য, যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ইউনিয়ন, স্ব নিযুক্ত কর্মী এবং পেশাজীবীদের ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত, নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হবে। আইনটি নিশ্চিত করবে যে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন যেন ইচ্ছামতো প্রত্যাখ্যান বা অযৌক্তিক বিলম্বের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়। শ্রম আইনে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সদস্যসংখ্যার শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত বিধান ইউনিয়ন গঠন, সদস্য সংগ্রহ ও প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি বড় বাধা। বড় কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রমঘন খাতগুলিতে, এই শর্ত পূরণ করা কঠিন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানে মোট শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা জানা ইউনিয়ন গঠনে ইচ্ছুক শ্রমিকদের পক্ষে অসম্ভব। শ্রমিক সংখ্যা নিয়ে প্রায়শই নিয়োগকারী ও ইউনিয়নের দাবির মধ্যে পার্থক্য হয় যার কারণে শ্রম বিভাগ (DoL) কর্তৃক ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এমনকি ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগের কারণে সংগঠকদের চাকরিচ্যুতি বা হয়রানির শিকার হতে হয়। প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঠিক শ্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ করা শ্রমিক বা ইউনিয়নগুলির জন্য অত্যন্ত কঠিন। শ্রমিকসংখ্যা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক রেজিস্টার প্রায়শই নিয়োগকারীদের দ্বারা সংরক্ষিত হয় না বা এটি হেরফের করা হয়। পাশাপাশি শ্রমিকদের পরিচয় ও শ্রমিক সংখ্যার জন্য স্থানীয় এলাকার কাউন্সিলর বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়, যা ইউনিয়নের পক্ষে সংগ্রহ করা দুরূহ, ফলে ইউনিয়নের আবেদন প্রত্যাখাত হয়। শ্রম আইন অনুসারে ইউনিয়নগুলিকে নিবন্ধনের আবেদন করার আগে গঠনতন্ত্র প্রস্তুত, নেতা নির্বাচন এবং সাধারণ সভা আয়োজন করতে হয় যা শ্রমিকদের জন্য চ্যালেঞ্জিং।

ইউনিয়ন আবেদন অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে শ্রম অধিদপ্তরের (DoL) মহাপরিচালকের অনির্দিষ্ট ঐচ্ছিক ক্ষমতা রয়েছে, যার ফলে অসংগতিপূর্ণ ও অস্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তদন্তের পরে শ্রম অধিদপ্তরের প্রাপ্ত আপত্তি বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ থাকে না। ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। যার ফলে বিলম্ব, ইচ্ছামতো প্রত্যাখ্যান এবং দুর্নীতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। শিল্পসম্পর্ক উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে দরকষাকষি চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন গঠনে অধিক সদস্য সংখ্যার শর্ত হ্রাস করা, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, শ্রমিক সুরক্ষা শক্তিশালী করা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য অধিকতর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে:

ক) সদস্যসংখ্যার সীমার শর্ত সহজীকরণ

- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সদস্যসংখ্যার সীমার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকের অনুপাতের শর্তের পরিবর্তে ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনা করা যেতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অভিজ্ঞতা ও অনুসরনীয় মডেল বিবেচনা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারণ ও তৎপ্রেক্ষিতে দরকষাকষির প্রতিনিধি নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন।
- প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে ৩০% সদস্যতার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে ন্যূনতম ৫০ জনে নামিয়ে আনা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ইউনিয়নের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য সদস্যসংখ্যা ন্যূনতম ৫০ জন এবং জাতীয়ভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য ন্যূনতম ৪০০ জন নির্ধারণ করা।
- এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রমিকের তথ্যভাণ্ডার (সেকশন ৩.১.৩ দেখুন) তৈরি করার পূর্ব পর্যন্ত নিয়োগকর্তা বা ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র বা পেশা উল্লেখিত নাগরিক সনদপত্র অথবা সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বা জাতীয় নিবন্ধিত ফেডারেশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্রকে শ্রমিকের পরিচয় শনাক্তের প্রমাণক হিসাবে বিবেচনা করা।

খ) স্বচ্ছ এবং ন্যায্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা

- শ্রম অধিদপ্তরকে (DoL) ইউনিয়ন নিবন্ধনের সিদ্ধান্তের জন্য একটি স্পষ্ট, নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলা আবশ্যক।
  - ৫৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া। সময়মতো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য DoL-কে জবাবদিহি করা।
  - কোনো ঘাটতি থাকলে ১২ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানানো।
  - ইউনিয়নগুলিকে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানের আগে আপত্তিগুলি জানিয়ে পুনরায় চিঠি দেওয়া এবং জবাব দেওয়ার জন্য ১৫ দিনের সময় দেওয়া।
- নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনের জন্য একই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) তৈরি এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, যাতে সকল ক্ষেত্রে অভিন্নতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

গ) শ্রম অধিদপ্তরের ক্ষমতার যৌক্তিক প্রয়োগ

- শ্রম অধিদপ্তরকে যে কোনো ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের জন্য লিখিত, আইনগতভাবে ন্যায্য কারণ প্রদান করতে বিধান রাখা।
- নথিপত্রে ত্রুটির কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যান না করে, ইউনিয়নগুলিকে ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ দেয়া নিশ্চিত করা।

ঘ) শ্রমিকদের রক্ষা

- ইউনিয়ন সংগঠকদের বরখাস্ত বা হয়রানি করার জন্য শ্রম আইনে শাস্তি বৃদ্ধি করা উচিত।
- শ্রম আইনের ধারা ১৯৫ ও ধারা ১৯৬ (ক) অনুসারে অসৎ শ্রম আচরণের প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের শ্রম আদালতে যাওয়ার বিধান নেই। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করার অধিকার থাকা উচিত এবং মামলাগুলি ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা নিশ্চিত করা উচিত।

ঙ) সাধারণ সভার বিকল্প

- ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগের বৈষম্যমূলক পদ্ধতি অবসানের জন্য ইউনিয়ন গঠনের সময় একটি প্রাতিষ্ঠানিক সভা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া এবং ইউনিয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিকল্প পদ্ধতি চালু করার সুপারিশ করা হলো। বিশেষভাবে, এই ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের সাধারণ সভায় বা লিখিত সিদ্ধান্তের (resolution) মাধ্যমে গৃহীত হতে পারে, যা ইউনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা তাদের প্রতিষ্ঠান আইডি কার্ড নম্বর (যদি নিয়োগকর্তা দ্বারা প্রদান করা হয়) বা জাতীয় আইডি কার্ড বা জন্ম নিবন্ধন নম্বরসহ যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হবে।

চ) ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য ও সংগঠকদের সুরক্ষা বৃদ্ধি

- শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৯৫ ও ১৯৬ (ক) সংশোধন করে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য এবং সংগঠকদের সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আইনে এমন সুরক্ষা ব্যবস্থা সংযোজন করা দরকার যা অসৎ শ্রম অনুশীলন, যেমন; হয়রানি, হুমকি এবং ইউনিয়ন সংগঠক, সদস্য, কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতি, অবসান বা বরখাস্তের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করবে। যারা ইউনিয়ন গঠনের জন্য চাকরি হারান, তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা অব্যাহত রাখার অধিকার থাকা উচিত এবং হয়রানির বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার পাওয়া নিশ্চিত করা জরুরি।
- অন্যায্য শ্রম অনুশীলন সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালত এবং শ্রম অধিদপ্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত।
- যদি শ্রম অধিদপ্তর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাদের জন্য একটি কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির নির্বাচন

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ৩১৭ (৪) (ঘ) সংশোধন করে কেবল ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আহুত হলে বা নির্বাচন বিষয়ক কোনো বিরোধ দেখা দিলে ১০% সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক নির্বাচন তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করতে পারেন, এ বিষয়ে বিধান যুক্ত করা উচিত।

জ) ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিলের বিধান

- ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হারের চাইতে হ্রাস পাওয়ার কারণে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করার বিধান রহিত করা উচিৎ।

৩.৫.৫ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন

বর্তমান আইনগত কাঠামো অনুযায়ী, একটি ট্রেড ইউনিয়নের ফেডারেশন নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (Collective Bargaining Agent - CBA) হিসেবে ঐ ইউনিয়নের পক্ষে দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রচলিত বিধান অনুযায়ী, কোনো ফেডারেশন তার অধিভুক্ত ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদন পেলে শ্রমিকদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষি করতে পারে। কিন্তু এই অনুমোদনের জন্য আরও একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা হলো — ফেডারেশন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে এ ধরনের ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধান থাকতে হবে। এই অতিরিক্ত শর্তটি অধিভুক্ত ইউনিয়নের পক্ষে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নির্বাচনের স্বাধীনতাকে অকারণে সীমিত করে এবং কার্যকর যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করে। এমতাবস্থায়, "কোনো ফেডারেশনকে এ ধরনের অনুমোদন প্রদান গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত না থাকলে অনুমোদনযোগ্য হবে না" — এই শর্তটি বাতিল করার সুপারিশ করা হচ্ছে। যদি কোনো ইউনিয়ন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নির্বাহী কমিটি অনুমোদন তবে উক্ত ফেডারেশনকে তাদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

ফেডারেশনের কার্যক্রম

ক) শ্রমিকদের জন্য আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

- শ্রম সম্পর্কিত বিরোধ, আইনি বিষয় এবং অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টায় তাদের সম্মতিতে, কোনও নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নয় এমন শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করা।
- অসংগঠিত বা অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আইনি সহায়তা, আর্থিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান।

খ) শ্রম অধিকার সুরক্ষা এবং প্রয়োগ

- শ্রম কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করা এবং শ্রম অধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্য বা অন্যায্য বরখাস্তের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- BLA-এর অধীনে আইনি কার্যক্রমে শ্রমিক বা ইউনিয়নের পক্ষে শ্রম সম্পর্কিত মামলা পরিচালনা করা।

গ) ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সংশ্লিষ্ট বিষয়

- বিএলএ সংশোধন করে একটি নির্দিষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলিকে এই কার্য সম্পাদনের জন্য আইনি কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এই স্বীকৃতি ফেডারেশনগুলিকে শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন, সামাজিক সংলাপে অংশগ্রহণ এবং ইউনিয়নভুক্ত এবং অইউনিয়নভুক্ত উভয় শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদানে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের ক্ষমতা দেবে।
- এই সংস্কারগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলি আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি নিশ্চিত করবে যে, সমস্ত শ্রমিক তাদের শিল্প, কর্মসংস্থানের অবস্থা বা ইউনিয়ন সদস্যপদ নির্বিশেষে - কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব, সুরক্ষা এবং সহায়তা পাবে।

৩.৫.৬ কমিটি, কমিশন এবং প্রতিনিধি দলে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব

জাতীয় TCC, সরকার গঠিত কমিটি, কমিশন এবং প্রতিনিধি দলে, যেখানে শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সেখানে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের একটি নির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোনীত বা নির্বাচিত করতে হবে। বিগত সময়ে সরকারের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী কাঠামোয় শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ, যার ফলে তারা শ্রমিকদের স্বার্থের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে মালিকদের সমকক্ষ সমিতি খুঁজে বের করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে অথবা অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের কোনো নিয়োগকর্তাদের সমিতি থাকে না, যার সাথে ইউনিয়ন/সিবিএ যৌথ দরকষাকষি বা তাদের সদস্যদের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছে:

ক) জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটি TCC, শ্রম আদালেতের সদস্য মনোনয়ন, সরকার গঠিত যে কোনো কমিটি, কমিশন এবং প্রতিনিধি দলে, যেখানে শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সেখানে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের একটি নির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোনীত বা নির্বাচিত করতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত, যেমন; ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের চাঁদা দানকারী সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ, ফেডারেশনসমূহের চাঁদা দানকারী সদস্যের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণের গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা উচিৎ। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফোরামের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী ইউনিয়নের সদস্যের ভিত্তিতে ক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার উপযুক্ত দক্ষতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্ব নিযুক্ত কর্মী বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে গঠিত ইউনিয়নের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) যদি প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সদস্য হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে তার ঐ সদস্যদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষি বা অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সরাসরি সংলাপে যুক্ত হওয়ার অধিকার রাখবে।

গ) শ্রম অধিদপ্তর ইউনিয়ন/ফেডারেশন কর্তৃক দাখিলকৃত বাৎসরিক রিটার্নের ভিত্তিতে চাঁদা দানকারী সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী ইউনিয়ন/ফেডারেশনসমূহের একটি হালনাগাদ তালিকা তৈরি করবে। এই তালিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটি/ফোরাম/আদালত ও আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন সহ সামাজিক সংলাপ ফোরাম এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামের প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদানের বিধান করা। প্রতি পাঁচ বছর পর পর সদস্যসংখ্যা যাচাইয়ের মাধ্যমে এই তালিকা হালনাগাদ করা। তবে উল্লেখ্য যে, এই সদস্যসংখ্যা ইউনিয়ন বাতিলের কোনও শর্ত হবে না।

ঘ) প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে ক্রম অনুযায়ী আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করা। প্রতিষ্ঠান, সেক্টর ও জাতীয় পর্যায়ের একাধিক ইউনিয়নের সম্মিলিত প্লাটফরম বা জোটগত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্ত সকল সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যার যোগফল হিসাব করা।

৩.৫.৭ শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের নীতিমালা

বাংলাদেশের শ্রম আইনের ২০০ নম্বর ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের জন্য ন্যূনতম শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিধান অনুযায়ী, সেক্টরভিত্তিক ফেডারেশন গঠনের জন্য কমপক্ষে ৫টি ট্রেড ইউনিয়ন, জাতীয় ফেডারেশনের জন্য ২০টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং কনফেডারেশন গঠনের জন্য ১০টি জাতীয় ফেডারেশন লাগবে। যদিও এই বিধান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাঠামো তৈরি করেছে, তবে ইউনিয়ন গঠনের হার দ্রুত বাড়লে অতিরিক্ত সংখ্যক ফেডারেশন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অতিরিক্ত ফেডারেশন গঠনের ফলে ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্ব দুর্বল হতে পারে। এ ব্যাপারে সরকার ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইনের বিধিতে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশিত করতে পারবে।

৩.৬ শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার

অধিকার লঙ্ঘন ও বৈষম্য-বঞ্চনার বিরুদ্ধে যথাযথভাবে অভিযোগ পেশ, প্রতিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা অধিকার সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত। বাংলাদেশের সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৭ ও অনুচ্ছেদ ৩১ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইনের আশ্রয় লাভের সম-অধিকারী হবেন যা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ন্যায় বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে।

শ্রমনীতি ২০১২ অধীনে বাংলাদেশ সরকার বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এবং শিল্প অসন্তোষের সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করতে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান এবং শ্রম আদালত, আপিল আদালতের মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রমনীতিতে সুনির্দিষ্টভাবে (১৫.০০ বিরোধ নিষ্পত্তি) উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারের প্রচেষ্টা থাকবে যাতে শিল্পবিরোধ উদ্ভব না হয় এমন পরিবেশ বজায় রাখা এবং সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা। কোথাও শিল্পবিরোধের উদ্ভব হলে শিল্পে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যৌথ আলোচনা, আপোষ-মীমাংসা এবং বিচার ব্যবস্থাসহ, নিষ্পত্তির সকল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার অসৎ শ্রম আচরণকে নিরুৎসাহিত এবং দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সালিসি কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করবে। ন্যায় বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা বিষয়ে শ্রমনীতি উল্লেখ করেছে যে "বিচার প্রার্থীদের হয়রানি হ্রাসের জন্য শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে সরকার সচেষ্ট থাকবে।"

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপত্তা, মজুরি, কর্মপরিবেশ, ছুটি, ছাঁটাই, শ্রমিক কল্যাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অধিকার সম্পর্কিত বিধান প্রদানের পাশাপাশি অধিকার ও আইনে প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিধান লঙ্ঘন হলে শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াও নির্ধারণ করে। আইনের চতুর্দশ অধ্যায়ে (ধারা ২০৯-২৩১) বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা বিষয়ে আইনি কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একটি কাঠামোগত পদ্ধতি নির্ধারণ করে, যেখানে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে সালিসি ও মধ্যস্থতা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার পথ সুগম করা হয়েছে। এ ছাড়াও চতুর্দশ অধ্যায়ে ধর্মঘট ও লক আউট, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, বে আইনি ধর্মঘট ও লক আউট সম্পর্কে বিধান রয়েছে। যদি শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে কোনও বিরোধ ঘটে, তবে তা সমাধান করতে শ্রম আদালত বা শ্রম আপিল আদালত একটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। শ্রম আদালত এবং শ্রম আপিল আদালতের মাধ্যমে শিল্প বিরোধ সমাধান করা এবং আইনিভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করার বিধান রয়েছে। এছাড়া শ্রম ট্রাইব্যুনাল শ্রমিকের ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৪-এ অনুযায়ী, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকারসহ সংগঠিত হওয়ার অধিকার উল্লেখ করেছে। এর মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে অধিকার বিষয়ে অসন্তোষ বা বিরোধ উত্থাপন করতে এবং সেগুলির সমাধানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুমোদন দেয়। একইভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬-এর অনুচ্ছেদ ৮, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যোগদান, জাতীয় ফেডারেশন তৈরি, আন্তজার্তিক ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান এবং ধর্মঘট করার অধিকার নিশ্চিত করেছে। এর মাধ্যমে শ্রমিকরা যদি তাদের কর্মস্থলে কোনো সমস্যায় পড়েন, তবে তারা ধর্মঘটের মাধ্যমে তাদের দাবিগুলি উত্থাপন করতে পারেন, যা তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখে এবং কার্যকরী প্রতিবাদ প্রদর্শন করতে সাহায্য করে।

জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশনা (UNGPs) যেখানে "Protect, Respect and Remedy" কাঠামোর ভিত্তিতে সরকার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীল আচরণ করতে নির্দেশনা দেয়। নির্দেশনা মোতাবেক শ্রমিক সংগঠনগুলির কার্যক্রমে বাধা দিলে তা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার স্বীকৃত দেওয়া এবং যদি কোনো অসন্তোষ বা বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তা সুষ্ঠু প্রক্রিয়া মাধ্যমে প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করা।

আইএলও কনভেনশন নং ১৫৪ (যৌথ দরকষাকষি, ১৯৮১) যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়ার ব্যবহারে উৎসাহিত করে, যা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শিল্প বিরোধ প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে। এটি বাংলাদেশে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সরকারের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। আইএলও রিকমেন্ডেশন নং ৯২ (স্বেচ্ছাসেবী সালিস ও মধ্যস্থতা, ১৯৫১) শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সালিস (Arbitration) এবং মধ্যস্থতা (Conciliation) ব্যবহারের পরামর্শ দেয়। এই পরামর্শ অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক-মালিক বিরোধ সমাধানে সরাসরি ধর্মঘট বা লক আউটের পথে যাওয়ার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারে। আইএলও

ত্রিপাক্ষিক পরামর্শ কনভেনশন নং ১৪৪ (১৯৭৬) শ্রমিক, মালিক এবং সরকারের মধ্যে কার্যকর সংলাপ নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপাক্ষিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করে। এই কনভেনশনটি বাংলাদেশে ত্রিপাক্ষিক পরামর্শ এবং সমঝোতা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের জন্য এই কনভেনশনগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং শিল্প বিরোধ প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

শোভন কাজ বাংলাদেশ কর্মসূচির (Decent Work Country Program for Bangladesh ২০২২-২০২৬) কৌশলগত অগ্রাধিকার লক্ষ্য ৩ "আন্তর্জাতিক শ্রম মান ও কর্মস্থলের অধিকার উন্নতিতে, শ্রমবাজার শাসন শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক সংলাপ বৃদ্ধি" বাংলাদেশের সরকারের জন্য একটি অঙ্গীকার। এই অগ্রাধিকারটি শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যা শিল্প বিরোধ ও অসন্তোষ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কর্মসূচি শ্রমিকদের সংগঠন ও তাদের কার্যক্রমের সুরক্ষা প্রদান করে, যার মাধ্যমে সামাজিক সংলাপ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরও কার্যকরী হবে। সরকারকে এই লক্ষ্যগুলির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও সুষ্ঠু শ্রমবাজার গঠন করতে হবে, যা দীর্ঘমেয়াদি শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

৩.৬.১ অধিকার লঙ্ঘনে প্রতিকার ও ন্যায়বিচার

শিল্প ও শ্রম অসন্তোষ বৃদ্ধির পেছনের কারণ বহুমুখী এবং এ কারণসমূহ নিয়োগচুক্তি, কর্মপরিবেশ, কর্মস্থলে শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এবং কাঠামোগত ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিয়োগ শর্তাবলি লঙ্ঘন, যেমন; অপর্যাপ্ত মজুরি, মজুরি পরিশোধে বিলম্ব, ওভারটাইমের যথাযথ পারিশ্রমিক না পাওয়া এবং ছুটি সংক্রান্ত অনিয়ম, শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর পাশাপশি কর্মপরিবেশের অবনতি, বিশেষ করে নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব, বিশ্রামের সীমিত সুযোগ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগের অভাবের কারণে তাদের মাঝে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব অনেকক্ষেত্রে অমীমাংসিত থেকে যায়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন না থাকা অথবা ট্রেড ইউনিয়ন যথাযথভাবে কার্যকর হতে না পারার কারণে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া উত্থাপন ও দরকষাকষির সুযোগ কমে যায়, যা প্রকারান্তরে তাদের মধ্যে অসন্তোষকে বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে শ্রম অধিদপ্তর ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় শ্রম আইন যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি করে। সব মিলিয়ে এসব কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে শ্রম অসন্তোষ দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে, যা অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করছে।

প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন, অব্যাহত উৎপাদন এবং একটি সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক অপরিহার্য। এজন্য আইন দ্বারা শ্রমিকের অধিকারসমূহের সুরক্ষা, শক্তিশালী পরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত, শ্রমিকের সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর আলোচনা, দরকষাকষি ও আলোচনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। তবে বাংলাদেশে এই উদ্যোগ খুবই সীমিত ও দুর্বল। সর্বোপরি সংগঠন, দরকষাকষি ও সংগঠনের অধিকার চর্চার কার্যকর পরিবেশ না থাকা, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতির অনুপস্থিতি এবং ব্যাপক সংখ্যক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিককে আইনি সুরক্ষার বাইরে রাখার কারণে বঞ্চনা ও বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সামাজিকভাবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে। এমতাবস্থায় কমিশন মনে করে, বাংলাদেশের শ্রমজগতে বিদ্যমান বৈষম্য এবং শ্রমিকের অধিকারহীনতা ও ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিপরীতে প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থার অনুপস্থিতি চূড়ান্তভাবে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক ও জাতীয় উন্নয়নের বাধা। এ পরিস্থিতি থেকে উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিশন নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছে:

ক) সকল শ্রমিকের অধিকার ও ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার জন্য আইনানুগ সুরক্ষা ও সেটি বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা।

খ) শ্রমিকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার লঙ্ঘন ও প্রাপ্য না পাওয়ার বিপরীতে অভিযোগ দায়েরের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রাখা এবং প্রতিকার পাওয়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা।

গ) কারখানা পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে শ্রমিক ও মালিকের যথাযথ প্রতিনিধিত্বে আলোচনার আনুষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকা।

ঘ) কার্যকর যৌথ দরকষাকষি চর্চা এবং প্রয়োজনে সালিসি ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা।

ঙ) ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও শিল্প বিরোধ উভয় ক্ষেত্রেই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা।

চ) প্রয়োজন মাফিক যথেষ্ট শ্রম আদালত এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতে আদালতসমূহের সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

ছ) অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, স্ব নিয়োজিত শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরেও অভিযোগ নিষ্পত্তির বিশেষ ব্যবস্থা রাখা।

জ) মজুরি নির্ধারণে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের ভূমিকা ও পদ্ধতি আরও কার্যকর করা এবং মজুরি সময় মতো পরিশোধের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা।

৩.৬.২ বিরোধ নিষ্পত্তি

প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিরোধ নিষ্পত্তি

ক) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরোধ কারখানা পর্যায়ে সৃষ্টি হয়। তাই ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে কার্যকর আইনি প্রক্রিয়া বলবৎ ও শক্তিশালী করা।

খ) কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক সমাধান না পেলে শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর/শ্রম অধিদপ্তরের কাছে অভিযোগ জানানোর কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শক/শ্রম পরিচালকের কাছে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে তাদের অনুপস্থিতিতে সরকার নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে যাতে অভিযোগ জানানো ও নিষ্পত্তির আইনানুগ ব্যবস্থা থাকে তা নিশ্চিত করা। শ্রম আইনের ১২৪ (ক) ধারাকে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে আরো পূর্ণাঙ্গ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) উপর্যুক্ত দুটি পর্যায়ে সমাধান না হলে শ্রম আদালতে দ্রুত প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা, প্রয়োজনে শ্রম আদালতেই মামলা শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা।

ঙ) শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বা কোনো কারণে শ্রমিকের চাকরির অবসান হলে স্বচ্ছ ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক নিয়ম অনুসরণ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিককে যথাযথ উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া।

চ) শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থায় শ্রমিক/শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনে ইউনিয়ন প্রতিনিধি বা তার অনুপস্থিতিতে শ্রমিকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক রাখা।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

ক) প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও দরকষাকষির চর্চার অধিকার নিশ্চিত করা।

খ) সেইফটি কমিটি ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধমূলক কমিটি সহ কারখানা ভিত্তিক কমিটিসমূহে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ যথাযথ ও নিশ্চিত করা।

গ) কল্যাণ কর্মকর্তার পদবি ও দায়িত্ব এমনভাবে বিন্যস্ত করা, যাতে তিনি প্রভাবমুক্তভাবে শ্রমিকদের পক্ষে তাদের কল্যাণমূলক কাজ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ঘ) ব্যক্তি শ্রমিক যদি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ন্যায়বিচার না পায়, তাহলে সরাসরি হটলাইনে টেলিফোন বা ইমেইল প্রেরণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে পরিদর্শন অধিদপ্তরকে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবে, যা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বলে গণ্য করা হবে এমন সুযোগ থাকা।

ঙ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ও কার্যকর ‘শপ স্টুয়ার্ড মডেল’-এর আলোকে ফ্লোর/বিভাগ বা শ্রমিকের নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রমিক কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি তৈরি ও প্রশিক্ষিত করা, যাতে যে কোনো ধরনের বিরোধ

কর্মক্ষেত্রেই সমাধান করা যায়। যে সকল ফ্লোর/বিভাগে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, সেখানে নারী শপ স্টুয়ার্ড নিযুক্ত করা।

চ) প্রতিষ্ঠান, সেক্টর বা আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ত্রিপক্ষীয় 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠন করা।

ছ) জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বৃহৎ সেক্টর যেমন; তৈরি পোষাকশিল্প সহ ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বিভিন্ন পেশা ও খাত অনুযায়ী সংগঠিত হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করা এবং নিয়োগকারী, তাদের অ্যাসোসিয়েশন এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা ও চুক্তি স্বাক্ষর করার আইনগত বিধান তৈরি করা।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সকল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলাদা অফিস বা ডেস্ক স্থাপন করা, যাতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ের বিরোধ উত্থাপন এবং তাদের আইনি প্রাপ্য নিশ্চিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

জাতীয় পর্যায়

ক) ত্রিপক্ষীয় কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিয়মিত আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

খ) শ্রম অসন্তোষ নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শ্রম সংলাপ ফোরাম গঠন করা। এই ফোরাম শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা, নতুন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করবে।

গ) জাতীয় ও শিল্প পর্যায়ে সম্পাদিত দরকষাকষি চুক্তির আইনানুগ স্বীকৃতি ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং তা বাস্তবায়নে দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

ঘ) প্রতি বছর জাতীয় ত্রিপক্ষীয় শ্রম সম্মেলনের আয়োজন করা যেখানে শ্রমিক অধিকার, শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, নীতি প্রণয়নে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে তিন পক্ষের প্রতিনিধি ও শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আলোচনা ও সমন্বিত পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

মধ্যস্থতা (conciliation), সালিস (arbitration) ও সমঝোতার (mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি

ক) মধ্যস্থতা, সালিস ও সমঝোতার বর্তমান প্রক্রিয়াকে অধিকতর শ্রমবান্ধব, কার্যকর ও যুগোপযোগী করে ব্যক্তিবিরোধ, সমষ্টিগত বিরোধ বা শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতে যাওয়ার পূর্বে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আসতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

খ) মধ্যস্থতা, সালিস ও সমঝোতার প্রচলিত প্রক্রিয়ায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যাতে কোনোভাবেই হুমকি, ভয়-ভীতি বা আর্থিক প্রলোভনে প্রভাবিত না হয় আদালতকে সে বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিকের ধর্মঘটের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা

ক) শ্রমিকের দাবির প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করা এবং দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) কারখানার বাইরে আন্দোলন করে দাবি আদায়ের ধারণা ও চর্চার বিপরীতে আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করা।

গ) নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ দাবি/বিরোধ উত্থাপন ও প্রয়োজনে ধর্মঘট করার অধিকার প্রয়োগ করা।

ঘ) ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান প্রক্রিয়া নিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার মধ্যে বিদ্যমান অসংগতি দূর করা প্রয়োজন, যাতে একটি স্বচ্ছ ও আইনসম্মত কাঠামো তৈরি হয়। শ্রম বিধিমালার ২০৪ নম্বর বিধিকে সংশোধন করে BLA-এর ধারা ২১০ (১১)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা উচিত, যাতে CBA গোপন ব্যালট প্রক্রিয়া

সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় এবং ১৫ দিনের মধ্যে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করতে সক্ষম হয়। প্রক্রিয়াগত ধাপগুলি স্পষ্ট করে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার প্রয়োগে যে বাধা সৃষ্টি হয়, তা দূর করা জরুরি।

ঙ) সরকার কর্তৃক ৩০ দিনের পর ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতার সঙ্গে শ্রমিকদের জন্য মজুরি ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত। যদি কোনো ধর্মঘট সরকার বন্ধ করে দেয়, তাহলে শ্রমিকরা তাদের আইনসম্মত অধিকার প্রয়োগের ফলে আর্থিক ক্ষতির শিকার হবে না। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ণ মজুরি প্রদানের বিধান নিশ্চিত করলে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংকট এড়ানো সম্ভব হবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্বিচার হস্তক্ষেপ প্রতিহত করা যাবে, যা শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR)

ক) শ্রম অসন্তোষ কমাতে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি আইনের সংস্কার, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিরোধ উত্থাপনের পূর্বেই বা সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

খ) শিল্প অসন্তোষ নিরসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান হিসেবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ও গতিশীল করা।

গ) শ্রম আদালতের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে ও বিরোধের দ্রুত সমাধানে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে বাংলাদেশের শ্রম আইন নির্দেশিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলিকে বাধ্যতামূলক করা।

ঘ) শ্রমিক ও নিয়োগদাতার সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩.৬.৩ শ্রম ও শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আইন ও নীতিমালার সংস্কার

শ্রম ও শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর কতিপয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শ্রম ও শিল্প বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে শ্রমিকরা দীর্ঘ সময় ধরে হয়রানির শিকার হন। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া থাকলেও তা সময় সাপেক্ষ এবং জটিল। মধ্যস্থতা (conciliation), সালিসি (Arbitration), শ্রম আদালত (Labour Court) এবং আপিলের (Appellate Tribunal) দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে শ্রমিকরা দ্রুত সমাধান পান না। ফলে শ্রমিকরা কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময়ও মানসিক চাপ ও আর্থিক সংকটে ভোগেন, অনেক ক্ষেত্রে চাকরি হারানোর ঝুঁকিও তৈরি হয়।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন ও অন্যান্য বিধান কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয় না বিধায় তাদের অধিকারের সুরক্ষা দুর্বল। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যেখানে এই শ্রমিকদের জন্য আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, কারণ তারা সাধারণত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নন এবং সরকার বা বেসরকারি আইনি সহায়তা সংস্থাগুলির সেবা গ্রহণ করাও তাদের জন্য কঠিন।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য কার্যকর কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা শ্রম আইনে নেই। বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে অসন্তোষ নিরসনে শ্রম দপ্তর বা শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক সংস্থাগুলিকে সম্পৃক্ত করা হলেও বিভিন্ন কারণে দ্রুত সমাধান হয় না।

বাংলাদেশের শ্রম আইনে সালিসি ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকলেও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না। শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত বিরোধের ক্ষেত্রে আদালতের দ্বারস্থ হন, যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। শ্রম আদালতের মামলাগুলি নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং শ্রমিকদের অনুকূলে রায় হলেও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়, যা শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়াকে কঠিন করে তোলে।

আইনি সংস্থাগুলির সমন্বয়ের অভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়। শ্রমিক অসন্তোষ বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট। শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আদালত, শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট সমন্বয় কাঠামো নেই। শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর

অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করলেও তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ আইনি উদ্যোগ নিতে পারে না। এছাড়া আদালত, শ্রম দপ্তর এবং সালিসি বোর্ডগুলির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের দুর্বলতার কারণে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি হয়ে পড়ে, যা শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথকে আরও কঠিন করে তোলে।

শ্রম ও শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আইন ও নীতিমালার সংস্কারের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম আইন সংশোধন করে দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর বিধান সংযোজন করা। আইনের সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও শিল্প বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বাধ্যতামূলক সময়সীমা নির্ধারণ করা। আদালতে মামলা দায়েরের পর দ্রুত রায় প্রদান ও বাস্তবায়নের বিধান সংযোজন করতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকদের হয়রানি বা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের শিকার হওয়া থেকে রক্ষার জন্য নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) শ্রমিকদের জন্য একটি সমন্বিত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redress Mechanism) চালু করা। একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং কার্যকর শ্রমিক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redress Mechanism - GRM) গঠন করা জরুরি, যেখানে শ্রমিকরা সহজে তাদের সমস্যা উত্থাপন এবং দ্রুত সমাধান পাবেন। এই ব্যবস্থার অধীনে অনলাইন পোর্টাল, টোল-ফ্রি হটলাইন এবং সরাসরি অভিযোগ কেন্দ্র কার্যকর করা যেতে পারে, যেখানে শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ গোপনীয়তার সাথে জানাতে পারবেন। Grievance Redress Mechanism-এর প্রতিটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা তাদের আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।

গ) মধ্যস্থতা, সালিস ও সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলা। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতের ওপর চাপ কমাতে শ্রম আইন সংশোধন করে মধ্যস্থতা (conciliation), সমঝোতা (mediation) এবং সালিসের (arbitration) মতো বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution - ADR) পদ্ধতিগুলি ক্ষেত্র অনুযায়ী বাধ্যতামূলক করা দরকার। মালিক ও শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের পদ্ধতির প্রতি আস্থাশীলতা বাড়াতে হবে।

ঘ) বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশাসনিক ও আইনি সংস্থাগুলির সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ - শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, শ্রম সম্পর্ক কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম আদালতের কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট সমন্বয় সাধনের আইনি কাঠামো সৃষ্টি করা।

ঙ.) শ্রম ও শিল্প অসন্তোষের তাৎক্ষণিক সমাধান ব্যবস্থা জোরদার করা শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ, যেমন; নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় আলোচনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, শ্রমিকদের অভিযোগ দায়েরের কার্যকরী মাধ্যম এবং তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা আইনে সংযুক্ত করা।

৩.৬.৪ অসন্তোষ প্রতিরোধের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি ব্যবস্থা

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেওয়ার কারণ বহুমুখী। কর্তৃপক্ষ পূর্ব থেকে সম্ভাব্য কারণগুলি চিহ্নিত করে প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। ফলে শ্রমিকদের ক্ষোভ ধীরে ধীরে বিক্ষোভে রূপ নেয় এবং বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়। প্রতিটি কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমিটি এবং মালিক প্রতিনিধি বা শ্রম সম্পর্ক কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি আলোচনার মাধ্যম থাকা দরকার। শ্রমিকদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি জানা ও শোনা এবং সেগুলি নিরসনের প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

মালিক-শ্রমিক-শ্রম প্রশাসন নিয়মিত সংলাপ ও আলোচনা শ্রম আইনে বাধ্যতামূলক নয়। শ্রম ও কারখানা পরিদর্শকগণ কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনকালে শ্রমিকদের সাথে খুব কমক্ষেত্রেই আলোচনা বা তাদের সাথে মত বিনিময় করেন। ফলে পরিদর্শকগণ অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন না এবং সমাধানের জন্য দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মালিক-শ্রমিক সংলাপ সীমিত হওয়ার কারণে অসন্তোষ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিল্প-কারখানাগুলিতে বেতন-বোনাস, কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার জন্য মাধ্যম বা প্ল্যাটফর্মের অভাব দূর করা প্রয়োজন।

বর্তমানে শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধ বা কমানোর জন্য শুধু বিদ্যমান আইন কার্যকর করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

উন্নয়নের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। শ্রম আইন সংস্কার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ব্যবস্থার উন্নয়ন, শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর শ্রমিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনার অভাবে শ্রম ও শিল্প বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অসন্তোষ প্রতিরোধের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি ব্যবস্থার জন্য আইন ও নীতিমালার সংস্কারের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমিক অসন্তোষের সম্ভাব্য কারণ চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ: শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেওয়ার আগেই তার সম্ভাব্য কারণগুলি চিহ্নিত করা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগ নেওয়া। প্রতিটি কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ন বা অংশগ্রহণ/কর্মস্থলের সহযোগিতা কমিটির ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Industrial Relations Management Unit) গঠন করা, যা কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত শ্রমিকদের অভিযোগ শুনবে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবে।

খ) মালিক-শ্রমিক সংলাপ ও আলোচনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: ত্রিপক্ষীয় সংলাপ (Tripartite Dialogue) এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনা (Bipartite Negotiation) বাধ্যতামূলক করা, যেখানে মালিকপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি ও সরকার নির্ধারিত সময় অন্তর আলোচনায় বসবে। শিল্পকারখানাগুলিতে বেতন-বোনাস, কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

গ) কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ: অনেক শিল্প কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব শ্রম অসন্তোষের প্রধান কারণ। শ্রম আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে (Labour Inspection System) আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কার্যকরী কৌশল নির্ধারণ করা।

ঘ) শক্তিশালী ও ব্যাপক ভিত্তিক বিরোধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ: শ্রম অসন্তোষ কমানোর জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৩.৬.৫ শ্রম আদালত ও শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল

শ্রম আদালত ও আপিল ট্রাইব্যুনাল শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রম বিরোধ সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে কার্যক্রমে বিলম্ব, প্রক্রিয়াগত জটিলতা এবং মামলার নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব শ্রমিকের জন্য বহুমুখী সমস্যা তৈরি করছে।

শ্রম আদালত একটি বিশেষ আইনি কাঠামো, যা কর্মীদের জন্য তাদের বিরোধ সমাধান, অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। প্রধানত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯ দ্বারা পরিচালিত এই ব্যবস্থা শ্রম আদালতকে চাকরি বা কর্মসংক্রান্ত বিরোধ এবং অভিযোগ সমাধানের প্রধান স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে বাংলাদেশের শ্রম বিচার ব্যবস্থা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যা বিরোধের সময় মতো এবং ন্যায্য সমাধান দিতে বাধা সৃষ্টি করছে। আইনি ব্যবস্থা থাকলেও শ্রম আদালত এবং ট্রাইব্যুনালগুলিতে বড় ধরনের বিলম্ব দেখা যায়, যার কারণে মামলার পক্ষগুলির জন্য অনিশ্চয়তা এবং চাপ সৃষ্টি হয়।

দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের জন্য সারাদেশে স্থাপিত শ্রম আদালতের সংখ্যা মাত্র ১৩টি। ঢাকা জেলায় ৩টি, চট্টগ্রাম জেলায় ২টি, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং কুমিল্লা জেলায় ১টি করে এবং খুলনা, সিলেট, রংপুর ও বরিশাল বিভাগে ১টি করে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রমঘন ও শিল্প বহুল এলাকা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন; সিলেটে শ্রম আদালত স্থাপিত হলেও সেখানে মামলার সংখ্যা কম। অপরদিকে শ্রমঘন ও প্রয়োজন থাকা সত্বেও মৌলভীবাজার বা শ্রীমঙ্গলে কোনো শ্রম আদালত নাই। ফলে শ্রমজীবী মানুষকে আদালতের সুযোগ নিতে অনেক দূর হতে এবং অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করে আদালতে আসতে হয়। অনেক শ্রমিক এ কারণে মামলা করতে ইচ্ছুক হন না। আদালতের সংখ্যা স্বল্পতার পাশাপাশি বিচারকের স্বল্পতাও শ্রমজীবী মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি করে। শ্রম আদালতের একজন বিচারক বছরে গড়ে ২৫০টি হতে ৩০০টি মামলা নিষ্পত্তি করতে

পারেন। ঢাকার শ্রম আদালতগুলিতে মামলার সংখ্যা উল্লিখিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। অধিক সংখ্যক মামলা একজন বিচারকের পক্ষে পরিচালনা ও আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায় দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

২০২৪ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দেশের ১৩টি শ্রম আদালতে অপেক্ষমান মামলার সংখ্য ২১,৬১৭টি। ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৩টি শ্রম আদালত এবং ১টি আপিল ট্রাইব্যুনালে মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২০,২৮৩ টি। ঢাকা জেলার ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রম আদালতে ৮,৫১৫ টি, গাজীপুর শ্রম আদালতে ৬,০৭৭ টি, নারায়ণগঞ্জ শ্রম আদালতে ২,১১৮টি, চট্টগ্রাম ১ম ও ২য় আদালতে ১,৯৩৪টি, খুলনা শ্রম আদালতে ১৪৮টি, কুমিল্লা শ্রম আদালতে ১৪০টি, রাজশাহী শ্রম আদালতে ৮৬টি, রংপুর শ্রম আদালতে ৮৪টি, বরিশাল শ্রম আদালতে ৮১টি, সিলেট শ্রম আদালতে ৫৬টি এবং শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে ১,০৪৪টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা যেমন রয়েছে তেমনি দীর্ঘসূত্রিতার কারণও আছে। শ্রম আইনের ভাষ্য অনুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে হবে। কোনো কারণে বিলম্ব হলে পরবর্তী ৯০ দিন অর্থাৎ মোট ১৫০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হতে হবে। কিন্তু এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও কোনো পক্ষই কোনো শাস্তি বা জরিমানার আওতায় পড়েন না, যা পরিণামে বিচার প্রক্রিয়াকে আরো দীর্ঘায়িত করে।

এ লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম আদালতের সংখ্যা মামলার পরিমাণ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাড়ানো প্রয়োজন, প্রয়োজন অনুযায়ী সার্কিট কোর্ট স্থাপন করে উপযুক্ত এলাকায় শ্রম আদালতের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা যেতে পারে, যাতে ন্যায়বিচার দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিশ্চিত হয়।

খ) যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২১৬ এবং ২১৮ ধারা সংশোধন করা, যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার কঠোর অনুসরণ নিশ্চিত করা যায়।

গ) প্রক্রিয়াগত সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ

- সময় নেয়ার আবেদনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিলম্বের জন্য জরিমানা আরোপ করার ব্যবস্থা করা।
- আদালতের সদস্যদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা এবং রায় দেওয়ার সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করা।

ঘ) অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে কার্যকারিতা বাড়ানো

- শ্রম বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য নোটিশ প্রদান, মামলার সর্বশেষ অবস্থার তথ্য হালনাগাদ রাখা এবং রায় বিতরণে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।
- মামলা পরিচালনা এবং আদালতের মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র বা দলিলাদি সহজে পাওয়ার জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

ঙ) শ্রমিকদের জন্য মামলা প্রক্রিয়া সরলীকরণ

- প্রক্রিয়াগত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে সাক্ষীদের আনুষ্ঠানিক জবানবন্দি বা জেরা শুধুমাত্র তখনই করা উচিৎ যখন তা মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন। যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে, পক্ষগুলি পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট বা দলিলাদি জমা দিয়েছে এবং এসব কাগজপত্র গ্রহণযোগ্য, তবে মামলাগুলি মৌখিক যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিৎ। যদি কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকে, যা আরও স্পষ্টতা দাবি করে, তবে আদালত আনুষ্ঠানিক প্রমাণ গ্রহণ বা সাক্ষীকে জেরা বা জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- তাছাড়া লিখিত বিবৃতি, আপত্তি বা জবাব দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধির একটি সীমা নির্ধারণ করা উচিৎ যাতে সময় মতো মামলার নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা যায়। অপ্রয়োজনীয় বিলম্বের জন্য জরিমানা আরোপ করা উচিৎ।
- শ্রম আদালতে মামলা সংক্রান্ত পুরো প্রক্রিয়ায় নথি গ্রহণ ও প্রাপ্তিসহ মামলার আদেশ এবং রায়সমূহ সহজ বাংলা ভাষায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা যেন শ্রমিকদের কাছে রায় বোধগম্য হয়।

চ) অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা

- অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার অপব্যবহার রোধে বিচারক মহোদয়দের নিয়মিত পর্যালোচনা ও নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনে এমন বিধান থাকা প্রয়োজন যে, কোনো পক্ষ যদি আদালতের নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশের সুবিধা নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি দীর্ঘায়িত করতে চায়, তাহলে নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ বাতিল করা যাবে।

ছ) শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা

- শ্রম আপিল ট্রাইবুনালে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাতে অধিক সংখ্যক মামলা শুনানি ও নিষ্পত্তির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনে শ্রম আপিলেট ট্রাইবুনাল সার্কিট কোর্ট হিসেবে বিভিন্ন স্থানে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল শ্রম বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জেলা জজদের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়, শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান মহোদয়ের রায় তাদের সম-পদমর্যাদার সহকর্মীদের দ্বারা শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে রিভিউ বা পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া শ্রম আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করা।
- শ্রম আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করার সুযোগ প্রদান করা।

জ) শ্রম আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের জন্য যথেষ্ট অর্থায়ন

- আদালতগুলিকে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য যথেষ্ট আর্থিক সম্পদ এবং জনবল প্রদান করা। এছাড়া এই আদালতের বিচারকদের জেলা জজদের সমপর্যায়ের সুবিধা প্রদান করা।

ঝ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR):

- আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার আগে বাধ্যতামূলক আপোষ আলোচনার সময়সীমা নির্ধারণ করা হলে বিরোধ সমাধান দ্রুততর হতে পারে। পারিবারিক আদালতের ন্যায় প্রাক-মামলা শুনানি এবং ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ সম্বলিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) পদ্ধতিগুলি শ্রম বিরোধগুলির জন্য প্রয়োগ করা।
- শ্রম আদালতে যাওয়ার পূর্বে বা আদালতের বাইরেই শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনগতভাবে যথাযথ বিধান থাকা জরুরি।
- শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redressal Mechanism - GRM) আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

৩.৬.৬ শ্রমিকদের অপরাধী হিসেবে দেখার প্রবণতা রোধে আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

শিল্প অন্তোষের ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে যেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অজ্ঞাতনামা হিসেবে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা না হয় তা নিশ্চিত করা। তবে কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এবং যদি নির্দিষ্টভাবে কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ ভিত্তিক অভিযোগ থাকে তাহলে তারা আইনি ব্যবস্থা এড়াতে পারেন না।

এফআইআরে (FIR) কয়েকজন শ্রমিকের নাম উল্লেখ থাকলেও অসংখ্য অজ্ঞাতনামা শ্রমিকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়, যার ফলে কারখানায় ভয়, নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। এই অবস্থায় নির্বিচারে শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করার ঘটনা খুবই সাধারণ। অনেক শ্রমিক, যাদের ওই ঘটনায় কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না বা যারা ঘটনাস্থলেই থাকে না, তাদেরও গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় এবং বছরের পর বছর ধরে আইনি হয়রানির শিকার করা হয়। এসব মামলার কারণে শ্রমিকদের বারবার আদালতে হাজিরা দিতে হয়, অনেক সময় দীর্ঘদিন কারাবন্দিও থাকতে হয়। এই ধরনের মামলার আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপ শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রমিকরা কাজ ও আয়ের উৎস হারিয়ে ফেলেন। ফলে তাদের পরিবারসহ তারা চরম সংকটে পড়েন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেন পেশাদার, শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক উপায়ে শ্রম বিরোধ ও অসন্তোষ মোকাবিলা করে—সেজন্য তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। শ্রমিক অসন্তোষ এড়ানোর টেকসই উপায় হলো, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার,সংগঠিত হওয়ার ও যৌথভাবে দরকষাকষি করার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা এবং সমস্যার মূল কারণের সমাধান করা।

শ্রমিক অসন্তোষে শ্রমিকদের অপরাধীকরণের প্রবণতা রোধে আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ তৈরি করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার প্রবণতা দূর করা। শ্রমিকদেরকে শাস্তি দেয়ার চাইতে শিল্পাঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যা মোকাবেলা করা। এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে শ্রমিকরা প্রতিকার পায় ও বেআইনি কাজ করতে বাধ্য না হন।

খ) অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দ্রুত ও তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার সঠিক মূল্যায়নের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা। এই কমিটিতে মালিক, শ্রমিক, শ্রম বিভাগ (DoL), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি থাকা উচিৎ। কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করবে।

গ। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যেসব ফৌজদারি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, সেগুলি 'খ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসাথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেন পেশাদার, শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক পদ্ধতিতে শ্রম বিরোধ ও অসন্তোষ মোকাবেলা করে—তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৬.৭ শ্রমিকদের মজুরি সময় মতো পরিশোধ নিশ্চিত করা

বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সময় মতো মজুরি না পাওয়া। দেশের অধিকাংশ শ্রমিক এমনিতেই নিম্ন মজুরিতে কাজ করেন, যা তাদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত নয়। মাস শেষে প্রাপ্ত মজুরির ওপর তাদের সংসার চালানোর দায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে মজুরি প্রদানে বিলম্ব হলে তারা চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা থাকে না। তারা বাধ্য হয়ে বিক্ষোভে নামেন এবং নিজেদের দাবি জানান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব প্রতিবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা সংগঠনের সরাসরি নেতৃত্ব ছাড়াই। শ্রমিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, মালিকপক্ষ কিংবা সরকার—কেউই তাদের দুর্দশার যথাযথ মূল্যায়ন করে না। ফলে তারা জনদৃষ্টি আকর্ষণের একমাত্র উপায় হিসেবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ ও অবরোধের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

শ্রমিকদের মজুরি সময় মতো পরিশোধ নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমিকদের মজুরি সময় মতো পরিশোধ নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং মজুরি সময় মতো দেওয়া হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, বিলম্বে মজুরি পরিশোধের জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করা।

খ) একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধগুলির সমাধানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে মামলাগুলিকে শুনানির তারিখ নির্ধারণ এবং রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া।

গ) মজুরি না পাওয়ার কারণে শ্রমিকরা যদি প্রতিবাদে নামেন, তবে তার দায় মালিকদেরই নিতে হবে। মজুরি না দেওয়ার জন্য মালিকদের শাস্তির আওতায় আনা।

ঘ) মজুরি ও আইন অনুযায়ী পাওনা সময় মতো না পেয়ে শ্রমিকরা যদি কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদ করে, তখন সেটাকে অবৈধ ধর্মঘট না বলা কিংবা সে কারণে শ্রমিকের মজুরি কর্তন না করা।

৩.৬.৮ শ্রমিকের আন্দোলনের সাথে সংহতিসূচক কার্যক্রমকে আইনি সুরক্ষা

শ্রমিক আন্দোলনের চিরায়ত মূল্যবোধ হচ্ছে সংহতি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, শ্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিপরীতে ইউনিয়ন ও ফেডারেশন এবং শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে কর্মরত সংগঠন, এনজিও, পেশাজীবী সংগঠনের সংহতিসূচক কর্মসূচি এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আইনে সুরক্ষা দিয়ে বিধান সন্নিবেশ করা, সামাজিক সংলাপ ফোরামে মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে কর্মরত সংগঠন, এনজিও, পেশাজীবী সংগঠনে, উন্নয়ন সহযোগীদের সামাজিক সংলাপ অংশে যুক্ত করা।

৩.৬.৯ ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব

- অংশগ্রহণ কমিটির নাম পরিবর্তন করে ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি রাখার প্রস্তাব করা হলো।

- প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকুক বা না থাকুক, ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা।
- প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি সংস্থা (সিবিএ) এবং/অথবা অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে, ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটির শ্রমিক সদস্যগণ সিবিএ ও ইউনিয়ন দ্বারা মনোনীত হবেন।
- ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে, ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি আইনে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে। তবে সিবিএ এবং প্রতিষ্ঠানে থাকা অন্যান্য ইউনিয়নের অধিভুক্ত দায়িত্ব ও কার্যক্রম কমিটি গ্রহণ করবে না।
- ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিরাই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন।
- ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটির শ্রমিক সদস্যদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করা।

৩.৬.১০ শ্রমিক, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা

শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ও শিল্পখাতের নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্রের ভুমিকা রাখা জরুরি। এই লক্ষ্যে শ্রমিক ও শিল্পখাতের নিরাপত্তা রক্ষায় আইন শৃংঙ্খলাবাহিনী, শিল্প পুলিশ কখন, কীভাবে এবং কোন পরিসরে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বিষয়ে সম্পৃক্ত হতে পারে—এ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে এমন কোনো নীতিগত কাঠামো নেই। এই প্রেক্ষাপটে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে যাতে আইন শৃংঙ্খলা বাহিনী, শিল্প পুলিশের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

ক) শ্রম ও শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইন শৃংঙ্খলা বাহিনী, থানা, শিল্প পুলিশের ভূমিকা সুস্পষ্ট করা ও সুস্পষ্ট বিধানাবলি প্রণয়ন করা। শিল্প পুলিশ কোনও পরিস্থিতিতে শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তবে শিল্প সম্পর্ক ও শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সম্ভাবনা থাকলে পুলিশের দায়িত্ব হবে DoL ও DIFE-এর কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।

খ) যদি কোনো কর্মকাণ্ডে শ্রম পরিস্থিতি ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে বিষয়টি শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের পাশাপাশি আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার বিধান প্রণয়ন করা।

গ) শ্রম ইস্যু এবং অসন্তোষের পাশাপাশি শিল্প অঞ্চলে শ্রমিকের হয়রানি নিরসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে স্থানীয় থানা ও আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি করা।

ঘ) আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সকল সদস্যকে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব প্রদানের পূর্বে জাতীয় শ্রম আইন, আন্তর্জাতিক শ্রম মান, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার এবং শ্রম সম্পর্ক বিষয়ক দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল (conflict-sensitive) দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আইআরআই-এর মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩.৭ সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং অন্তর্ভুক্তি

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বলতে বোঝায়—ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক পরিচয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে কোনো শ্রমিকের প্রতি অন্যায্য বা অসম আচরণ এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা সকল নাগরিকের জন্য সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের অঙ্গীকার করে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭-এ আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে, আর ২৮-এ ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি নারী, শিশু বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ বিধানের সুযোগ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ ও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৩(ক)-তে উল্লেখ আছে যে, রাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে তারা নাগরিক সুবিধায় সমান অংশীদার হতে পারে।

জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২-তে কর্মক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠাকে একটি প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আদিবাসী, বিভিন্ন জাতিসত্তা, দলিত, প্রতিবন্ধী, ভাসমান ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ ও কাজের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)-এ সমতা, বৈষম্যহীনতা ও শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে। ধারা ৩৪৫ অনুযায়ী, একই প্রকৃতির কাজের জন্য মজুরি নির্ধারণ বা নিম্নতম মজুরি স্থিরীকরণের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের সমান মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক এবং বৈষম্য করা যাবে না। এছাড়া ধারা ৪৬-৫০-এ নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা নিশ্চিত করতে সরকারকে সমতা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মস্থলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধীর অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষায় আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

ILO কনভেনশন ১০০ (১৯৫১) ও ১১১ (১৯৫৮) সমান পারিশ্রমিক ও কর্মসংস্থানে বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্ব দিয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় (১৯৪৮) সমান কাজের জন্য সমান মজুরির অধিকার স্বীকৃত। ICESCR অনুচ্ছেদ ২৩.২ অনুযায়ী, নারী-পুরুষের জন্য সমমূল্যের কাজে সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে হবে। CEDAW ধারা ১১.১(ঘ)-তে কর্মক্ষেত্রে সমান আচরণ, সুযোগ ও চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। SDG ৫-এ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং SDG ১০-এ সব ধরনের বৈষম্য হ্রাস ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সমতা প্রতিষ্ঠা এবং সকল কাজে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে কমিশন নিম্নলিখিত প্রস্তাব করছে:

৩.৭.১ কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য গভীরভাবে প্রোথিত, বিশেষ করে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তা এবং চলাচলের সীমাবদ্ধতা নারীর কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত করে।[16] অধিকাংশ নারী গৃহভিত্তিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কৃষিখাতে স্বল্প উপার্জনের অনিরাপদ কাজে নিয়োজিত।[17] আদিবাসী জনগোষ্ঠী, দলিত, পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এসব বাধা আরো প্রকট। এছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক যার বড় অংশ নারী শ্রম আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত, ফলে তারা মাতৃত্বকালীন ছুটি, নিরাপদ কর্মপরিবেশসহ মৌলিক অধিকার থেকে বাদ পড়েন। যৌন কর্মীরাও স্বীকৃতির অভাবে চরম বৈষম্যের শিকার হন।

[16] Kabeer, Huq & Rahaman (2021); Mahmud, S., Bidisha, S.H. (2018). Female Labor Market Participation in Bangladesh: Structural Changes and Determinants of Labor Supply; Kotikula, A., Hill, R., & Raza, W. A. (2019). What Works for Working Women? Unpacking the Constraints on Female Labour Force Participation in Bangladesh.

[17] বিবিএস, বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৩, ২০২২.

অভিবাসী গৃহকর্মীরা শুধু আর্থিক নয়, বরং পরিবার ও সমাজে ফিরে আসার ক্ষেত্রেও নানা বাধার মুখে পড়েন। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য কেবল কর্মীদেরই নয়, তাদের পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকেও প্রভাবিত করে। এটি নারীদের ন্যায্য মজুরি ও পেশাগত অগ্রগতির সুযোগ সীমিত করে, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও পরনির্ভরশীলতা স্থায়ী করে।

কর্মক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) আইএলও কনভেনশন নং ১৯০ অনুমোদন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে ফৌজদারি আইন সংস্কার করা। ২০০৯ সালের হাইকোর্টের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নির্দেশিকার কার্যকরী বাস্তবায়ন জোরদার করা।

খ) প্রতিটি সরকারি বেসরকারি কর্মস্থলে বৈষম্যবিরোধী নীতি বাধ্যতামূলক করা।

গ) শ্রম পরিদর্শকদের নারী-পুরুষ বৈষম্য সুনির্দিষ্ট দক্ষতা নিশ্চিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সেই সঙ্গে আরও নারী পরিদর্শক নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা যোগ করা।

ঘ) বৈষম্যমূলক আচরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে, তা পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা প্রচারণার জন্য জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। জাতীয় প্রচারণাগুলিতে বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতা, ন্যায্য মজুরি এবং লিঙ্গভিত্তিক কাজের ধরন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলিকে মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

ঙ) যৌনকর্মী বা যৌনজীবীর সংজ্ঞায়ন এবং তাদের আইনি সুবিধা নিশ্চিত করা।

৩.৭.২ সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা সমাজ, শিল্প ও অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন ছুটি সর্বজনীন নয়। সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ৬ মাস ছুটি পেলেও শ্রম আইনে তা ১১২ দিন, যা অধিকাংশ খাতে বাস্তবায়িত হয় না। আবার ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগকৃত অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিকসহ সকল ধরনের আউটসোর্সিং শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে মাতৃত্বকালীন ছুটি নেই বললেই চলে, বরং বিভিন্ন অযুহাতে গর্ভবতী নারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের গর্ভবতী নারী শ্রমিকদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা[18] থাকলেও প্রচারণার অভাবে তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত সকল নারী শ্রমিকের জন্য ছুটির ব্যবধান দূর করে ন্যূনতম ৬ মাসের মজুরিসহ সার্বজনীন মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর সক্ষমতা বিবেচনায় শ্রম আইনের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ৪ মাসের সবেতন ছুটির সাথে প্রয়োজনে বাকি দুইমাসের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তহবিল অথবা সরকারের অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার অধীনে সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এবং স্বনিয়োজিত সকল শ্রমজীবী নারীর মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগে বিশেষ স্কিম বা ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থা চালুর নীতিগত পরিকল্পনা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও কল্যাণমূলক সহায়তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে এসব সুবিধা নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।

খ) গর্ভকালীন সময়ে নারী শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতি প্রতিরোধে স্পষ্ট আইনি বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন, যা মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করবে। এ বিষয়ে আইএলওর কনভেনশন নং ১১১ (C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958) এবং কনভেনশন নং ১৮৩ (C183 - Maternity Protection Convention, 2000) বিবেচনায় নেয়া।

[18] বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬, এস আর ও নং ৩৪৭-আইন ২০১০, ১৪ অক্টোবর ২০১০, ৪ (৬)

৩.৭.৩ বেতন-ভাতার বৈষম্যের অবসান

সংবিধানে সম কাজে সমান মজুরির নিশ্চয়তা থাকলেও বাংলাদেশে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান। জাতীয় জরিপ অনুযায়ী, নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ২৫% কম আয় করেন। গড় মাসিক আয় পুরুষদের ১৪,৪৮৯ টাকা, নারীদের ১০,৮৩১ টাকা, যা কৃষি, শিল্প ও সেবা—সব খাতেই আয় বৈষম্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।[19]

কৃষিসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য আরও প্রকট, যেখানে জাতীয়ভাবে নারী-পুরুষের মজুরির ব্যবধান প্রায় ৫০%। বাংলাদেশে বেতন বৈষম্যের একটি বড় কারণ সরকারি বেতন কাঠামোর গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, যেখানে ১ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত বেতন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান অনেক বেশি এবং গ্রেড ব্যবধানের অনুপাতও অসম। অন্যদিকে একই কাজ করলেও অস্থায়ী বা আউটসোর্সিং কর্মীরা স্থায়ী কর্মচারীদের মতো বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা পান না এবং দীর্ঘসময় অস্থায়ী পদে কাজ করতে হয়। এ ধরনের বৈষম্য নিরসনে শ্রম আইনে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই।

সকল কর্মক্ষেত্রে বেতন-ভাতার বৈষম্য অবসানে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য সমমানের কাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। পিসরেট ও ঠিকা কাজের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের শারীরিক সক্ষমতার স্বাভাবিক পার্থক্যকে ও নারীর আইনানুগ সুবিধা যেমন ওজন বহনের ক্ষেত্রে ছাড়, পিস রেটের টার্গেট, গর্ভকালীন সময়ে হাল্কা কাজের অধিকারকে বিবেচনায় রেখে সমমজুরি নির্ধারণ করা।

খ) মজুরি বৈষম্য রোধে বিদ্যমান শ্রম আইন পর্যালোচনা করে কার্যকর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

গ) মজুরি বৈষম্য দূর করতে প্রস্তাবিত জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বোর্ডে নারী সদস্য নিয়োগ এবং বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩.৭.৪ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদ লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করলেও, বাস্তবে কর্মক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কাঠামোগত বাধার মুখে পড়ে যা নারীর অর্থনৈতিক সুযোগ এবং অংশগ্রহণকে সীমিত করে। নারীদের জন্য সম্মানজনক কাজ নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সহিংসতা ও নিরাপত্তার অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে সীমিত করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে মজুরি প্রাপ্ত কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও নারীদের বেতনহীন ও 'অদৃশ্য' কাজ[20] কখনই 'কাজ' হিসেবে স্বীকৃতি পায় না, বরং প্রায়শই অবমূল্যায়িত হয়।[21]

নারীদের অর্থনৈতিক কাজে বৈষম্যের ফলে বাংলাদেশ "অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ" সূচকে ১৪৬তম অবস্থানে রয়েছে, যা নেপাল (১৩৬তম) ও শ্রীলঙ্কার (১২৪তম) তুলনায় পিছিয়ে।[22] এটি এটি CEDAW ও SDG ১, ৫, ৮ এবং ৫.৪-এর অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে, যেখানে বেতনহীন যত্ন ও গার্হস্থ্য কাজের স্বীকৃতি নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রভাব শুধু কর্মীদের নয়, তাদের পরিবার ও সমাজকেও প্রভাবিত করে। এ বৈষম্য নারীদের ন্যায্য কর্মসংস্থান, মজুরি ও পেশাগত অগ্রগতিকে সীমিত করে এবং অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা স্থায়ী করে।

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থলে জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা।

খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) পরিদর্শকদের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পরিদর্শন ব্যবস্থায় নারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য যথাযথ নীতি গ্রহণ করা।

---

[19] বিবিএস, বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৩

[20] BBS, UN Women (2023) Report on Time Use Survey 2021.

[21] বায়েস, আব্দুল (২০২৪) অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অনুপস্থিত নারীর অবদান, বনিক বার্তা; আনাম, শাহীন (২০১৯) নারীদের বেতনহীন কাজের স্বীকৃতি চাই, প্রথম আলো।

[22] World Economic Forum (2023) Global Gender Gap Report.

গ) নারীদের বেতনহীন সেবা কাজকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 'কাজ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই কাজের জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপে বেতনহীন সেবা কাজের সূচক সংযোজনের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। সেবামূলক খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের ওপর এই কাজের বোঝা হ্রাস ও পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উন্নত অবকাঠামো, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পুরুষদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন কমানো সম্ভব হতে পারে। পাশাপাশি যত্নকারীদের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা।

ঘ) নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন বৈষম্যমূলক আচরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিশেষ করে, এই প্রচারণাগুলির মাধ্যমে নারীর কর্মক্ষমতা, ন্যায্য মজুরি এবং প্রচলিত জেন্ডার স্টেরিওটাইপ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা মোকাবেলা করা।

ঙ) কর্মস্থলে শ্রমিকদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিত করতে 'তুই' বা 'তুমি' সম্বোধন পরিহার করা, অশালীন ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং পেশাদার আচরণ নিশ্চিত করতে 'আপনি' সম্বোধন বাধ্যতামূলক করার নীতি গ্রহণ করা। পাশাপাশি শ্রেণি, লিঙ্গ বা অন্যান্য বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত সম্বোধন, হয়রানিমূলক মন্তব্য বা অসদাচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নারীর শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম আইনে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে 'নারী' শব্দ ব্যবহারের জন্য সংশোধনের সুপারিশ করা।

চ) শ্রমজীবী আন্দোলন ও অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা ইতিহাস, পাঠ্যপুস্তক এবং মিডিয়ায় যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য নীতি গ্রহণ করা, যাতে নতুন প্রজন্ম শ্রমের মূল্য বুঝতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে এবং শ্রমিকদের প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

ছ) শ্রম আইন ও শ্রম সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধিমালা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যমূলক ধারা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। এই লক্ষ্যে আইএলও কনভেনশন নং ১০০ (C100- Equal Remuneration Convention), নং ১১১ (C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958) এবং নং ১৯০ (C190 - Violence and Harassment Convention, 2019) বিবেচনায় নেয়া। উদাহরণস্বরূপ, শ্রম আইনের ৩৩২ ধারায় নারীদের প্রতি অশালীন আচরণ সম্পর্কিত বিধান থাকলেও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি প্রতিরোধের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত নেই। এটি সংশোধনের ক্ষেত্রে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। শ্রম আইনের ৩৪৫ ধারায় শুধুমাত্র বেতন বৈষম্যের উল্লেখ থাকলেও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩.৭.৫ কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি দূরীকরণ

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি নারীর অধিকার, সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষ তত্ত্বাবধানে কাজ করেন, যা ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে ও হয়রানির ঝুঁকি বাড়ায়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৩৩২ ধারায় কর্মস্থলে নারীদের প্রতি অশোভন আচরণ নিষিদ্ধ করেছে; ৩০৭ ধারায় সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড বা ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার সাধারণ শাস্তির বিধান রেখেছে। তবে এই বিধানের কার্যকর প্রয়োগ দুর্বল এবং শ্রম আদালতে খুব কমসংখ্যক মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। ৩৩২ ধারায় "শালীনতা" শব্দটির ব্যবহার পিতৃতান্ত্রিক ধারণাকে উৎসাহিত করে, যা যৌন হয়রানির অভিযোগের ক্ষেত্রে নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে।[23] ২০২২ সালের শ্রম বিধিমালার সংশোধনী ৩৬১এ বিধান কর্মস্থলে অভিযোগ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করলেও হাইকোর্টের নির্দেশনা পুরপুরি মানা হয়নি। শ্রম বিধিমালায় যৌন হয়রানির সংজ্ঞা দেয়া থাকলেও শ্রম আইনে তা সুস্পষ্ট নয়। বাংলাদেশ এখনও কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর আইন প্রণয়ন করেনি।[24] ন্যায়বিচারের প্রবেশগম্যতার অভাব এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য অপর্যাপ্ত সহায়তা ব্যবস্থা এই

[23] Yasmin, Taslima (2021) Laws against Sexual Harassment: Analyzing the legal framework of Bangladesh.
[24] Yasmin (2021)

চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা উচ্চ আইনি খরচ, দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বৈষম্যেমূলক আচরণসহ বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন।[25]

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি কর্মপরিবেশকে অনিরাপদ করে, যা নারীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে মানসিক চাপ, প্রতিশোধের ভয়, ও চাকরির অনিশ্চয়তা বাড়ে, ফলে কর্মস্পৃহা হ্রাস পায়, যা নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহনকে সীমিত করে।

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি দূরীকরণে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) শ্রম আইনে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের রায়ের নির্দেশনা অনুসারে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পৃথক সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা। ২০২২ সালের সংশোধিত বিধিমালায় উল্লেখকৃত অভিযোগ কমিটি হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠন এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে ফৌজদারি আইন সংস্কার করা।

খ) নারীর প্রতি আচরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আইনে কমিটিতে সদস্য নির্বাচনের ৩৩২ ধারা পুনর্বিবেচনা করা। কমিটিতে কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের পাশাপাশি নারী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আরও দুইজনকে যুক্ত করা যেতে পারে।

গ) কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনে আইএলও কনভেনশন নং ১৯০ (C190 - Violence and Harassment Convention, 2019) অনুসমর্থন করা।

ঘ) যেসব সেক্টর বা পেশাসমূহে সহিংসতা ও হয়রানি ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে সে সকল ক্ষেত্রসমূহে (যেমন রাত্রিকালীন কাজ, নার্সিং এবং কল সেন্টার) যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ) কর্মক্ষেত্র, যাতায়াতের পথ এবং জনাকীর্ণ স্থানে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের জন্য অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। অভিযোগ প্রক্রিয়াটি সম্মানজনক, সহজপ্রাপ্য এবং এর মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গণপরিবহণ ও পাবলিক জায়গায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কঠোর নীতিমালা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাতীয় এবং শ্রমিকঘন এলাকা পর্যায়ে প্রচারণা করা।

চ) ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলির মধ্যে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নারী নেতৃত্বসহ কার্যকর হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠন এবং জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা।

ছ) স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পাবলিক প্লেস ও শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের (যেমন; সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং কমিউনিটির সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলা) প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করে বাস্তবায়ন করা।

জ) নারীবান্ধব বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

ঝ) পুরুষ ও ছেলেদের শিক্ষামূলক ও সামাজিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে ক্ষতিকর জেন্ডারভিত্তিক স্টেরিওটাইপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা কমাতে উদ্যোগ নেয়া।

ঞ) বিদেশে কর্মরত সকল নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী সকল প্রাপ্য পরিশোধে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের উদ্যোগ গ্রহণ, যেমন; যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং গন্তব্য দেশগুলির দূতাবাসে জরুরি হটলাইন, আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং এবং আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে। যে সব দেশ আন্তর্জাতিক শ্রমমান কঠোরভাবে পরিপালন করে, সেই দেশগুলিতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দেয়া। অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণের নামে নারী পাচার বন্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

---

[25] Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh (2024); ইয়াসমীন, তাসলিমা (২০২৪) নারীর জন্য ন্যায়বিচারের পথে এখনো যেসব বাধা, প্রথম আলো; Karmojibi Nari (2021); Begum & Saha (2017) Women's Access to Justice in Bangladesh: Constraints and Way Forward.

৩.৭.৬ পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ

পদোন্নতিতে বৈষম্যের কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। একই শিল্পে নারী-পুরুষের কাজ ও দায়িত্ব বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়—যেমন, তৈরি পোশাক শিল্পে নারীরা মূলত স্বল্প-দক্ষতার পদে নিয়োজিত থাকেন, উচ্চ বেতনের বা নেতৃত্বের পদে তাদের উপস্থিতি কম। এতে দক্ষতা ও যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। এর পেছনে রয়েছে নারীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা, প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূল কর্মপরিবেশ। CEDAW-র প্রচারিত প্রকৃত সমতা (Substantive Equality) ধারণা অনুযায়ী, সমতা অর্জনে শুধু সমান আচরণ যথেষ্ট নয়; জৈবিক পার্থক্য ও কাঠামোগত বৈষম্য বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

কাঠামোগত বৈষম্যের মূল কারণসমূহ দূর করতে নারীর ন্যায্য প্রবেশাধিকার ও সুবিধা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান। সুতরাং এমন একটি পদোন্নতির বিধিবিধান থাকা আবশ্যক যা কোনোরকম বৈষম্য ছাড়াই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সময় মতো পদোন্নতি নিশ্চিত করবে।

খ) পদোন্নতি, পদ বণ্টন ও দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা ও তদারকি পর্যায়ে উপযুক্ত কোটাভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব পদক্ষেপের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা যেতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সহায়ক হতে পারে এবং প্রকৃত সমতা (substantive gender equality) অর্জনের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

গ) কর্মস্থলে নারীদের বিভিন্ন পদে সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণকারী নিয়োগকর্তাদের প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এটি সফল কার্যপ্রণালিগুলিকে প্রচার করতে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করতে সহায়ক হবে।

৩.৮ শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম

শিশুশ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম নিরসনের রাষ্ট্রের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধান সকল শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা, বিকাশ ও শিক্ষিত মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলার জন্য দায়বদ্ধ। জবরদস্তিমূলক বা বলপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে সংবধানে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সংবিধান অনুচ্ছেদ ৩৪ (১) ভাষ্যমতে, "সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনোভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ (আইনত) দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে"।

শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ে জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২-এর ভাষ্য মতে "প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, শহর ও গ্রামাঞ্চলসহ সকল ক্ষেত্রে শিশুদেরকে যে কোনো ধরনের শ্রমে নিয়োগের বিষয়কে সরকার নিরুৎসাহিত করবে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর মূলনীতি হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ, শিশু দারিদ্র্য বিমোচন, শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ, কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ, শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ। জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০-এর লক্ষ্য শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ ও সবচেয়ে ক্ষতিকর শ্রম থেকে মুক্ত করা এবং তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন করা।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শিশু শ্রম সম্পর্কিত একটি পৃথক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এই আইন অনুসারে, ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কোনো প্রকার শ্রমে নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ধারা ৩৪)। শিশু আইন ২০১৩ বিশেষ করে, শিশুর সংজ্ঞায়ন, শিশু অধিকার, সুরক্ষা, শিশু শ্রম, পাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং শিশুশ্রম, নির্যাতন, পাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিশুশ্রম রোধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন গ্রহণ করেছে, যা শিশুদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। আইএল কনভেনশন ১৩৮- ন্যূনতম বয়স সনদ ১৯৭৩ অনুসারে, শিশুশ্রমের জন্য একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে কোনো শিশুকে নির্দিষ্ট বয়সের আগে শ্রমে নিয়োগ না করা যায়।

বাংলাদেশ সরকারের শোভন কাজ কর্মসূচি (Decent Work Country Program for Bangladesh, ২০২২-২০২৬) শিশু শ্রম মুক্ত কর্মক্ষেত্র তৈরি, শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action to Eliminate Child Labour, ২০২০-২৫) অনুযায়ী, সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশু শ্রম নির্মূল করার অঙ্গীকার করেছে।

শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রমের ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

৩.৮.১ কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ

ক) বাংলাদেশের বিদ্যমান শিশুশ্রম নিরসনে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, এলডিসি গ্রাজুয়েশন শর্ত পরিপালন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিবেচনায় এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য মর্যাদাবান নাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার বয়স সর্বনিম্ন ১৬ বছরে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।

খ) ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোরদের এমন ধরনের কাজে নিয়োগ করা যেখানে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা বিকাশের মানদণ্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত করা এবং এ বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে কাজ করা।

৩.৮.২ মানসম্মত শিক্ষার অধিকার ও কারিগরি দক্ষতার সুযোগ

ক) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যমান আইনের সঠিক বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ও শ্রমজীবী পরিবারের শিশুদের জন্য কমপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্য বই ছাড়াও খাতা, কলম, পেন্সিল সহ শিক্ষার আনুষঙ্গিক সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে বিনা খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

খ) যে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই, সেই সকল এলাকায় শিশুদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে মানসম্মত শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে অতি দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণকাল শেষ হলে শিশু ও তার পরিবারের আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী অনুমোদিত বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা অথবা অনুমোদিত শ্রমে নিয়োগের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

গ) সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়কে শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচিতে যুক্ত করতে হবে এবং 'শ্রম থেকে শিক্ষা জীবনে পুনর্বাসনে'র জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতেও বিনামূল্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশু বা কিশোর শ্রমিককে অধ্যয়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) কিশোর শ্রমগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিশ্চিত করে দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা প্রয়োজন। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কারিকুলাম তৈরি করতে হবে এবং তা শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কারিগরি শিক্ষা কারিকুলাম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শ্রম বাজারের দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে। এই কারিগরি শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও সহজলভ্য; স্ব স্ব স্থানীয় এলাকায় ব্যবসায়ী কমিউনিটি তাদের ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কমিউনিটি ভিত্তিক কিশোর শ্রমিকদের জন্য কারিগরি শিক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ নিতে পারেন।

ঙ) শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, বৈষম্য করা, অবহেলা করা, অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে শিশুদের অধিকার হরণ করা বা শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে বাধাগ্রস্ত হয় এমন ধরনের কাজ বা শিশুর অধিকার লঙ্ঘনজনিত যে কোনো কারণ প্রতিরোধে সুনির্দিষ্টভাবে শাস্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক।

৩.৮.৩ শ্রম মানদণ্ড মনিটরিং ও পরিদর্শন

কিশোরদের জন্য আইনতভাবে অনুমোদিত শ্রমের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম মানদণ্ড, শ্রমের মৌলিক নীতি, অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। আইনসম্মতভাবে কিশোর শ্রমিক নিযুক্ত করার বিধান থাকলেও প্রয়োজনীয় শর্ত পালন করা হয়েছে কি না বা উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ, কর্মঘণ্টা, কাজের সময়, বিশ্রাম, ছুটি ও মজুরি ও এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি আইনগতভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও দায়িত্বশীলতার সাথে ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রম মানদণ্ড মনিটরিং ও পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পে শিশুশ্রম মনিটরিং ও পরিদর্শনের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম ও কিশোর শ্রমিকদের সুরক্ষায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে বিশেষ শিশুশ্রম পরিদর্শন ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এই বিশেষ ইউনিট যে কোনো সময় বাংলাদেশের যে কোনো শিল্প কারখানায় বা কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম পরিদর্শনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে।

খ) প্রতিটি স্থানীয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণ অফিসের প্রবেশন কর্মকর্তাদের কার্যপরিধিতে নিয়মিতভাবে শিশুশ্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন কার্যক্রম বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

গ) জাতীয় শিশু শ্রম কল্যাণ পরিষদ ও জেলা পর্যায়ে গঠিত শিশু অধিকার মনিটরিং ফোরাম এ বিষয়ে তাদের নিজেদের পরিচালিত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করবে। এ ধরনের সকল ফোরামের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও ব্যর্থতা চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিটি ফোরামের সুনির্দিষ্টভাবে এক বা একাধিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের কার্যক্রমের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় থাকবেন।

ঘ) প্রতিটি পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, ফলাফল নিমিতভাবে পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে সংশোধন করে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বছরে অন্তত একবার যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও অগ্রগতি পেশ করবে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইতে পারে।

ঙ) শিশুশ্রম নিরসন ও শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে একটি যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে।

৩.৮.৪ দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও শাস্তি

শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে আইন ভঙ্গের শাস্তি ও রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মালিক ও অভিভাবকদের দায়িত্ব এবং করণীয় আরো সুনির্দিষ্টভাবে এবং বিস্তারিতভবে আইনে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শিশুশ্রম আইন ও মানদণ্ড লঙ্ঘনকারী, শিশুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণকারীদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত থেকে চূড়ান্তভাবে নিবন্ধন বাতিলের বিধান রাখা যেতে পারে।

খ) শিশুকে কাজে নিয়োগের প্রক্রিয়া জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোনো অভিভাবক বা নিয়োগকারী শিশুদের কর্মে নিযুক্ত করতে পারবেন না।

গ) আইন লঙ্ঘন করে শিশুদের কর্মে নিযুক্তের বিষয়ে অভিভাবকের সম্মতি প্রদান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শিশুকে কর্মে নিযুক্তের সম্মতির পূর্বে আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করতে হবে। যদি কর্তৃপক্ষ বিকল্প কোনো পন্থা না পায় তবে বিধি মোতাবেক কাজের অনুমতি/পরামর্শ দিতে পারেন। অভিভাবক ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উভয়েই আইনের শর্ত লঙ্ঘন বা অবহেলা করলে শাস্তির আওতায় আসতে পারেন।

ঘ) শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের শাস্তি বৃদ্ধি করে কঠোরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হতে হবে।

৩.৮.৫ দরিদ্র পরিবারের সুরক্ষা

ক) চলমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করবে এমন শর্ত সাপেক্ষ কর্মসূচি উদ্ভাবন করতে হবে। উপকারভোগী বিবেচনায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া সুনির্ধারিত করতে হবে।

খ) সামাজিক সুরক্ষার পরিমাণ ও পরিধি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন তা শিশুর উপর আর্থিক নির্ভরতা হ্রাস করতে ভূমিকা রাখে; "ফুড ফর এডুকেশন" কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে অসচ্ছল ও শ্রমজীবী পরিবারের শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

গ) শিশুর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিতের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠন করা যেতে পারে। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল পরিবারকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ) শ্রমঘন এলাকাসহ সকল শিল্পাঞ্চলে কমিনিউনিটি ভিত্তিক ডে কেয়ার সেন্টার, কারিগরি বিদ্যালয় ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ সেন্টার ও মেডিকেল সেন্টার করা যেতে পারে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ) শিল্পাঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তিক কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। শ্রম কল্যাণ সংক্রান্ত কাজে কোনো শিল্প কারখানা সংক্রান্ত কাজে সিএসআর কার্যক্রম করলে করলে তা কর রেয়াতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই পরামর্শ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

৩.৮.৬ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতে বিবেচ্য ও পূর্বের কার্যক্রম মূল্যায়ন

কার্যকরভাবে শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক বৈচিত্র ও শ্রমের ধরন বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এযাবৎ কালে গৃহীত অধিকাংশ কর্মসূচিই এ বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়নি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ শিশু শ্রম মোকাবেলায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। সেই সাথে পূর্ববর্তী কর্মসূচিগুলি যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকারিতা যাচাই না করার কারণে বছরের পর বছর একই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থের অপচয় করা হয়েছে মাত্র।

শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) জাতীয় পর্যায়ের শিশুশ্রম নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে শিশুশ্রমের বিস্তৃতি, ধরন ও প্রকৃতির বাস্তবতার প্রেক্ষিতে (তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে) কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা; শিশুশ্রম নিরসন কর্ম পরিকল্পনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম দূরীকরণ ও কিশোর শ্রমিক অধিকার প্রাধান্য দেওয়া।

খ) ইতঃপূর্বে গৃহীত সরকারি সকল উদ্যোগ ও কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে অগ্রগতি, সফলতা ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

গ) জাতীয় পর্যায়ের শিশুশ্রম নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণে ত্রিপাক্ষিক সামাজিক সংলাপ, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা এবং প্রত্যেক অংশীজনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩.৮.৭ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা

ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক ধরনের কাজ রয়েছে যা ধরন অনুযায়ী আপাতদৃষ্টিতে ঝুঁকিপূর্ণ মনে না হলেও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, কাজের চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত কাজ, শোষণ ও নির্যাতনের সুযোগ ও মৌলিক শ্রম অধিকার লঙ্ঘন সেই কাজগুলিকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। ঝুঁকিপূর্ণ তালিকা হালনাগাদের সময় যে সকল কাজ শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে সেগুলিকেও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। এমন কাজগুলি চিহ্নিত করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে এবং মূল্যায়নে নারী কিশোরী শ্রমিকের ঝুঁকি ও সমস্যা বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া।

খ) আইন ভঙ্গ করে কেউ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিযুক্ত করলে কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

গ) সরকার অনুমোদিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা শ্রম আইনের তফসিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.৮.৮ দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ

বিদ্যমান আন্তর্জাতিক নীতিমালার পাশাপাশি জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স আইন ও নির্দেশনায় শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম নিরসন মূখ্য বিষয়। রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এড়াতে শ্রমঘন এলাকা ও রপ্তানিমুখি শিল্পের সাপ্লাই চেইনে দেশীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরবরাহকারীদের কর্মক্ষেত্র শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম মুক্ত রাখতে রাষ্ট্রের পাশাপাশি প্রাথমিক রপ্তানিমুখি কারখানা মালিক বা ব্যবসায়ীদের এ বিষয়ে অধিকতর দায়িত্বশীল আচরণ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) সকল রপ্তানিমুখি শিল্পের ভাবমূর্তি ও মানবাধিকার বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য তাদের নিজেদের কারখানার পাশাপাশি তাদের সাপ্লাই চেইনে যুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পণ্য ও সেবা সরবরাহকারীদের কারখানাও সম্পূর্ণরূপে শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম মুক্ত রাখতে হবে।

খ) প্রতিটি কারখানা তাদের নিজেদের এবং তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কে যুক্ত সকল কারখানাকে শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম মুক্ত ঘোষণা করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রতিবেদন পেশ করবে।

গ) সে ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্তৃপক্ষকে যে কোনো সময় পরিদর্শনের জন্য সুযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতে সহযোগিতা করতে হবে।

৩.৮.৯ জবরদস্তিমূলক শ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম ও আধুনিক দাসত্ব নিরসন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড, আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী সকল ধরনের জোরপূর্বক শ্রম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সকল প্রকার জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ এবং যদি এই আইন কোনো ক্ষেত্রে অমান্য করা হয় তাহলে তা বেআইনি এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদানকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা

হয়েছে। আইএলও-এর জোরপূর্বক শ্রম কনভেনশন (নং ২৯) অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এমন কাজ বা সেবা, যা শাস্তির ভয় দেখিয়ে আদায় করা হয় এবং যা তারা স্বেচ্ছায় করেনি তা জোরপূর্বক শ্রম হিসেবে গন্য হবে।[26]

বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও এখনো জোরপূর্বক শ্রম এবং আধুনিক দাসত্বের উদাহরণ রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া-ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন পরিচালিত গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স (GSI) ২০২৩ অনুযায়ী, ২০২১ সালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২ লাখ মানুষ বাংলাদেশে আধুনিক দাসত্বে (Modern Slavery) বসবাস করেছেন। অর্থাৎ প্রতি ১,০০০ জনে ৭.১ জন আধুনিক দাসত্বের শিকার হয়েছেন। উদ্বেগজনকভাবে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৭টি দেশের মধ্যে যেখানে আধুনিক দাসত্বের হার সবচেয়ে বেশি, বাংলাদেশ সেই দশটি দেশের একটি। এছাড়া আধুনিক দাসত্বের বিস্তারের দিক থেকে বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫৮তম স্থানে রয়েছে।[27]

বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার Forced Labour Convention, 1930 (Convention No. 29), Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (Convention No. 105) এবং Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 অনুসমর্থন করায় সরকারের উপর মূলত জোরপূর্বক শ্রম নির্মূল, শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে। সকল ধরনের জোরপূর্বক শ্রম ও আধুনিক দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করা হলো:

ক। বাংলাদেশ শ্রম আইনে সুনির্দিষ্টভাবে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার সংজ্ঞায়ন করা এবং উপযুক্ত শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সংবিধান, দণ্ডবিধি, ইপিজেড আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও শ্রম আইনে সুনির্দিষ্টভাবে জবরদস্তিমূলক শ্রম সম্পর্কিত ধারণা ও শাস্তির বিধান শ্রম আইনে উল্লেখ নেই। আন্তর্জাতিক আইন, মানদণ্ড ও নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রম আইনে জবরদস্তিমূলক শ্রমের বিস্তৃত সংজ্ঞায়নের পাশাপাশি ও আধুনিক দাসপ্রথার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

খ। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমখাত যেখানে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার অস্তিত্ব রয়েছে বা সম্ভাবনা রয়েছে সেই সকল খাত জরিপের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম খাতসমূহকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথা থেকে মুক্ত করতে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে কার্যকর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল কার্যক্রম যাচাইযোগ্য ফলাফল নির্ভর হতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি ঠিক করে পরিকল্পনা করা।

গ। রপ্তানিমুখি শিল্পে এবং এর অপ্রাতিষ্ঠানিক সরবরাহকারী বা সাপ্লাই চেইনের পরোক্ষ সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করে সকল ধরনের জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার বিলুপ্তি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশ্ব রপ্তানি বাজারের যে কোনো পণ্যের সরবরাহকারী দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত, নিরবচ্ছিন্ন ও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যেমন; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার বিলোপে অধিকতর সোচ্চার হতে হবে। বিশেষ করে পরিদর্শন চেকলিস্টকে আধুনিক দাসত্ব পরিমাপক মাপকাঠির আলোকে হালনাগাদ করা জরুরি।

ঘ। জবরদস্তিমূলক শ্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাতসমূহ থেকে শ্রমিকের শোষণ ও বঞ্চনা লাঘবের জন্য সেই সকল শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ঙ। মানব পাচারের প্রতিরোধ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রত্যাশী শ্রমিকদের জবরদস্তিমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষার জন্য দেশীয় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির (রিক্রুটিং এজেন্সি) জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের মাধ্যমে নিয়োগকৃত প্রত্যেক শ্রমিকের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত সরকারের কাছে প্রতিবেদন আকারে পেশ করার পদ্ধতি গ্রহণ করা।

---

[26] GoodWeave International. (2025). *Modern slavery and child labour in the RMG sector of Bangladesh: Report.* Retrieved from https://goodweave.org/wp-content/uploads/2025/02/Modern-Slavery-and-Child-Labour-in-the-RMG-Sector-of-Bangladesh-Report.pdf

[27] https://www.walkfree.org/global-slavery-index/country-studies/bangladesh/

৪. শ্রমখাত সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রস্তাবনা

সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনমূলক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে জাতীয় শ্রমনীতির মূল লক্ষ্য যা বাস্তবায়নের মূখ্য ভূমিকা পালন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি (Rules of Business), জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২, জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২ সহ অন্যান্য নীতিমালা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের আলোকে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়নের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের থাকলেও আইনি ও নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়নি। শ্রম খাতের সংস্কারের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে একটি কার্যকর ও গতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠনের প্রস্তাব এই কমিশনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, যা শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা, অংশীজনদের মতামত এবং জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। শ্রম বাজারের পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ সংস্কার সর্বজনীন হবে, যাতে ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সম্পর্ক, শোভন কাজ, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রতিনিধিত্ব, সমতা ইত্যাদি অধিকার নিশ্চিত এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা জোরদার করা যায়। কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে সকল ধরনের (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত) শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শ্রম মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি পুনর্বিন্যাস, কাঠামোগত সংস্কার সাধন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

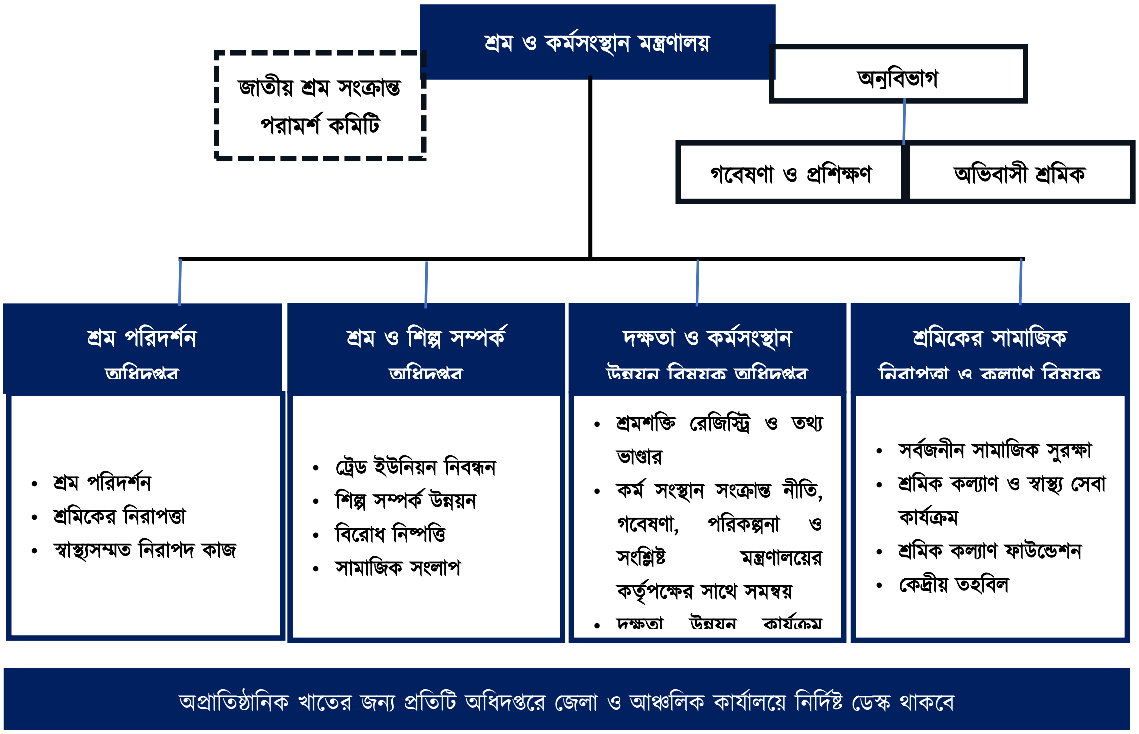

৪.১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কাঠামোগত সংস্কার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের মধ্যে কাজের ভারসাম্য আনয়নে শ্রম সংস্কার কমিশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে বিদ্যমান ২টি অধিদপ্তরের (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধদপ্তর) নাম পরিবর্তন এবং নতুন ২টি অধিদপ্তর সৃষ্টি করে মোট ৪টি অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে পুণর্বিন্যাস করার সুপারিশ করছে কমিশন।

৪.১.১ শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর

ক) 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর'-এর নাম পরিবর্তন করে 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' নামকরণ করা এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই অধিদপ্তরের দপ্তর/সাচিবিক ডেস্ক স্থাপন করা। এর মূল দায়িত্ব হবে সকল শ্রমিকের জন্য পরিদর্শন, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ কাজ নিশ্চিত করা।

খ) শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যপরিধিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম আইন ও বিধামালার আওতায় রেখে তাদের অধিকার ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

গ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের দপ্তর স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত, অথবা যেখানে অভিযোগ গ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই, সেখানে পেশাগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন, শিশু শ্রম, গৃহশ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে এবং কোনো বিশেষ শ্রম পরিস্থিতির মোকাবেলায় জেলা প্রশাসন বা উপজেলা প্রশাসন বা শ্রম অধিদপ্তর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করবে এবং তারা কৃষিসহ বিভিন্ন শ্রমখাতে মৌলিক শ্রম অধিকার (নিয়োগপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত কাজ, ক্ষতিপূরণ, সহিংসতা বা হয়রানি সংগঠিত হওয়া) নিশ্চিত করবে।

ঘ) পরিদর্শন এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং বাস্তব সময়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য উন্নত সরঞ্জাম প্রয়োগ করা।

ঙ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডাইফের পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা এবং শিল্পভেদে স্ট্যান্ডার্ড চেকলিস্ট ও পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করা।

চ) জনবল সংকট, শূন্য পদ পূরণ এবং কর্মরত পরিদর্শকদের পদোন্নতি জটিলতা নিরসন করে দপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনা। একই সাথে শ্রম পরিদর্শকদের আইনানুগ ক্ষমতায়ন এবং নির্মাণখাতসহ অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান।

৪.১.২ শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর

- 'শ্রম অধিদপ্তর'-এর নাম পরিবর্তন করে 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর' নামকরণ করা, যার মূল কাজ হবে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, বিরোধ নিস্পত্তি এবং সামাজিক সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বজায় রাখা।
- শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং নিশ্চিতকল্পে শ্রম ও শিল্পঘন এলাকা/অঞ্চল বিবেচনায় প্রশাসনিক বিভাগসমূহে বিভাগীয় শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা এবং একই সাথে বিভাগীয় শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তরসমূহের অধীনে নতুন আঞ্চলিক দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আঞ্চলিক শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী ও কর্তৃপক্ষ/কমিনিউটি, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও এ খাতের শ্রমিকের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সংলাপ/আলোচনা/প্রতিনিধিত্ব ও দরকষাকষি নিশ্চিতকরণে ভুমিকা রাখা।
- শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধে নিয়মিত আলোচনার আয়োজন এবং সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়ার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করার নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ করা। আরবিট্রেশন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আরবিট্রেটরের তালিকা প্রতি দুই বছরে মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা।
- আইটি-ভিত্তিক শ্রম তথ্য ব্যবস্থাপনা চালু করে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি আরও সহজ করা।
- শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো যৌক্তিকরণ, পদোন্নতির জটিলতা দূরীকরণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.১.৩ দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তর

বর্তমানের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুরক্ষা বিষয়ক কোনো কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায় না। কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন করার যে প্রস্তাব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপস্থাপন করেছে তা শ্রম সংস্কার কমিশন

বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী মনে করে। একই সাথে শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান অধিদপ্তরকে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তর করা জরুরি। এই অধিদপ্তরের কাজসমূহ হবে:

ক) বাংলাদেশে বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, শ্রম বাজার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং ভবিষ্যত কর্মজগতের চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা।

খ) শ্রমজীবী মানুষদের দক্ষতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, কারিগরি জ্ঞান অর্জন এবং প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

গ) একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্মশক্তি গড়ে তোলা এবং শিক্ষার সাথে শ্রমবাজারের চাহিদার সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে পেশাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনরায় দক্ষতা অর্জনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যা শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে পরিচালিত হবে।

ঘ) শিক্ষাধীনতা সংক্রান্ত বিধি ও নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং কর্মজীবন পরামর্শ প্রদান (career guidance services) এবং আজীবন শিক্ষার উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মশক্তিকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী করে তোলা।

ঙ) বিএমইটি'র দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ/কার্যক্রমকে এই অধিদপ্তরের আওতায় নিয়ে আসা, যার ফলে প্রবাস কেন্দ্রিক দক্ষতার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়। প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন।

চ) প্রস্তাবিত দক্ষতা ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তরের আওতায় আরও নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে:

- দেশে ও বিদেশে কর্মজগতের চাহিদা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের ম্যাপিং করা;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত লিয়াজো ও যোগাযোগ রাখা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা;
- শিল্পভিত্তিক মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ী সমিতি ইত্যাদির সাথে সমন্বয় করা;
- উদ্যোক্তা তৈরির জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- প্রশিক্ষণ/পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা, ভবিষ্যত কাজের উপযোগী আধুনিক কর্মদক্ষতা তৈরি করা, কর্মের মানোন্নয়ন ও সার্টিফিকেশনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা; এবং
- দেশে বিদেশে চাকরির সুযোগ সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার তৈরিতে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করা।

শ্রম তথ্যভাণ্ডার

এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রম তথ্যভাণ্ডার (সেকশন ৩.১-এ বর্ণিত) শ্রমিকের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত সকলের জন্য তথ্য ও পরিচয়পত্র নিশ্চিতে কাজ করবে। প্রস্তাবিত তথ্যভাণ্ডারে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ছাড়াও থাকবে শ্রমিকের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য, শ্রমিকের পূর্ব ও চলমান চাকরি সংক্রান্ত তথ্য, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য, শিল্প সেক্টর সম্পর্কিত তথ্য, আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য, পেশাগত দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য, জেলাভিত্তিক চাকরির নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকবে।

৪.১.৪ শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর

শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। তবে এসব কার্যক্রমকে এখনো স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে এসব উদ্যোগের স্থায়ী ও সংগঠিত রূপ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে, শ্রম সংস্কার কমিশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ' বিষয়ক একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠনের সুপারিশ

করছে অধীনে থাকবে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল। পাশাপাশি এই অধিদপ্তরের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে:

ক) শ্রমিকের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু ও শ্রমিক বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিচালনা;

খ) প্রস্তাবিত (সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ অংশে বর্ণিত) সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিমা, শ্রমিক প্রভিডেন্ড ফান্ড, সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি ও সমন্বয় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা;

গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহে যে সব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম চলমান আছে, সে সবের মধ্যে শ্রমিক সংশ্লিষ্ট মাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়। এ সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ হতে হবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে।

উল্লেখ্য, দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তরের আলাদা অফিস বা ডেস্ক থাকবে। তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই অধিদপ্তরের অফিস/ডেস্ক না থকলে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকার চাইলে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট ন্যাস্ত করতে পারবে।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মূল লক্ষ্য শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করা, সেই বিবেচনায় শ্রম সংস্কার কমিশন এই কেন্দ্রসমূহকে বর্তমানের শ্রম অধিদপ্তর হতে প্রস্তাবিত 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অধিদপ্তর'-এর অধীনে আনা এবং কেন্দ্রসমূহের দীর্ঘদিনের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ দুর করা জন্য নিম্নোক্ত কার্যকর পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যান্য হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অধিকতর চিকিৎসা পেতে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সুপারিশ/রেফারাল যেন সরকারি নথি হিসেবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক ভেদে সকল ধরনের শ্রমিক যেন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা পায় তা নিশ্চিত করা।

গ) বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া অধিকার মূলে সেবা, চিকিৎসক ও স্টাফদের সংখ্যা বাড়ানো, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি (প্রতিটি জেলায় ১টি ও শিল্পাঞ্চলে একাধিক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার হতে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসমূহে ডাক্তার নিয়োগ দেয়া। বর্তমানে কর্মরত ডাক্তারদের ক্যাডার সার্ভিসের মর্যাদা দেয়া ও ডাক্তারদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান যাতে ক্যারিয়ারের উন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা অপসারণ হয়। বর্তমানে যে সকল ডাক্তার কর্মতর রয়েছে তাদের জন্যেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উচ্চতর পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া। এ ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাঝে যোগাযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা।

ঙ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শ্রমিক ও পরিবারবর্গকে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি জরুরি বিভাগ, পূর্ণাঙ্গ প্যাথলজি বিভাগ, উন্নত ডায়াগনস্টিক টুলসের সংস্থান এবং বিশেষায়িত বহির্বিভাগ (যেমন-চক্ষু, শিশু, গাইনি, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি) স্থাপন করা।

চ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাপ্য ঔষধের প্রকার এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ছ) সকল শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের জন্য শয্যার ব্যবস্থা করা।

জ) শ্রমিকদের জন্য সান্ধ্যকালীন সেবা গ্রহণের সুবিধা নিশ্চিত করা।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

ক) শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের নাম পরিবির্তন করে 'শ্রমকল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র' করা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কৌশল নির্ধারণ করা।

খ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আলাদা করতে হবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে শিল্পাঞ্চল/শিল্পঘন এলাকায় শ্রম বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা।

গ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের জনবল বৃদ্ধি ও তাদের পদ মর্যাদার (গ্রেড) উন্নতি।

ঘ) দেশের শ্রমঘন অঞ্চলে নতুন নতুন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

চ) সিএসআর প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সেবার কাজ উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা নেয়ার ব্যবস্থা চালু করা।

ছ) প্রতিটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র মালিক, শ্রমিক, কমিউনিটি মেম্বার, স্থানীয়ভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

ক) কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, আবেদন গ্রহণ, নিস্পত্তি, বিবরণ সবকিছু ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

খ) সহায়তার যোগ্যতা বিবেচনায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সুপারিশ/রেফারেন্স গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা।

গ) ব্যক্তিপর্যায়ের সুবিধা প্রদান বন্ধ করার লক্ষ্যে ক্রমানুসারে আবেদন নিস্পত্তি করা নিশ্চিত করা।

ঘ) শিক্ষা ও দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মিডিয়া প্রতিবেদনকে প্রমান হিসেবে গ্রহণ করা।

ঙ) ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করতে আইনি বাধ্যবাধকতা শিথিল করা।

চ) শ্রমিকগণ যেন দপ্তরে আসা যাওয়া ব্যতীত অনলাইনে আবেদন করতে পারে এবং অনলাইনে আর্থিক অনুদান পেতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ছ) আবেদন এবং সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা, যেন কোনো শ্রমিক সুবিধা হতে বঞ্চিত না হয় বা বৈষম্যের শিকার না হয়।

জ) আবেদন ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করা।

ঝ) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অফিস আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধিকরণ এভং বিভাগীয় ও আঞ্চলিক বাছাই কমিটি গঠনের মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যক্রমকে ত্বরান্বিতকরণ।

কেন্দ্রীয় তহবিল

ক) কেন্দ্রীয় তহবিলে শ্রমিকবান্ধব সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। আবেদন প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা যেন শ্রমিক তার পরিচয় পত্র দিয়েই আবেদন করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) তহবিলের পুরো কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করার মাধ্যমে আবেদন, যাচাই এবং সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়ার দ্রুততা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

গ) প্রতিটি কারখানায় এবং শিল্পাঞ্চলে সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করে শ্রমিকদের আবেদন করতে সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনের নিস্পত্তি সম্পন্ন করা।

ঙ) তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কার আনা এই তহবিল হতে শ্রমিকের বকেয়া বেতন দেয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা।

৪.১.৫ অনুবিভাগ

মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ ২টি অনুবিভাগ থাকবে:

গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ:

এই অনুবিভাগের মূল কাজ হবে শ্রম ইস্যুতে গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। বর্তমানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে থাকা 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' এবং শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে থাকা 'শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন' প্রতিষ্ঠান দুটি নিয়ে শ্রম সংক্রান্ত ইস্যুতে গবেষণা পরিচালনা এবং যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এ অনুবিভাগ গঠিত হবে। এ অনুবিভাগ তার কাজের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের সাথে সরাসরি কাজ করবে ও তথ্য আদানপ্রদান করবে।

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই)

রানা প্লাজা ও তাজরীন হত্যাকাণ্ড পরবর্তী দেশি ও বিদেশি উদ্যোগ ও সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহে কাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের বিপরীতে বৈষম্যের শিকার আরেকটি প্রতিষ্ঠান শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালনাধীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইনস্টিটিউট বা আইআরআই। যেখানে আইআরআই হতে পারতো শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের সেতুবন্ধন, সেখানে শুধুমাত্র অগ্রাধিকারের অভাবে মাত্র ৪টি আইআরআই অপ্রতুল প্রশিক্ষক, দুর্বল অবকাঠামো, সনাতন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও অনুন্নত পদ্ধতিতে অনেকটা অদৃশ্যভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের (আইআরআই) কাঠামোগত, প্রোগ্রামিক এবং অপারেশনাল চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা জরুরি যাতে করে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম আইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরি, মালিক ও শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ বজায় রাখা এবং বাংলাদেশের শ্রম খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। আইআরআইসমূহের আধুনিকায়ন এবং একই সাথে এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে তার লক্ষ্য অর্জনের সামর্থ্য উন্নয়নে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেছে:

ক. সকল প্রশাসনিক বিভাগে চাহিদার ভিত্তিতে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন স্থাপন করা এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

খ. নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীর জন্য পৃথক হোস্টেল, ডে-কেয়ার সুবিধা এবং প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনসমূহ বিবেচনায় রেখে আইআরআইসমূহের অবকাঠামোর আধুনিকায়ন করা।

গ. প্রশিক্ষণ কারিকুলামসমূহ আধুনিক ও যুগোপযোগী করা। জেন্ডার, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রম, সাপ্লাই চেইন, শোভন কাজ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, জাস্ট ট্রানজিশনের, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ. সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন শিল্প খাতের চাহিদার ভিন্নতার বিষয় বিবেচনাপুর্বক নির্দিষ্ট শিল্প, সেক্টরভিত্তিক এবং চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।

ঙ. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহে চাহিদাভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা এবং সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ এবং ই-লার্নিং-এর সুযোগ তৈরি।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)

ক. শ্রমিকদের জন্য সহজবোধ্য প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করে এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার বা বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে প্রণোদনা (Incentive) দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

ঘ. শ্রমিক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শ্রমঘন এলাকায় (ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অফিস

স্থাপনা ও পরিচালনা করা প্রয়োজন। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সহযোগিতাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঙ. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI) অধীনে একটি "লিগ্যাল রিসার্চ সেল" স্থাপন করা যেতে পারে এবং নোস্ট্রির প্রধান কার্যালয়ে একটি সমন্বয় অফিস সহ কিছু আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার ফলে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের নস্ট্রির অবদান অংশীজনের কাছে দৃশ্যমান বলে প্রতীয়মান হয়।

অভিবাসী শ্রমিক অনুবিভাগ

শ্রমিক হিসেবে অভিবাসী কর্মীদের স্বীকৃতি ও অধিকার নিশ্চিতে কাজ করবে এই অনুবিভাগ। প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষার করার পাশাপাশি আইএলও সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় সাধন করবে এই অনুবিভাগ।

৪.১.৬ বিশেষ সুপারিশ

ক) প্রস্তাবিত ৪টি অধিদপ্তরের প্রতিটিতেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বিভাগ রাখা, যার মাধ্যমে সকল ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সেবা প্রদান করা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বিসিএস (শ্রম) ক্যাডার তৈরি। প্রস্তাবিত 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' ও 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর'-এর কর্মকর্তাদের মধ্য হতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে পদোন্নতির সুযোগ রাখা।

গ) রানা প্লাজা পরবর্তী সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টায় যে সকল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো শ্রমিকের অধিকার ও অবস্থার উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কীভাবে অবদান রেখেছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করা।

৪.১.৭ জবাবদিহিতা, অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা

শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রম মন্ত্রণালয়াধীন, যা একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শ্রম ইস্যুতে দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা রক্ষার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জবাবাদিহিতা, অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি শক্তিশালীকরণ অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে কমিশন নিম্নোক্ত ২টি পর্যায়ে সংস্কারের সুপারিশ করছে; ১ম পর্যায়ে জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি গঠন ও ২য় পর্যায়ে জাতীয় শ্রম কমিশন গঠন।

জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি

ক) শ্রমিক, মালিক ও শ্রমখাতে অভিজ্ঞ/বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি পরামর্শ, পর্যালোচনা ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা। শ্রমখাতের দুটি প্রধান অংশীদার, শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান, যোগাযোগ ও সমন্বয়, পর্যালোচনা, দিক নির্দেশনা, কল্যাণমূলক কার্যক্রম মনিটরিং, সেবা প্রদানকারী অধিদপ্তর সম্পৃক্ত কোনো অভিযোগ পর্যলোচনাপূর্বক মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে এই কমিটি। কমিটি শ্রম পরিস্থিতি বিষয়ে সময়বদ্ধ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং শ্রমিকদের মৌলিক সেবাগ্রহণের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে।

খ) এই কমিটির আরেকটি প্রধান কাজ হবে জাতীয় শ্রমনীতি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতিমালা, কর্মসংস্থান নীতি, গার্হস্থ্য নীতি ইত্যাদি নীতিমালা আইনে প্রতিফলনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই কমিটি শ্রমইস্যুতে জাতীয় ক্রাইসিস মোকাবেলায় সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করে সমাধানের উদ্যোগ নিবে।

গ) 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' এবং 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর' কর্তৃক তাদের প্রতিবেদন এই কমিটির কাছে পাঠানো বাধ্যতামূলক হবে এবং কমিটি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরামর্শ প্রদান করবে এবং তার বাস্তবায়ন মনিটর করবে।

ঘ) এই কমিটি বাৎসরিক শ্রম কনভেনশন ও সামাজিক সংলাপ আয়োজন করবে।

ঙ) কমিটির প্রস্তাবিত কাঠামোতে থাকবে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ থেকে ২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি ও ২ জন মালিক প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ২ জন ও মালিক সংগঠন থেকে ২জন, শ্রম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থেকে চেয়ারম্যান মনোনীত ২ জন (১ জন সরকার পক্ষের ও ১ জন প্রধান বিরোধী পক্ষের) এবং ২ জন বিশেষজ্ঞ (আইনজীবী/মানবাধিকার কর্মী/গবেষক/নারী অধিকার/পরিবেশবাদী/শ্রম বিশেষজ্ঞ/অর্থনীতিবিদ)।

চ) এই পরামর্শ কমিটিতে মূল সদস্যদের বাইরে পর্যবেক্ষক হিসেবে আইএলও ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ দেশের কোনো আগ্রহী শ্রম অধিকার সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

জাতীয় স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন

ক) সময়বদ্ধ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণীয় হওয়ায় একটি জাতীয় শ্রম কমিশন গঠনকে ২য় পর্যায়ের সুপারিশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। কমিশনের প্রস্তাবিত কাঠামোতে থাকতে পারে ১ জন চেয়ারম্যান (জাতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য বিশিষ্ট শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ) এবং সদস্য হিসেবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থেকে মাননীয় স্পিকার মনোনিত ২ জন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১ জন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা, মালিকপক্ষের ১ জন, শ্রমিকপক্ষের ১ জন, শ্রম আইন, অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে ১ জন বিশেষজ্ঞ ও শ্রম বিষয়ক ১ জন গবেষক।

খ) কমিশনের মূল কার্যক্রম হবে শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪-এর প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন তদারকি করা, শ্রম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/দপ্তরসমূহের কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা। সুপারিশকৃত এই কমিশনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে।

গ) শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি ও জাতীয় পর্যায়ের ক্রাইসিস মোকাবেলার আইনগত ক্ষমতা থাকবে এই কমিশনের। মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির দায়িত্ব থাকবে এই কমিশনের। এছাড়াও শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় স্থায়ী কমিশন।

৪.১.৮ ত্রিপক্ষীয় কার্যক্রম ও কাঠামোসমূহ জোরদার

জাতীয় পরামর্শ কমিটি ও ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ সহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে যতগুলো কমিটি আছে, তা কার্যকরকরণ ও নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে একজন যুগ্ম সচিবের দায়িত্বে মন্ত্রণালয়ের আলাদা সাচিবিক ডেস্ক স্থাপন করা। এই ডেস্কের কাজ হবে পক্ষসমূহের মধ্যে সামাজিক সংলাপ আয়োজন, সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান শক্তিশালীকরণ, কাঠামোসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা ও নথিপত্র সংরক্ষণে রাখা। মন্ত্রণালয়ের একজন পরিচালক পদমর্যাদার অধীনে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত ও সমন্বয় সাধন করা নিশ্চিত করা।

৪.১.৯ জাতীয় মজুরি কমিশন

বিভিন্ন পেশার ও ধরনের মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়া (ওয়েজ এন্ড প্রোডাকটিভিটি কমিশন, নিম্নমত মজুরি বোর্ড ইত্যাদি) সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সংস্কার করে জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করা হবে (বিস্তারিত সংস্কার প্রস্তাবনার জন্য মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা বিষয়ক অধ্যায়ে-৩.২ দেখুন)। এ কমিশনের ৩টি ভাগ থাকবে;

- জাতীয় নিম্নতম মজুরি
- শিল্প সেক্টরভিত্তিক নিম্নতম মজুরি
- বিশেষ পেশাজীবীদের জন্য নিম্নতম মজুরি।

নিম্নতম মজুরি বোর্ড

ক) নিম্নতম মজুরি বোর্ডের আইনগত কার্যপরিধি ও সক্ষমতা বাড়ানো, যাতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষনা করতে পারে।

খ) মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মজুরি, উৎপাদনশীলতা ও শ্রম অর্থনীতি বিষয়ক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া।

গ) মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ডের নিজস্ব গবেষণা সম্পন্ন করা ও এর ভিত্তিতে মজুরি সুপারিশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বোর্ডের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানো।

ঘ) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সেক্টরের মজুরি সুপারিশ করার সময়ে মজুরির পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ, মজুরির হিসাব পদ্ধতি এবং মজুরির পরিমাণ নিরূপণে ব্যবহৃত তথ্য/উপাত্তসমূহ প্রকাশ করা।

ঙ) মূল্যস্ফীতি ও অন্যান্য মানদণ্ড বিবেচনা করে প্রতি বছর শিল্প সেক্টরের মজুরি মূল্যায়ন করে মর্যাদাকর জীবনধারণের জন্য মজুরি নির্ধারণের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

চ) বর্তমানে ৪২টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত আছে, এটি হালনাগাদ করতে হবে ও শিল্প সেক্টরের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

স্থায়ী মজুরি কমিশন

ক) জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য শ্রম, শ্রম অর্থনীতি ও মজুরি বিষয়ে অভিজ্ঞ/দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ এবং শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি স্থায়ী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করা। এই কমিশনের আওতায় সরকারি পে কমিশন এবং মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, সংবাদ পত্র ওয়েজ বোর্ড অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ একক মজুরি কমিশন দ্বারাই বাংলাদেশে সকল মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ ও কার্যকর হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন প্রতি বছর মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরি হালনাগাদ করে ঘোষণা করবে।

খ) সেক্টর/খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশনের অধীনে এক বা একাধিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হবে।

গ) জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশনের কাঠামো ও কার্যপরিধিসহ অনান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার/সংশোধন করা হবে।

ঘ) মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে যৌথভাবে নিয়মিত সংলাপের আয়োজনের বিধান রাখা এবং ন্যায্য মজুরির সুফল বিষয়ে গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে।

৫. বিশেষ ইস্যুভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা

৫.১ ব্যবসা ও মানবাধিকার প্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ

বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার সংক্রান্ত দায়বদ্ধতার বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি বৈশ্বিক নীতিগত ধারণা বা প্রক্রিয়া। দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বৈশ্বিক নীতিগত ধারণা বা প্রক্রিয়া হচ্ছে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স (Human Rights Due Diligence-HRDD) যার মাধ্যমে বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবাধিকার সুরক্ষায় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং ধারাবাহিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি চিহ্নিত, প্রতিরোধ এবং সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হয় কিনা তা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এ প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার যথাযথ বিচার বা প্রতিকার নিশ্চিত করা। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিক, ভোক্তা, এমনকি যে কোনো মানুষের মানবাধিকারের উপর প্রকৃত এবং সম্ভাব্য যে কোনো ক্ষতিকর প্রভাবগুলো চিহ্নিত, প্রতিরোধ এবং প্রশমিত করতে এবং সেই নেতিবাচক প্রভাবগুলো কীভাবে সমাধান করা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স পদ্ধতিটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনগতভাবে স্বীকৃত হচ্ছে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক ব্যবসা সংক্রান্ত নীতিমালায় একীভূত হয়েছে। বিষয়টি বাংলাদেশের শ্রম খাতের জন্য, বিশেষ করে রপ্তানিমুখি শিল্পের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের সুনির্দিষ্ট কাঠামো জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতি-নির্দেশনা ২০১১ (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতি-নির্দেশনা ২০১১, তিনটি মূল ভিত্তি সুরক্ষা, মর্যাদা ও প্রতিকার (Protect, Respect, Remedy) এই কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) অনুযায়ী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর উপর নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধের জন্য শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় একটি নীতিগত প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করবে (Policy Statement), মানবাধিকার সুরক্ষায় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (Human Rights Due Diligence) গ্রহণ করবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার (Remediation) প্রদান বা সহযোগিতা করবে। এছাড়াও দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বেশ কিছু নির্দেশিকা, ঘোষণা ও আইন রয়েছে, যা কোম্পানিগুলোর জন্য মানবাধিকার সম্মান করা ও সুরক্ষার এবং পরিবেশগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো ব্যবসা ও মানবাধিকার (BHR) নীতির মুখ্য নীতি হিসেবে কাজ করে। জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতি-নির্দেশনার (UNGPs) পাশাপাশি জাতিসংঘ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট (UN Global Compact) ২০০০, আইএলও বহুজাতিক কোম্পানি ও সামাজিক নীতিমালা সম্পর্কিত ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা (MNE Declaration) ১৯৭৭, বহুজাতিক কোম্পানির জন্য ওইসিডি নির্দেশিকা (OECD Guidelines) ১৯৭৬ এবং সাম্প্রতিক ঘোষিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্পোরেট সাসটেইনেবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্স ডাইরেকটিভ (CSDDD) ২০২৩ দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের মাধ্যমে মানবাধিকার ও পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ (RBC) সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নীতি ও আইনসমূহ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ, ভোক্তা ও সাধারণ জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ (RBC) সংক্রান্ত দুইটি মুখ্য বিষয় পাওয়া যায়; (১) হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স ও (২) এনভাইরনমেন্টাল ডিউ ডিলিজেন্স। দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ (RBC) বিষয়ের আলোকে কীভাবে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার, সুরক্ষা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ব্যবসার ভাবমূর্তি ও অধিকতর কমপ্লায়েন্স শিল্প হিসেবে সুনাম রক্ষা করা যায় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা করা হলো:

ক। দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রণয়ন

দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ক একটি বিস্তৃত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) তৈরি করা উচিত, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মানবাধিকার এবং পরিবেশ সুরক্ষিত রেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) একটি কৌশলগত কাঠামো হিসেবে মানবাধিকার ও পরিবেশগত লঙ্ঘন চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন এবং প্রতিকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ প্রণয়ন করতে পারে, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিল্পখাতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নত করতে এটি প্রণয়ন করা জরুরি।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির পাশাপাশি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (নিয়োগকর্তা এবং ব্র্যান্ড), ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজের সংগঠন এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করবে।

খ। শ্রম আইনে মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা

শ্রম আইনে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে শিল্পের জন্য হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া অনুসরণে বাধ্যবাধকতা তৈরি করা সম্ভব। এর ফলে আইনতভাবে প্রযোজ্য শিল্প নিয়মিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃত ও সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করবে; পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যমান ঝুঁকি কমাবে; প্রতিকূল প্রভাবসমূহ প্রশমিত, প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া স্থাপন করবে। এছাড়া এইচআরডিডি প্রক্রিয়ার গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ফলাফল নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করে মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম এবং উদ্যোগগুলির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে সংশোধন করবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক পরিচালিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও অংশীজনদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

আন্তর্জাতিক নীতি ও আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স বিষয়ক একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা শিল্পের আকার ও পরিসর অনুযায়ী ধাপে ধাপে প্রযোজ্য হবে এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার সংক্রান্ত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

গ। HRDD তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা

প্রস্তাবিত স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এর আওতায় ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) মনিটরিং ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এই কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকরী হতে হবে, যাতে এটি শ্রমিক অধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে পারে।

ঘ। রপ্তানিখাতসহ বৃহৎ শিল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিক মানবাধিকার ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণে স্থায়ী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা

ক) রপ্তানি খাতসহ বৃহৎ শিল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি স্বাধীন ও বিস্তৃত মূল্যায়ন (Independent and Comprehensive Assessment) পরিচালনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যা রপ্তানি খাতসহ অন্যান্য বৃহৎ শিল্পে পর্যায়ক্রমে মানবাধিকার ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণ করবে। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের (Responsible Business Conduct - RBC) বাস্তব অবস্থা চিহ্নিত করা হবে এবং আদর্শ মান ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যকার ব্যবধান (Gap in Compliance) বিশ্লেষণ করা হবে। একইসঙ্গে, মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ) একটি জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণের তথ্য, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কিত তথ্য, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ এবং যোগাযোগ ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ থাকলে

এটি একাধিক অডিটের প্রয়োজনীয়তা কমাবে এবং সরকার, ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াবে। সুতরাং একাধিক অডিটের প্রয়োজনীয়তা কমানোর লক্ষ্যে একটি স্থায়ী, কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য মানবাধিকার ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য একটি স্থায়ী হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

ঙ। রপ্তানিমুখি ও বৃহৎ শিল্পের সরবরাহ চেইনে শ্রমিক অধিকার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি বিস্তৃত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা

দেশের সকল রপ্তানিমুখি ও বৃহৎ শিল্পের সরবরাহ (Supply Chain) চেইনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো, ব্যাপ্তি ও প্রবাহ নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষদের (Stakeholders) সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে একটি বিস্তৃত জাতীয় তথ্যভাণ্ডার (Comprehensive Database) তৈরি করা। এতে দেশের রপ্তানিমুখি কারখানা, শ্রমিক, সরবরাহকারী ও অন্যান্য অংশীদারদের চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ সহজতর হবে।

চ। বাণিজ্য চুক্তিতে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) অনুসরণের বাধ্যতামূলক সামাজিক শর্ত/ধারা সংযোজন

বাণিজ্য চুক্তিতে একটি বাধ্যতামূলক ধারা সংযোজন করা, যেখানে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) মানদণ্ড অনুসরণের স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে। এটি নিশ্চিত করবে যে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখি শিল্পে মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী দেশীয় সরবরাহকারীদের সাথে আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানও সমানভাবে শিল্পে মানবাধিকার, সুনির্দিষ্টভাবে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

ছ। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি

ব্যবসা এবং মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে মাল্টিস্টেকহোল্ডার সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং সমন্বয় বাড়ানো হলে একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠবে, যা মানবাধিকার বিষয়ক চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান করতে সহায়ক হবে। এটি করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজের সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা জরুরি।

৫.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও ন্যায্য রূপান্তর

বাংলাদেশ দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন উভয়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ এবং গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১-এর প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্বের সপ্তম চরম দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে।[28] যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনের জন্য সামান্যই দায়ী, তথাপি পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম দিকে অবস্থান করছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শ্রমজীবী মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটি চাকরি এবং শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যা আগামীতে আরও প্রকট হতে পারে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে কর্মঘণ্টা কমে যেতে পারে। আইএলও হিসেব মতে উচ্চতাপমাত্রা জনিত কারণে ২০২৩ সালের মধ্যে বিশ্বে সর্বমোট শ্রম ঘণ্টার ৩.৮ শতাংশ হ্রাস পাবে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ হবে ৪.৮৪ শতাংশ। বিশেষ করে নারী, অভিবাসী, যুবক, আদিবাসী, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পরিবেশগত দুর্যোগের পর সহজে ঘুরে দাঁড়াতে পারে না এবং তাদের জন্য পুনর্বাসন হওয়া বিশেষভাবে কঠিন হয়ে ওঠে।[29]

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ও কার্বন নির্গমন হ্রাস নীতি গ্রহণের ফলে শিল্প ও বাণিজ্য নীতিতে প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO, 2017) উল্লেখ করেছে যে, সবুজ কাজের (Green Jobs) মান অবশ্যই ভালো হতে হবে, মর্যাদাপূর্ণ হতে হবে এবং তা অবশ্যই শোভন কাজ (Decent Work) এজেন্ডার চারটি কৌশলগত লক্ষ্য অনুসারে হতে হবে।

জাস্ট ট্রানজিশন বা "ন্যায্য রূপান্তর" হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মূল লক্ষ্য পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক। জাতীয় জলবায়ু ন্যায্যতা কৌশলপত্র প্রণয়ন

বাংলাদেশের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিবারের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ন্যায্য রূপান্তর নীতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি শ্রমবান্ধব জাতীয় জলবায়ু ন্যায্যতা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা জরুরি। জাতীয় জলবায়ু ন্যায্যতা কৌশলপত্র শ্রমিক ও তাদের জন্য জলবায়ু ক্ষতিপূরণে ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ।

খ। জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন

- পরিবেশ বান্ধব সবুজ অর্থনৈতিতে রূপান্তর বা শিল্পায়ন বা শিল্পে যে কোনো ধরনের প্রযুক্তিগত রূপান্তর প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করত এবং সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরের সুফল লাভের জন্য একটি জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন করা। এটি শ্রমিক ও শিল্প উভয়ের জন্য একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক, যৌক্তিক এবং সুরক্ষামূলক রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এই প্রক্রিয়ায় সরকার, মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ও সামাজিক অংশীজনদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা জরুরি।
- জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামোতে বিশেষ খাতভিত্তিক পরিকল্পনা বা রূপরেখা বা নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণের মত সামাজিক শর্ত মেনে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন বা সবুজ কারখানা প্রতিষ্ঠা বা রূপান্তর প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রক্রিয়াগত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা।

---

[28] https://www.undp.org/bangladesh/publications/climate-vulnerability-index-draft

[29] International Labour Office. (2018). *The employment impact of climate change adaptation.* Input Document for the G20 Climate Sustainability Working Group International Labour Office (ILO): Geneva.

গ। ন্যায্য রূপান্তর পরামর্শক পরিষদ গঠন

জাতীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য রূপান্তর পরামর্শক পরিষদ গঠন করা। এই পরিষদের কাজ হবে শিল্পে সবুজায়নের মূল অন্তরায়সমূহ যথা বৈষম্য এবং অবিচারসমূহ চিহ্নিত করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়সমূহ মনিটরিংয়ের জন্য শিল্পভিত্তিক আলাদা আলাদা বিশেষায়িত মনিটরিং ইউনিট গঠন করা। ত্রিপক্ষীয় নীতি অনুসরণ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই পরিষদ গঠিত হবে।

ঘ। জাতীয় জলবায়ু ও ন্যায্য রূপান্তর তহবিল

জলবায়ু পরিবর্তন ও সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরজনিত ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলা ও সামজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকারি ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তহবিল গঠন করা। এই জাতীয় তহবিলের অধীনে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়িয়ে সরকারকে একটি সামাজিক সুরক্ষা তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশেষ করে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গবেষণা ও উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং রূপান্তর-সংশ্লিষ্ট কর্মচ্যুতির জন্য বিমা এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া, কর্মহীন সময়ের জন্য ভাতা ও সুবিধাদি প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, পরিবর্তিত উন্নত অবস্থার জন্য শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন এবং রি-লার্নিং, চাকরি হারানো শ্রমিককে চাকরি-খুঁজে পেতে সহায়তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য এই তহবিলের একান্ত প্রয়োজন।

ঙ। জলবায়ু পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করে তা থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষম ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যাতে তারা গ্রিন ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে সহজেই নতুন নতুন ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারে এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান মনিটরিং করতে পারে। নতুন প্রযুক্তি এবং পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন মনিটরিং-চেকলিস্ট আপগ্রেড করা।

চ। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জলবায়ু বিষয়ক নীতিসমূহ হালনাগাদ ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

- অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জলবায়ু বিষয়ক নীতিসমূহকে আইএলও ন্যায্য রূপান্তর গাইডলাইনস মেনে হালনাগাদ করা। জাতীয়ভাবে নির্ধারিত কার্বন নিঃসরণ মাত্রা এবং দীর্ঘমেয়াদি নিম্নকার্বন নিঃসরণ উন্নয়ন কৌশলসমূহে ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং একীভূত করা।
- জবাবদিহিতা বাড়াতে এবং বিরূপ প্রভাব কমাতে ন্যায্য রূপান্তরের নীতিসমূহকে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহের সাথে সুসংহত এবং একীভূত করা, যেমন- শ্রমবাজার নীতি, ব্যাংক ঋণের শর্তাবলি, সরকারি প্রণোদনা এবং অন্যান্য বিনিয়োগ নীতি।
- কারখানাসমূহের সবুজায়ন কিংবা বিদ্যমান কারখানাসমূহে প্রযুক্তি আপগ্রেড করার জন্য বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ এবং আমদানি-রপ্তানি অর্থায়ন ও প্রণোদনার নীতি ও প্রবিধানসমূহে একটি প্রাক সামাজিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রতিবেদনে শ্রমিকের জীবনে পরিবর্তনের খারাপ প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং ন্যায্য রূপান্তরের জন্য মিটিগেশন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা।

ছ। পুনর্বাসন, দক্ষতা বৃদ্ধি, আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং নিশ্চিত করা

- সবুজ রূপান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিষয়ে শ্রমিকদের আগে থেকে জানানো এবং প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সন্তোষজনক রূপান্তর প্রক্রিয়ার কারণে যদি চাকরি হারানো অনিবার্য হয়ে পড়ে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং বিকল্প কোনো চাকরিতে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে গবেষণা পরিচালনা করে ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি বিস্তৃত এবং সহজলভ্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

- পরিবর্তনের যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে গবেষণা পরিচালনা করে ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি বিস্তৃত এবং সহজলভ্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করা। একটি সমন্বিত পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য এটা জানা জরুরি যে, রূপান্তর প্রক্রিয়ার আগে কী ধরনের দক্ষতা বিদ্যমান ছিল এবং পরে কী ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন হবে।
- অটোমেশন বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের শুরুতেই সকল শ্রমিককে এ বিষয়ে অবশ্যই জানাতে হবে যে ভবিষ্যতে উৎপাদনের জন্য কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হবে এবং শ্রমিকরা যাতে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করতে পারে এজন্য তাদেরকে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান আবশ্যক।

জ। নারীদের প্রতি সংবেদনশীল ন্যায্য রূপান্তর নীতি

ন্যায্য রূপান্তর নীতিতে নারী শ্রমিকদের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নেওয়া। নারীদের প্রতি সংবেদনশীল ন্যায্য রূপান্তর নীতি নিশ্চিত করতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নারী শ্রমিকদের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রয়োজনের বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা। এ বিষয়ে সামাজিক সংলাপ, যৌথ দরকষাকষি বা শিল্প সম্পর্কিত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। রূপান্তর প্রক্রিয়া কোনোভাবেই নারী শ্রমিকদের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য যাতে নষ্ট না করে তা নিশ্চিত করা।

ঝ। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডসমূহ এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

- আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডসমূহ এবং ক্রেতাগণ রপ্তানিমুখি শিল্পে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ন্যায্য রূপান্তর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে এবং সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাবে। বিশেষ করে মিটিগেশন এবং অভিযোজন পরিকল্পনায় মানবাধিকার এবং পরিবেশগত ডিউ ডিলিজেন্সের বিষয়সমূহ প্রধান্য দিয়ে শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার রূপরেখা তৈরি করা।
- ব্র্যান্ডসমূহ, প্রধান রপ্তানি গন্তব্যের দেশসমূহ ও অঞ্চলসমূহ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি যারা রপ্তানিমুখি শিল্পে টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎসাহিত করে তাদের উচিত হবে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের অংশ হিসেবে রূপান্তরকালীন সময়ের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প প্রণয়নে কারিগরি ও আর্থিকভাবে ভূমিকা রাখা।

ঞ। সবুজ রূপান্তর নির্দেশিকা

- বাংলাদেশের যে কোনো খাতে পরিবেশবান্ধব শিল্প বা সবুজ রূপান্তর বা অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের মতো যে কোনো পরিবর্তন প্রক্রিয়ায়, তা প্রযুক্তিগত অভিযোজন হোক বা ডিজিটালাইজেশন হোক বা অটোমেশন হোক বা রোবটের ব্যবহার বিষয়ে হোক,যাতে ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় এজন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তর কাঠামো তৈরি এবং ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি মেনে ন্যায়বিচারকে অবশ্যই জলবায়ু সংকট মোকাবেলার যে কোনো উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা।
- ন্যায্য রূপান্তর বিষয়ক যে কোনো নীতি বা কাঠামো প্রণয়ন এবং অনুশীলনে ডিসেন্ট ওয়ার্ক এজেন্ডার চারটি মূল স্তম্ভকে (কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক সংলাপ) অনুসরণ করা।
- শিল্পে ন্যায্য রূপান্তরসহ যে কোনো রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সংলাপ, কার্যকর অংশীদারিত্ব এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সবুজ রূপান্তর বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রতিটি উদ্যোগ অবশ্যই পূর্বপরিকল্পিত হতে হবে এবং চাকরি নিরাপত্তার বিষয়টিকে যে কোনো শিল্পের ন্যায্য রূপান্তর বিষয়ক যাবতীয় নীতি এবং কার্যক্রমের কেন্দ্রে স্থান দেওয়া। পর্যাপ্ত নীতি এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করে রূপান্তরকালীন সময়ে চাকরির সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাতে করে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় কর্মহীনতা বা বেকারত্ব তৈরি না হয়। রূপান্তরকালীন সময়ে এবং পরবর্তী কালে শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

- সবুজ কারখানার সার্টিফিকেশনের মূল্যায়ন কেবল অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও পরিবেশবান্ধব নকশার ওপর সীমাবদ্ধ না রেখে কারখানাগুলির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও নির্দেশিকার আইনি পরিপালনকেও অন্তর্ভুক্ত করা। কোনো কারখানাকে সবুজ কারখানা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কারখানার মানবাধিকার ও শ্রমমানের অবস্থা, সবুজায়নের ফলে শ্রমিকদের ওপর প্রভাব এবং পরিবেশগত দিকসমূহ খতিয়ে দেখতে হবে।

৫.৩ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরকারি ক্রয় ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি

ক। আইএলও কোর কনভেনশন অনুসারে মৌলিক শ্রমিক অধিকারের পাশাপাশি, সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ন্যায্য মজুরি ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার এবং বিশেষ করে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক ন্যায্য রূপান্তরের নীতিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড প্রণয়ন করা।

খ। সরকারি ক্রয় ও বিনিয়োগ নীতিতে সামাজিক শর্ত সংযোজন: সকল ধরনের সরকারি প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে (Public Procurement) ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড বাধ্যতামূলক মেনে চলার নীতি বা শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা। শুধুমাত্র সেইসব কোম্পানিকে সরকারি টেন্ডার বা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যারা শ্রম আইন, মানবাধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা নীতি মেনে চলে।

গ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তিতে সামাজিক শর্ত সংযুক্ত করা: বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা যাতে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘন না হয়। এ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স নির্দেশনা বা সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দেশভিত্তিক বাধ্যতামূলক আইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট সাপ্লাই চেইন সংক্রান্ত আইন মেনে চলার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ। ঋণের শর্ত হিসেবে সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড সংযুক্তি: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়িক ঋণ প্রদান করার আগে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড বাধ্যতামূলক মেনে চলার শর্ত আরোপ করতে পারে। এর ফলে এক দিকে যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকবে একই সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করবে।

ঙ। কোম্পানি নিবন্ধন/নিবন্ধন হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় সামাজিক শর্ত আরোপ: সরকারের ব্যবসার নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সামাজিক শর্ত মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিগুলি শ্রমিক অধিকার, মানবাধিকার ও টেকসই পরিবেশের বিধানগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। একই সাথে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির সামাজিক শর্ত মেনে চলার বিষয়টি মূল্যায়নপূর্বক নিবন্ধন হালনাগাদ করার শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। এর ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে শ্রমিক অধিকার, মানবাধিকার ও টেকসই পরিবেশের বিধানগুলি মেনে চলতে সচেষ্ট থাকবে।

চ। কর ছাড় সুবিধায় সামাজিক শর্ত মানদণ্ড প্রয়োগ: বাংলাদেশ সরকারের কর ছাড় নীতিমালায় বিদ্যমান শর্তের পাশাপাশি সামাজিক শর্তসমূহ আরোপ করা যেতে পারে যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা চালুকরণের পাশাপাশি শিল্পে বা ব্যবসায় সামাজিক শর্ত মানদণ্ড মেনে চলতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নও নিশ্চিত হবে যা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একই সাথে শতভাগ সামাজিক শর্ত মেনে চলা প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত কর ছাড় সুবিধাও প্রধান করা যেতে পারে।

ছ। সরকারি প্রণোদনা লাভে সামাজিক শর্ত পালন: সরকারি প্রণোদনা (Government Incentives) লাভে সামাজিক শর্ত আরোপ করার মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণ, পরিবেশ সুরক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। এই শর্তগুলি সরকারি প্রণোদনার সাথে সংযুক্ত করার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং প্রযুক্তি ও উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নত করতে উৎসাহিত করা যাবে।

জ। বসতবাড়ি বা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ অনুমোদনে সামাজিক শর্ত: বসতবাড়ি বা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় সরকার কাঠামো বা প্রশাসনের মাধ্যমে যে অনুমোদন প্রয়োজন হয় সেই নীতিমালায় সামজিক শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক যে ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে সামাজিক শর্ত মেনে চলার প্রচলন নিশ্চিত করতে পারলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৬ বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীদের অধিকার ও কল্যাণে সংস্কার প্রস্তাবনা

৬.১ লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রান্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.১.১ নারী শ্রমিক

নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত কর্মজগতে তাদের লিঙ্গভিত্তিক ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে বিবিধ বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে, কর্মসংস্থানে এবং পদোন্নতির সুযোগে নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত; একই কাজে পুরুষদের থেকে নারীরা কম বেতন পান; নারীর জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুরক্ষা এখনো অপর্যাপ্ত; যৌথ দর কষাকষি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় নারীর প্রতিনিধিত্ব কম; কর্মক্ষেত্রের ভেতরে বাইরে সর্বত্র নারীরা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানির শিকার হন; নারীবান্ধব অবকাঠামোর অভাব, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানের ঘাটতি এবং নারীর ঘরে-বাইরের কাজের চাপ তাদের জীবনের নিয়মিত বাস্তবতা। এসকল বাধা এবং সংকট নারীকে ক্রমাগত প্রান্তিক করে, যার ফলে কর্মে নিয়োজিত নারীদের ঝুঁকিপূর্ণ ও স্বল্প বেতনের কাজে অংশগ্রহণের হার বেড়েছে।

এই বাস্তবতার আলোকে বৈষম্য দূর করা, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা নিশ্চিত করা এবং ন্যায্য ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশে নাগরিক হিসেবে নারী শ্রমিকদের পূর্ণ অংশগ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্ন-লিখিত প্রস্তাব করছে।

প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, সামাজিক অপমানের ভয়, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং সহায়তা নেটওয়ার্কের অভাব নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি খাতে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[30] রপ্তানিমুখি পোশাক খাতের মতো ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক নারী কাজ করলেও ব্যবস্থাপনায় পুরুষের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায় এবং উচ্চপর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম।[31] সরকারি চাকরিতে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা মাত্র ২৯.৩ শতাংশ।[32]

দেশের সংবিধান জনজীবনে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করলেও নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতা না থাকলে নারীর অধিকার অর্জন সহজ হবে না। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৫ নারীর ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেয় এবং বাংলাদেশ বেইজিং ঘোষণা (Beijing Declaration and Platform for Action, 1995) এবং CEDAW-এর মতো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে লিঙ্গসমতা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণতান্ত্রিক সমাজে জনসংখ্যার প্রতিটি অংশের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি।

নারী শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা নিশ্চিত করবার জন্য শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে সামাজিক সংলাপ, যৌথ দরকষাকষি বা শিল্প সম্পর্কিত যে কোনো শ্রমিক প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ন্যায্যতার ভিত্তিতে নারীর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সকল পর্যায়ের কমিটিতে আনুপাতিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা।

গ) যৌথ দরকষাকষি ও দাবিনামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারী নেতৃবৃন্দের মতামত ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়া।

ঘ) ফেডারেশনগুলির মধ্যে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নারী নেতৃত্ব সহ কার্যকর হয়রানি-বিরোধী কমিটি গঠন করা।

---

[30] Moyeen, Sabah et al. (2022).

[31] Macchiavello, Rocco, Menzel, Andreas, Rabbani, Atonu & Woodruf, Christopher. (2020). Challenges of Change: An Experiment Promoting Women to Managerial Roles in the Bangladeshi Garment Sector; Chaumtoli Huq (2019) "Women's Empowerment" in the Bangladesh Garment Industry through Labor Organizing.

[32] The Financial Express. (July 8, 2023). Number of women joining government jobs increasing gradually.

ঙ) নারী নেতৃত্বের বিকাশে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারের শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রমে নারী নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা।

চ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর জন্য গৃহীত সরকারি বিভিন্ন স্কিম ও প্রণোদনা বণ্টন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ৮৯-৯৯ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর সম্পর্কিত নির্দেশিকাগুলির আওতায় বিভিন্ন কল্যাণ সুবিধার বিধান রয়েছে, যা নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর মধ্যে কর্মস্থলে দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা এবং নির্ধারিত স্তন্যপান কক্ষ, নারী পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা এবং নারী এমবিবিএস ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মী বিশেষ করে ৫,০০০-এর বেশি শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হলে সেখানে গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[33] তবে এই বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন ও তদারকি অত্যন্ত দুর্বল,[34]

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৩টি সরকার পরিচালিত কমিউনিটি-ভিত্তিক দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১০০টির বেশি বেসরকারি কেন্দ্র এবং এনজিও পরিচালিত কিছু কমিউনিটি-ভিত্তিক কেন্দ্র রয়েছে।[35] তবে বেশিরভাগ বেসরকারি দিবাযত্ন কেন্দ্র নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। পাশাপাশি পর্যাপ্ত কেন্দ্রের অভাব, প্রশিক্ষিত যত্নকর্মীর সংকট, নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু লালনপালন বিষয়ে প্রচলিত নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই সেবার গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকর বাস্তবায়ন সীমিত হয়ে পড়েছে।[36]

নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সকল কর্মক্ষেত্রে ব্রেস্টফিডিং কর্নারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটি-ভিত্তিক, স্বল্পমূল্যে ও ভর্তুকির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যান্টিন এবং লন্ড্রি ও কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) শ্রমঘন এলাকায় এবং কর্মক্ষেত্রে কার্যকর ও বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু/কিশোরদের জন্য নিরাপদ অবস্থান ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই সুবিধাগুলির ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিবাযত্ন কেন্দ্র ও শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে 'ডিআইএফই'র পরিদর্শকদের সম্পৃক্ত করা।

ঙ) কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সংখ্যানুপাতে পৃথক ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা। প্রতিটি শৌচাগারে ঢাকনাযুক্ত আবর্জনার ঝুড়ি ও ধৌতকরণের পৃথক জায়গা রাখা।

চ) কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের মাসিককালীন জরুরি প্রয়োজন মেটাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।

ছ) কর্মক্ষেত্রে স্থাপিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নারী ডাক্তার ও নার্সের পাশাপাশি নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জ) নারী শ্রমিকদের জন্য নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি 'নিরাপত্তা কমিটি'র আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি এই কমিটিতে নারীদের সমানুপাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

---

[33] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (ধারা ৮৯-৯৯); বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫, (৭৭, ৭৮, ৮৬, ৯৪, ৯৫)

[34] Akhter, S., Rutherford, S. & Chu, C. (2019).. Exploring the system capacity to meet occupational health and safety needs: the case of the ready-made garment industry in Bangladesh; Syed, R.F., Mahmud, K.T. & Karim, R. (2024) Do Labour Welfare Policies Matter for Workers? Evidence from the Garment Supply Chain Industry in Bangladesh.

[35] ILO (2024) Government of Bangladesh launch Roadmap for Childcare in Bangladesh.

[36] Taş, E. O., & Ahmed, T. (2024); Elsey, H. et al. (2020); Zhang, J. et al. (2020) What drives parents to consider center-based child care for their children? The case of Bangladesh; Rahman, Tashmina; Arnold, Tamara; Shams, Farzana & Rahman, Mokhlesur (2022) Raising the Quality of Child Caregiving in Bangladesh.

ঝ) রাত্রিকালীন কাজে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের লিখিত সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং নারীদের রাতে নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য কর্মস্থল থেকে পরিবহণ সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঞ) দেশের জেলা শহরসমূহে সরকারিভাবে কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে নিম্ন আয়ের নারী শ্রমিকের জন্য আবাসিক কলোনি স্থাপন করা।

ট) নারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার কর্মজীবী নারীদের ভিন্ন চাহিদা বিবেচনায় রেখে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি নারীবান্ধব নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে নারী-বান্ধব পরিবহণ, পর্যাপ্ত আলোযুক্ত স্টপেজ স্থাপন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর করা।

কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা

কলকারখানাসহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জীবিকা নির্বাহের কাজের পাশাপাশি সমাজ নারীর কাঁধে ঘর-গেরস্থালীর কাজও চাপিয়ে দেয়। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে গৃহস্থালির কাজ, শিশু পালন, বয়স্ক ও অসুস্থদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব প্রধানত নারীদের ওপর অর্পিত হয়, যা কেবল তাদের পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করে না, বরং তাদের উপর চাপায় দ্বৈত বোঝা। ফলে নাগরিক হিসাবে কিংবা দক্ষ শ্রমিক হিসাবে ভূমিকা রাখা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ কঠিন করে তোলে।[37]

নারী শ্রমিকদের দ্বৈত কাজের বোঝা থেকে রক্ষায় শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য বিরতি ব্যতীত সর্বোচ্চ আট ঘণ্টার কর্মদিবস এবং সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি সহ অন্যান্য ছুটি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) মাধ্যমে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা। মাতৃত্বকালীন ছুটির পর পুনরায় কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের জন্য ছয় মাসের নমনীয় কর্মঘণ্টা প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা।

খ) প্রাতিষ্ঠনিক শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠান-কারখানায় ডে কেয়ার ও কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক ডেকেয়ার, স্বল্পমূল্যে ও ভর্তুকির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যান্টিন এবং লন্ড্রি ও কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক সান্ধ্যকালীন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঘ) শ্রমিক এলাকায় শিশুদের সরকারি স্কুল, বিনোদনের স্থান এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষা স্কুল গঠনে সরকারের ভূমিকা নেয়া।

ঙ) আইএলও কনভেনশন ১৫৬ (C156 - Workers with Family Responsibilities Convention, 1981) অনুযায়ী শ্রম আইনে সংশোধনী আনার বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ নেয়া।

নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন

নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো উচ্চশিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কোর্সে তাদের কম অংশগ্রহণ, যা দক্ষতা উন্নয়নে বড় বাধা সৃষ্টি করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, স্বয়ংক্রিয়তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক নারী চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। অথচ এই ঝুঁকি মোকাবিলায় দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনঃদক্ষতা অর্জনের উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ও চাকরির বিজ্ঞপ্তি নারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কোনো কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের অনুপস্থিতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ফলে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন চাকরিতে নারীদের অংশগ্রহণ হ্রাস পাচ্ছে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

---

[37] Time Use Survey ২০২১- প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে অবৈতনিক সেবা ও গৃহস্থালি শ্রমের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান—পরিচর্যা ও গৃহস্থালির কাজে নারীরা ৫.৯ ঘণ্টা এবং পুরুষরা ০.৮ ঘণ্টা ব্যয় করেন। অর্থাৎ নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ৭.৩ গুণ বেশি সময় ব্যয় করেন। অন্যদিকে, পুরুষরা ৬.১ ঘণ্টা সময় বৈতনিক কাজের জন্য ব্যয় করেন, যেখানে নারীরা মাত্র ১.২ ঘণ্টা সময় বৈতনিক কাজের জন্য ব্যয় করেন। এক্ষেত্রে পুরুষের নারীদের তুলনায় বৈতনিক কাজে অংশগ্রহণ ৫ গুণ বেশি। BBS & UN Women Bangladesh (2022) Time Use Survey 2021

ক) প্রস্তাবিত তথ্য ভান্ডারে বাংলাদেশের সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা এবং এই তথ্যভাণ্ডার সম্পর্কে নারী শ্রমিকদের অবহিত করার জন্য কার্যকর প্রচারণা চালানো।

খ) নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কার্যকর যোগাযোগ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, নেতৃত্ব ও পরিচালনার মতো সামাজিক দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) বিকল্প কর্মসংস্থান যেমন কেয়ার সেক্টর, গিগ ইকোনোমি, প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা খাত ও ফ্রিলান্সিংয়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেন্টারগুলিতে নারীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ হোস্টেল সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঙ) বিদেশে কর্মসংস্থানের চাহিদাসম্পন্ন সেক্টর (যেমন কেয়ারগিভার, নার্সিং) এর উপর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রযুক্তি, প্রকৌশল, ড্রাইভিং ও ব্যবস্থাপনার মতো পুরুষ-প্রধান দক্ষতাভিত্তিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশাপাশি চাকরির সুযোগ তৈরির জন্য নিয়োগ অভিযান, চাকরি মেলা আয়োজন এবং নারীদের অংশগ্রহণ কম এমন খাতগুলিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঝ) STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) বিষয়ে নারীদের উৎসাহিত করতে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় প্রোগ্রাম, বিশেষ স্কলারশিপ, পেশাদারী প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষানবিস সুযোগ প্রদান করা। স্কুলে ছাত্রীদের STEM-এ উৎসাহিত করতে, বর্তমানে সফল STEM-এ নিয়োজিত নারীদের ইতিবাচক উদাহরণ তুলে ধরা এবং মেন্টরশিপের ব্যবস্থা করা।

ঞ) চলমান জাতীয় চাকরি বাতায়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি নারীদের এটি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।

৬.১.২ তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠী

হিজড়া জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাদের জীবনধারা এবং সামাজিক পরিচয়ে এক ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। ২০১৪ সালে ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার হিজড়া জনগোষ্ঠীকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে যা তাদের জন্য বিশেষ কিছু অধিকার যেমন ভোটাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা এবং সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।[38] তবে এর বাস্তবায়ন তেমন কার্যকরী হয়নি। এ প্রেক্ষিতে এই কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) দেশের তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যে কোনও উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে তাঁদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা ও পরিচয়পত্র প্রদান করা।

খ) যথাযথ দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীকে মূলধারার কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্তি ও জীবনমান উন্নয়নে সঠিক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তাদের মতামত এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) হিজড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তাদের জন্য সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিসর বৃদ্ধি করা।

ঘ) তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা বিনোদনের সুব্যবস্থা থাকবে।

---

[38] হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
https://dss.gov.bd/site/page/e3108b96-8e64-4fb4-be8e- / হিজড়া-জনগোষ্ঠীর-উন্নয়ন

৬.১.৩ যুব শ্রম জনগোষ্ঠী

যুব জনগোষ্ঠী যে কোনো দেশের সম্পদ, দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বর্তমানে দেশে শিক্ষিত বেকারত্বের হার অনেক বেশি (৪৭ শতাংশ)। এর অন্যতম কারণ হল প্রয়োজনের তুলনায় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা। প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ মানুষ দেশের শ্রমশক্তিতে যুক্ত হচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা সীমিত।

এই কমিশন মনে করে যে মানসম্মত শিক্ষার অভাব, শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয়হীনতা, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ঘাটতি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের অভাবে দেশের সম্ভাবনাময় যুবজনগোষ্ঠী দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হতে পারছে না এবং এর ফলে দেশ 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট'-এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বিষয়ে কমিশন সুপারিশগুলি হলো:

ক) সরকারি বিভিন্ন দলিলে (যেমন শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২, জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ এবং জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২) যুবকদের সংজ্ঞায় বয়সের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভিন্নতা দূর করে যুবকদের একটি একক সংজ্ঞা (নির্ধারিত বয়স) প্রদান করা।

খ) শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে না থাকা তরুণদের জন্য (NEET) একটি লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষানবিস ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা। এই কর্মসূচি শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হবে, যাতে তরুণরা উচ্চ-বৃদ্ধি খাতগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।

গ) যুবকদের STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় প্রোগ্রাম চালুকরণ, যার মধ্যে স্কলারশিপ, পেশাদারি প্রশিক্ষণ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিল্পখাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে STEM স্নাতকদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলি বর্তমান বাজারের চাহিদার সাথে মিলিয়ে নির্ধারণ করা।

ঘ) কর্মের গুরুত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা। যেমন; পাঠ্যক্রমে কর্মনৈতিক (work ethics) নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা, বিভিন্ন আয়ের শ্রেণির পেশাজীবীদের দিয়ে অতিথি বক্তৃতার আয়োজন, পিতামাতাদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা শিশুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীদের পেশাজীবীদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করে যুবদের গঠনমূলক কাজে যুক্ত করা।

ঙ) শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষানবিস ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা, যাতে তরুণরা উচ্চ-বৃদ্ধি খাতগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।

৬.১.৪ প্রবীণ শ্রম জনগোষ্ঠী

জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ অনুসারে বর্তমানে দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী[39] রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৭ হাজার,[40] যাদের ৩৬.৫৬ শতাংশ এখনো কোনো না কোনো উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত আছেন।[41] দেশের লক্ষ লক্ষ প্রবীণ কৃষিকাজ, দিন মজুরি বা রিকশা চালানোর মত অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত আছেন। যদিও বয়সজনিত শারীরিক সমস্যা, দুর্বলতার কারণে তাদের জন্য কাজ করা কঠিন। তবু প্রয়োজনের তাগিদে এখনও কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। দেশের বেশিরভাগ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য তেমন কোনো সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। কমিশন মনে করে যে, রাষ্ট্রকেই এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বিনোদন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক, অস্থায়ী এবং স্বনিয়োজিত কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর অবসরের বয়স নির্ধারণ করে তাঁদের অবসরকালীন ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা। এক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণে 'জাতীয় প্রবীণ

---

39 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা' ২০১৩ এ ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

40 বিবিএস, জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ প্রাথমিক প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা: ২০২২।
https://sid.portal.gov.bd/sites/default/files/files/sid.portal.gov.bd/publications/01ad1ffe_cfef_4811_af97_594b6c64d7c3/PHC_Preliminary_Report_(English)_August_2022.pdf

41 বিবিএস, শ্রম শক্তি জরিপ ২০২২, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা: ২০২৩।

নীতিমালা ২০১৩' বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। এ নীতিমালা অনুযায়ী ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

খ) কাজে নিয়োজিত নন এমন দরিদ্র প্রবীণ শ্রম জনগোষ্ঠীকে বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের দৈনন্দিন চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং অন্যান্য চাহিদা) বিবেচনায় বয়স্ক ভাতার পরিমাণ যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা। বর্তমানে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির বয়সসীমা পুরুষদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬৫ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর নির্ধারণ করা আছে। যেহেতু জাতীয় প্রবীণ নীতিমালায় ৬০ বছর বয়সীদের প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সেই দিক বিবেচনায় বয়স্ক ভাতায় অন্তর্ভুক্তির ন্যূনতম বয়স ৬০ বছর নির্ধারণ করা।

গ) অবসর পূর্ব মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে অবসর পরবর্তী কালে প্রবীণদের সামাজিক সম্পৃক্ততা ও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে অবসর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত সামর্থ্য ও বয়স বিবেচনা করে স্ব স্ব গ্রাম ও শহর এলাকায় তাঁদের এমন কাজে যুক্ত করা বা উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা যাতে তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নতুন প্রজন্মের সাথে বিনিময় ও স্থানান্তর করতে পারে। এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম উৎসাহিত ও জোরদার করা। আগ্রহী প্রবীণ ব্যক্তির স্বকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে সুদমুক্ত বা স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য বিমা প্রণয়ন করা বা সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা চালু করা। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রবীণ ব্যক্তিগণ যাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত চিকিৎসা পেতে পারেন এজন্য পৃথক কাউন্টার ও ওয়ার্ড স্থাপন করা এবং তাঁদের চিকিৎসার সুবিধার্থে 'হেলথ সার্ভিস কার্ড' চালু করা।

৬.১.৫ আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী

আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী মূলত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং দেশের উন্নয়নের সামগ্রিক সুবিধা থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত।[42] এ সকল জনগোষ্ঠীর অধিকারের বিষয় কিছু রাষ্ট্রীয় নীতি কাঠামোয় প্রতিফলিত হলেও নীতিগত প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করার উদ্যোগ খুবই সীমিত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুসমর্থন করেনি।

আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই তারা দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় পিছিয়ে আছে। যদিও বেশিরভাগ আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী (প্রায় ৭৫ %) কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত আছেন তবে তাদের অংশগ্রহণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বেশি (৮৯.৮৪%)[43] যেখানে মজুরি কম এবং কোনো সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী কর্মক্ষম জনসংখ্যার মাত্র ২.৬৪ শতাংশ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে ২.৭৯ শতাংশ পুরুষ এবং ২.৫ শতাংশ মহিলা।[44] যে কারণে আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগণ কম মজুরিতে অদক্ষ কাজে শ্রম দিতে বাধ্য হন।

আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও ন্যায্য অধিকার সুরক্ষায় কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ:

ক) আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুসমর্থন করা এবং আইন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন বৈষম্য বিলোপ আইন চূড়ান্ত করে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ) আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিক সহ সকল সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরা যাতে তাদের বৃহৎ উৎসবের সময় ছুটি ভোগ করতে পারেন, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা শ্রম আইন ও বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

---

[42] Kazi Ali Toufique et al., Baseline Assessment of Skills and Employment of Indigenous and Tribal Peoples in Bangladesh, BIDS and ILO, Dhaka: 2017.Retrieved from: https://www.ilo.org/publications/baseline-assessment-skills-and-employment-indigenous-and-tribal-peoples

[43] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১০৮।

[44] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১১৬।

গ) জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদানে তাদের ভোগকৃত ভূমি দখল বন্ধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারি উদ্যোগে তাদেরকে উপযুক্ত পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বিশেষ করে স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার যুবকদের ট্যুরিজম শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ঘ) বর্তমানে সরকারি চাকরিতে আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী জন্য ১ শতাংশ কোটা বহাল আছে। ক্ষুদ্র আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে সকল সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে তাদের জন্য কোটা যৌক্তিকীকরণ করে সংরক্ষণ করা।

ঙ) আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর বংশ পরম্পরায় চলে আসা কুটির শিল্প টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারিভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসের মাধ্যমে আদিবাসীদের কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সাথে উদ্যোক্তা হিসাবে নানা প্রণোদনা প্রদান, সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা এবং প্রয়োজনে তাদের জন্য পৃথক ব্যাংক ঋণ নীতিমালা গ্রহণ করা।

চ) আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও তৈরিকৃত পণ্য, যেমন; কৃষিপণ্য ও কুটির শিল্প সামগ্রীর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বাজার ব্যবস্থাপনায় তদারকি বৃদ্ধি সহ মধ্যস্বত্বভোগী ও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.১.৬ প্রতিবন্ধী শ্রম জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২.৮০ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধী, পুরুষের ক্ষেত্রে ৩.২৮ শতাংশ এবং নারীর ক্ষেত্রে ২.৩২ শতাংশ।[45] এ জনগোষ্ঠী শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত। তাদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি সীমিত, যার পেছনে রয়েছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ঘাটতি, বৈষম্য এবং অনুপযুক্ত কর্মপরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়ই বৈষম্যমূলক আচরণ, হয়রানি এবং সামাজিক উপহাসের শিকার যা তাদের মানসিক ও পেশাগত অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব তাদের অংশগ্রহণ সীমিত করে দেয়। প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সুযোগও খুবই সীমিত; মাত্র ২.৬৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা প্রধানত কম্পিউটার, তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (UNCRPD), যেটি বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে, প্রতিবন্ধিতাকে একটি বৈচিত্র্যময় মানবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করে সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়। তবে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও সুরক্ষা বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেই, ফলে তারা শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যূনতম সুরক্ষাও পান না। এ পরিস্থিতে কমিশনের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রতিবন্ধী শ্রমিকের সংজ্ঞা শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিবন্ধী শ্রমিকের অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও সুরক্ষা, নারী প্রতিবন্ধীদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত বিধান সম্বলিত একটি অধ্যায় শ্রম আইনে সংযুক্ত করা। এক্ষেত্রে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যেমন; প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার রাখেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের সাথে কোনো ধরনের কোনও বৈষম্য করা যাবে না, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ করে নারী প্রতিবন্ধীদের বিষয় বিবেচনা করে সবার জন্য সঠিক সুযোগ সুবিধা ও সমতা নিশ্চিত করা, তাঁদের 'প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা' (reasonable accommodation) প্রাপ্তির অধিকার, দক্ষতা প্রশিক্ষণ — এ সমস্ত বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লিঙ্গভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি করা, যাতে সেই ডাটাবেজ অনুসরণ করে লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনায় তাদের কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ তৈরি করা যায়। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রসারিত করা।

[45] বিবিএস, জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ (এনএসপিডি) প্রতিবেদন ২০২১, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ , পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২।

বিশ্ববাজারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের চাহিদা জরিপ করে সে অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ প্রতিবন্ধী বান্ধব করা।

গ) সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা।

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করতে প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাদের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিতে পারে, যেমন; সুদমুক্ত বা স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান। বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করা।

ঙ) প্রতিটি কর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধার্থে সব ধরনের গণপরিবহণ, যেমন; মেট্রোরেল, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার প্রতিবন্ধী বান্ধব করা। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য কারখানা বা ভবন নির্মাণে Building Construction Act, 1952 এবং তার অধীন বিধি অনুসরণ করা, যেমন; লিফট, র‍্যাম্প সুবিধা থাকা। গণপরিবহণে প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন অনুযায়ী মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করা।

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট জনবলের ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী হলে বার্ষিক করের ৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং এ বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করা।

৬.১.৭ অভিবাসী শ্রমিক

বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বাংলাদেশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসী শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য অবদান বিবেচনা করে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের অধিকার, কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিন্তে বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তবে এসব আইন ও নীতিমালাসমূহ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ দুর্বলতা রয়েছে। যেমন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেসরকারি নিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার দিক নির্দেশনা থাকলেও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ খরচ বা শোষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এছাড়াও অভিবাসী শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি, অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা, বৈদেশিক শ্রমবাজারের সম্প্রসারণ, অভিবাসী শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণ এবং ট্রেড ইউনিয়নে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত নানাবিধ চ্যালেঞ্জ সামগ্রিক উন্নয়নের অন্তরায়।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া বেশ অস্বচ্ছ এবং শোষণমূলক। কোন দেশে এবং কোন খাতে বৈধভাবে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে; সেই দেশের অভিবাসন ব্যয় কতো হবে; কর্মচুক্তি, কর্মক্ষেত্র, কর্মঘণ্টা, মজুরি, ওভারটাইম, সাপ্তাহিক ছুটি, চিকিৎসা খরচ, থাকা-খাওয়ার খরচ এবং প্রাক-বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে থাকে না। কোথা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে; কীভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে; কীভাবে ব্যাংক থেকে ঋণের আবেদন করতে হবে এসব তথ্যও তাদের জন্য সহজলভ্য নয়।

এ ছাড়াও পেশাভিত্তিক দক্ষতার অভাব এবং গন্তব্য দেশের আইন-কানুন, সমাজের নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা বিভন্ন সময়ে স্থানীয় সাব-এজেন্ট বা মধ্যসত্ত্বভোগীর শরণাপন্ন হন। আর এসব মধ্যসত্ত্বভোগীদের কাছে টাকা দিয়ে, তাদের নির্দেশনা মতো পাসপোর্ট করা থেকে শুরু করে গন্তব্যদেশে যাওয়া পর্যন্ত পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ফলে বাংলাদেশিদের অভিবাসন ব্যয় পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের তুলনায় ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি হয়। অভিবাসন বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি সঠিক তথ্য না থাকার কারণে শ্রমিকেরা সঠিক চাকরি ও ন্যায্য মজুরিসহ কর্মক্ষেত্রের সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা-২০২৫ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা-২০২০ বাস্তবায়ন করা, যাতে করে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। প্রতি বছর এই শ্রেণিবিভাগ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, যাতে বিদেশগমন প্রত্যাশী অভিবাসী শ্রমিকেরা সঠিক তথ্য পেতে পারেন।

খ) যে সকল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি গন্তব্যদেশের নিয়োগকর্তার সাথে দীর্ঘকালীন সরাসরি সম্পর্কের দালিলিক প্রমাণ দেখাতে পারবে এবং যাঁদের বিরুদ্ধে বিগত ৫ বছরে কোনো প্রকার অভিযোগ নেই, তাঁদেরকে দ্রুততার সাথে 'এক্সপ্রেস' পদ্ধতিতে অভিবাসনের সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করার অনুমতি প্রদান করা।

গ) মেডিকেল, পাসপোর্ট, বিমান টিকেট (স্পেশাল লেবার ফেয়ারসহ), এয়ারপোর্ট সার্ভিস সহ যাবতীয় প্রক্রিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকের জন্য স্পেশাল সার্ভিস প্রদান করা। প্রবাসী শ্রমিকদের ভিসা এবং বিএমইটি ছাড়পত্র থাকা সাপেক্ষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের হ্রাসকৃত মূল্যে টিকেট প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা।

ঘ) সরকারিভাবে অভিবাসন ব্যয়ের স্বচ্ছ তালিকা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা এবং তদারকি জোরদার করা।

ঙ) 'ডিজিটাল কমপ্লেইন সিস্টেম' প্রবর্তন করা যাতে অভিযোগকারীরা ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অভিযোগের অবস্থা জানতে পারে।

চ) অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভিসা বাণিজ্য ও অবৈধ এজেন্সিগুলির কার্যক্রম বন্ধ করতে আইনি উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং মধ্যসত্ত্বভোগী বা সাব এজেন্টদেরকে জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মধ্যে আনা। বিদেশ গমনকালে প্রত্যেক কর্মীর বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন ফি, রিক্রুটিং এজেন্সির এককালীন জামানত এবং করিডোর স্প্যাসিফিক (নির্দিষ্ট দেশ, যেমন, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব ইত্যাদি) জামানত যৌক্তিক হারে কমানো।

ছ) সরকার কর্তৃক গৃহীত রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের শ্রেণিবিন্যাস বিধি অনুযায়ী এজেন্সিগুলির সম্ভাব্য গন্তব্যদেশে মার্কেটিং ও প্রোমোশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ পন্থায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের ব্যবস্থা রাখা, যাতে করে এজেন্সিগুলির মধ্যে নিয়মিত নিয়োগের প্রতিযোগিতা তৈরি হয় এবং যে কোনো ধরনের বিদ্যমান অবৈধ অর্থ প্রেরণের প্রবণতা হ্রাস পায়।

জ) শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত চুক্তিতে সমঝোতা চুক্তির পরিবর্তে 'দ্বিপাক্ষিক চুক্তি' স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং যে কোনো চুক্তির আগে সকল স্টেকহোল্ডার ও রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির সাথে পরামর্শক্রমে চুক্তির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা এবং চুক্তিসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

ঝ) অভিবাসন প্রক্রিয়া ও ভিসা সংক্রান্ত সকল তথ্য সহজলভ্য করা। মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রা'র ওয়েবসাইটে অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ (যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া) সহজভাবে পরিবেশন করা।

ঞ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ ও সংশোধনী-২০২৩, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী অধ্যাদেশ-২০২৪ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন-২০১৮ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৭, আন্তর্জাতিক অনুসমর্থনকৃত সনদ The UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families-1990 এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা।

ট) সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক অনুসমর্থনকৃত সনদ The UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families-1990 এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

ঠ) অভিবাসন ইচ্ছুক শ্রমিকের জন্য বিদ্যমান ডাটাবেজকে শ্রমিকের দক্ষতা ও সার্টিফিকেশন সহ প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে নিয়মিত আপডেট করার মাধ্যমে একটি কার্যকরী ডাটাবেজে উন্নীত করা, যাতে করে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলি ডাটাবেজ ব্যবহার করে কর্মী নির্বাচন করতে পারে।

ড) শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইএলও'র আর্ন্তজাতিক সনদের অনুসমর্থন করা।

অভিবাসী শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের দক্ষতার চাহিদার সাথে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো একটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিলে বা দক্ষতা অর্জন করলে গন্তব্য দেশে এর স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, ফলে বৈদেশিক শ্রমবাজারে তিনি অদক্ষ শ্রমিক হিসেবেই বিবেচিত হন। অন্যদিকে বিদেশি ভাষাজ্ঞান না থাকার কারণে গন্তব্যদেশে ও কর্মক্ষেত্রে তারা অনেক ধরনের সমস্যা ও বৈষম্যের শিকার হন। অভিবাসন প্রত্যাশীদেরকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সারাদেশে বিএমইটি'র অধীনে ১১০টি টিটিসি স্থাপন করা হয়েছে, যদিও

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসকল ট্রেনিং সেন্টার থেকে বিদেশে চাকরি পাবার সংখ্যা খুবই কম। উপরন্তু, এসকল সেন্টারের প্রশিক্ষণ মান নিয়েও জনমনে শংকা বিদ্যমান।

চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতা ও ভাষাগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকরা উচ্চ বেতন, উন্নত কাজের পরিবেশ, ভালো কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। আবার, অনেকেই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা দক্ষতা অনুযায়ী কাজ পান না, যার ফলে তাদের আয় ও নিরাপত্তা প্রভাবিত হয়, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে দেশে ফিরে আসার পর তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে না পারার ফলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, মাথাপিছু আয় কমে যায়। প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ না থাকার ফলে যাত্রাপথে, বিমানবন্দরে, এমনকি গন্তব্যদেশে অভিবাসী শ্রমিকরা নানারকম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন।

অভিবাসী শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বিএমইটি'র অধীনে ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)-সমূহের দক্ষতা ও কার্যকারীতাসমূহ মূল্যায়ন করা।

খ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে 'জব প্লেসমেন্ট' বাধ্যতামূলক করা ও তার প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং তদানুযায়ী সরকারের টিটিসিসমূহের বাজেট বরাদ্দ করা; 'শিক্ষানবিস (এপ্রেন্টনশিপ)' নিয়োগের জন্য ব্যক্তিখাতের মালিকপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারেও কাজের সুযোগ তৈরি করা।

গ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে ভাষা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ কোর্স প্রণয়ন করা এবং মান যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন করা।

ঘ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে 'আরপিএল', 'আপ-স্কিলিং' ও 'রি-স্কিলিং' প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের সঠিক কাজে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঙ) বিএমইটি হতে বৈদেশিক শ্রম বাজারের দক্ষতার চাহিদা মোতাবেক National Skill Development Authority-NSDA'র কাছে বিভিন্ন ট্রেডের জন্য Competency Standard-CS এবং Competency Based Learning Materials-CBLM প্রণয়ন ও প্রশিক্ষক তৈরি করা।

চ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদান এবং তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করা।

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; জনশক্তি,কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি); বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল); জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও); বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা); ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক; এবং গন্তব্যদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিস অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত বাজেটের অভাব সহ অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং জনবল সংকট রয়েছে। একই সাথে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে, আর রয়েছে কাজের দ্বৈততা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

গন্তব্যদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা হলো দূতাবাস ও শ্রম উইংস বা কনস্যুলেট অফিসগুলি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিবাসী শ্রমিকরা প্রত্যাশিত সেবা থেকে বঞ্চিত হন। অন্যদিকে অসুস্থ অভিবাসী শ্রমিকদের দেশে ফেরত আনা ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান; অভিবাসী শ্রমিকের মরদেহ দেশে ফেরত আনা সহ দাফন বাবদ অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড। অভিবাসী শ্রমিকের চাঁদায় গঠিত এই তহবিলের অপারেশন ব্যয় এবং আর অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য কল্যাণ কর্মসূচির ব্যয়ের আনুপাতিক হার নিয়েও রয়েছে অস্বচ্ছতা। উপরন্তু, বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতেও রয়েছে অভিবাসী কর্মী, শ্রমিক সংগঠন এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিত্বের অভাব। 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড'-এর কল্যাণমূলক কার্যক্রমেও রয়েছে সীমাবদ্ধতা। এসব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের যথাযথ প্রচারণা না থাকায় অভিবাসী শ্রমিকরা কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণ করতে পারছে না।

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সকল সংস্থাসমূহের 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস' অতি দ্রুত পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় করা; যাতে করে সকলের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত থাকে ও দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হয়। প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা।

খ) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য মানসম্মত 'প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ' প্রদান বাধ্যতামূলক করা; 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস'-এর মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা।

গ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ঋণ (বিশেষ করে প্রত্যাগতি অভিবাসীদের জন্য ঋণ) আবেদনের 'ডক্যুমেন্টেশন' ও 'প্রসেসিং' এ দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা ও অভিবাসন প্রত্যাশীদের অহেতুক হয়রানি বন্ধ করে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা এবং Key Performance Indicator 'কেপিআই' প্রবর্তন করা।

ঘ) লেবার এট্যাশেদেরকে সে দেশের বিদ্যমান 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বা এমওইউ' মোতাবেক 'জয়েন্ট কমিটি' সভার আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোনো চুক্তি না থাকলে সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এই বিষয়টি তাঁদের বছরভিত্তিক 'পারফরম্যান্স'-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঙ) দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ শাখার বছরওয়ারি প্রতিবেদন প্রকাশ করা। প্রত্যেক লেবার এট্যাশেকে বিদেশে মিশনের পোস্টিং শেষে দেশে ফিরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে কমপক্ষে ৩ বছর কাজ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চ) লেবার এট্যাশে কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বিশ্লেষণ করে মন্ত্রণালয়কে সম্ভাব্য বাজার ও পেশার তথ্য নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা।

ছ) দূতাবাস ও কনস্যুলার অফিসগুলিতে (লেবার উইংসহ) সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সর্বস্তরে সেবা নিশ্চিত করা। এই কাজের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রম অভিবাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে প্রাধান্য দেওয়া; প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে 'চুক্তিভিত্তিক' নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

জ) বিএমইটি, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, টিটিসি ও ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় করে এবং দ্বৈততা পরিহার করে এর কার্যক্রম বাড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসমূহকে সহজলভ্য করা।

ঝ) জেলা পর্যায়ে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, টিটিসি ও ওয়েলফেয়ার অফিসসমূহের কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারদের সহজে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অফিসসমূহ একই স্থানে/ভবনে স্থাপন করা।

ঞ) অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, সমস্যাবলি সরেজমিনে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা; তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রদান করা।

ট) বিদেশের মিশনগুলির শ্রম কল্যাণ উইংসগুলিকে অভিবাসী শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে প্রেরণ সহ নিয়োগকর্তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানে ভূমিকা রাখা।

অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা

প্রবাসে অধিকাংশ অভিবাসী শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। এসব শ্রমিকদেরকে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয় না। অনেক শ্রমিক আছেন, যারা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন, অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে তাদের কর্মঘণ্টা বেশি হয় এবং মজুরি কম হয়, চিকিৎসা সুবিধা ও অসুস্থতার সময় পর্যাপ্ত ছুটির ব্যবস্থা থাকে না। অনেকের স্বাস্থ্যবিমা না থাকায় চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হন। এছাড়াও বিদেশে কাজ করার সময় অভিবাসী শ্রমিকরা একাকিত্ব, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতার মতো মানসিক চাপের মুখোমুখি হন। কিন্তু এইসব সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা থাকে না। অন্যদিকে অসুস্থ (মানসিক ও শারীরিক) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য কোনো বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নেই।

অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষায় শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) ২০১৯ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিপত্র 'বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বিমা ব্যবস্থার' নিয়মিত মূল্যায়ন করা, যাতে করে প্রয়োজনবোধে বিমার কভারেজ, ব্যাপ্তি এবং উপকারভোগী বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

খ) 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড' ত্রিপক্ষীয় ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদের কাঠামো সংশোধন করা এবং বোর্ডে অভিবাসী কর্মীর প্রতিনিধিত্ব নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করা।

গ) আত্মহত্যা বা এইডস/এসটিডি বা অন্য কোনো কারণে কোনো প্রবাসী কর্মী বিদেশে মারা গেলে তার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ইন্স্যুরেন্স সুবিধা প্রদান করা।

ঘ) প্রত্যাগত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য 'রি-ইন্টিগ্রেশন' কর্মসূচি বোর্ডের 'অ্যালোকেশন অব বিজনেসস' নিয়মিত দায়িত্ব হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এজন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ করা।

ঙ) অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য গবেষণা ও অন্যান্য দেশের 'বেস্ট প্র্যাকটিসে'র ভিত্তিতে নতুন কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও সুরক্ষা স্কিম গ্রহণ করা।

চ) মন্ত্রণালয় হতে গন্তব্যদেশের সাথে 'দ্বিপাক্ষিক সামাজিক সুরক্ষা চুক্তি'র ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ছ) ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডে'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ এবং কেপিআই-এ এ বিষয়ে নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করা

নারী অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্ভোগ

প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে পুরুষদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিক আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন করে থাকেন। অভিবাসনকালে, গন্তব্যদেশে বা কর্মক্ষেত্রে নারীরা নানারকম শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হন। এমনকি পাচারের মতো ঘটনাও নারীদের সাথে বেশি ঘটে। অধিকাংশ নারী শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গৃহকর্মী হিসেবে যান। তাদের নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা ও ছুটি থাকে না। পাসপোর্ট ও মোবাইল আটকে রাখা, পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে না দেওয়া, বেতন না দেওয়া বা কম দেওয়া, যৌন নির্যাতন সহ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও নারী শ্রমিকদের সাথে ঘটে। একই কাজের জন্য একই রকম মজুরির বিধান থাকলেও নারী শ্রমিকদেরকে পুরুষদের চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। অন্যদিকে দেশে ফিরে আসার পর নারী শ্রমিকদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে হেনস্তা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়।

নারী অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্ভোগ দূরীকরণে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) নারী অভিবাসী শ্রমিকদের প্রেরণকারী ও গন্তব্য - দুই দেশেই ২৪/৭ হেল্পলাইন পরিষেবা কার্যকরভাবে চালু করা।

খ) লেবার এট্যাশেদের কাজে নারী অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ কাজ বাধ্যতামূলক করা।

গ) 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড' আইন, ২০১৮-তে নারী অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা, চিকিৎসা সুবিধা, দেশে-বিদেশে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা এবং বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

ঘ) নারী অভিবাসী শ্রমিকদের বিশেষ করে প্রবাসী নারী গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিতে লেবার এট্যাশে, রিক্রুটিং এজেন্সি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ - এমনকি ট্রেড ইউনিয়নগুলিরও কার্যকরী ভূমিকা পালন করা; বিশেষ করে অ্যাম্বাসিগুলিতে তাদের জন্য বিশেষ সেবা দিবস আয়োজন করা।

ঙ) ভিন্ন দেশে নারীদের গৃহকর্ম পেশা ছাড়াও অন্য পেশায় অন্তর্ভুক্তির জন্য গবেষণা ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো।

চ) অভিবাসী ও প্রত্যাগত অভিবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান অভিবাসন আইন, বিধি ও নীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা; অথবা তাদের জন্য পৃথক আইন, বিধি ও নীতিমালা গ্রহণ করা; যাতে করে তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা, সম্মান ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

ছ) নারীদের গৃহকর্মী ও গার্মেন্টস কর্মীর প্রশিক্ষণ ছাড়াও নতুন পেশার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে প্রেরণ করা।

জ) প্রত্যাগত অভিবাসী নারী শ্রমিকের জন্য বিশেষ কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা; বিশেষ করে দুঃস্থ প্রত্যাগত নারী শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঝ) বিএমইটি'র অধীনে যে সকল মহিলা টিটিসি আছে তাদের মূল্যায়ন করে নন-ট্রেডিশনাল ট্রেডে প্রশিক্ষণ সুযোগ বৃদ্ধি করা।

ঞ) অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও), বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা), ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিসগুলিতে 'কেপিআই'য়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা।

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজের জন্য যান, যার মধ্যে স্বল্পদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাই সর্বাধিক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৮০% শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে শ্রমিক হিসেবে যাচ্ছেন। বাকি ২০% যাচ্ছেন দক্ষিণ-এশিয়া ও ইউরোপের কিছু দেশে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা উক্ত দেশের শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত নন। বৈদেশিক শ্রমবাজার নিয়ে মন্ত্রণালয়ের কোনো অ্যাকশনভিত্তিক স্টাডি হয় না। লেবার এট্যাশেদের বাজার যাচাই করা আর সম্ভাবনাময় পেশার বা দক্ষতার যাচাই করার কথা থাকলেও সেটা করা হয় না। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত বাজেটও রাখা হয় না। গত কয়েক দশকেও বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তেমন কোনো ব্যাপ্তিলাভ করে নেই।

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির 'সিন্ডিকেট' নির্মূল করা এবং এর জন্য সকল স্টেকহোল্ডাদের নিয়ে পরার্মশক্রমে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

খ) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং তার ভিত্তিতে অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ সহ নিয়মিত পর্যালোচনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।

গ) সম্ভাব্য শ্রমবাজার সম্প্রসারণে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিজ উদ্যোগে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করা। প্রয়োজনবোধে গন্তব্যদেশে সম্ভাব্য নিয়োগকারী দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো।

ঘ) শ্রমিক প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশসমূহের আঞ্চলিক সংগঠনগুলির (যেমন, কলম্বো প্রসেস, আবুধাবি সংলাপ) শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ।

ঙ) শুধু সমঝোতা চুক্তি নয়, শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলির সাথে শ্রমিকদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে 'দ্বিপাক্ষিক চুক্তি' করা এবং তার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

চ) বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকের ভারসাম্য রক্ষার্থে লেবার এট্যাশে ও দূতাবাসগুলির সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনা

রেমিট্যান্স বাংলাদেশের জিডিপি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান থেকে পাঠানো অর্থ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে অপূরণীয় ভূমিকা রাখে। সাধারণত ব্যাংক, মানি ট্রান্সফার সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানো হয়, যা বৈধ বলে স্বীকৃত। তবে রেমিট্যান্স পাঠানোর ফি/চার্জ, জটিলতা এবং প্রসেসিংয়ে দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অনেকেই হুন্ডি তথা অবৈধ উপায়ে দেশে টাকা পাঠান। অনেক শ্রমিক মনে করেন, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ফি/চার্জ বেশি কাটা হয় এবং লেনদেন প্রক্রিয়া ধীরগতির হয়। এছাড়াও প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স আসার পরেও উৎপাদনশীল কাজে তা বিনিয়োগের জন্য যথাযথ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা নেই।

রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনায় শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) রেমিট্যান্স প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচলিত ডিজিটাল মাধ্যম এবং ব্যাংকিং প্রক্রিয়াগুলি সহজ ও দ্রুত করার পাশাপাশি লেনদেন ফি কমানো।

খ) স্বল্প খরচে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে অভিবাসীদের উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্যে প্রণোদনা সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি হুন্ডির ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং হুন্ডি চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈধ লেনদেন বন্ধ করা।

গ) প্রতিবছর প্রাপ্ত রেমিট্যান্সকে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করা।

অভিবাসী শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণ

চাকরির চুক্তির মেয়াদ শেষে বা অপ্রত্যাশিত যে কোনো কারণে অভিবাসী শ্রমিকরা দেশে ফিরে আসেন। দীর্ঘসময় প্রবাসে থাকার ফলে তারা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদেরকে তাদের পরিবার ভিন্ন চোখে দেখে, সহজে মেনে নিতে চায় না। অন্যদিকে দেশে ফেরত আসা এই বিশাল জনগোষ্ঠী ট্রেডভিত্তিক কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত হতে পারে না, আবার যথেষ্ট পুঁজি না থাকার কারণে তারা ব্যবসাও শুরু করতে পারে না। প্রবাস ফেরত এই শ্রমিকদের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় তাদের অর্জিত দক্ষতাও দেশে কাজে লাগানো হয় না। ফেরত আসা দুস্থ ও অসুস্থ শ্রমিকদের কোনো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি না থাকায় অনেকেই মানবেতর জীবন যাপন করেন।

অভিবাসী শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বিমানবন্দরে বিশেষ সেবা ও ভালো আচরণ নিশ্চিত করে হয়রানি কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ।

খ) প্রত্যাগত শ্রমিকদের জন্য দ্রুত 'রি-ইন্টিগ্রেশন পলিসি' বাস্তবায়ন, বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সকল দুস্থ ও অসুস্থ শ্রমিকদের জন্য মাসিক ভিত্তিতে 'সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' চালু সহ নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

গ) 'আপ-স্কিলিং', 'রি-স্কিলিং' ও 'আরপিএল'-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রবাসীদের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডে'র তহবিল থেকে কোনো সরকারি ক্যাডার কর্মকর্তার বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ বাতিল করা এবং 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড'কে জেন্ডারভিত্তিক প্রত্যাগতদের তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা সহ প্রত্যাগত নারী শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ট্রেড ইউনিয়নে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

অভিবাসী শ্রমিকরা কর্মস্থলে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হন। বিশেষ করে গৃহশ্রমিক হিসেবে অভিবাসন করা নারী শ্রমিকরা কর্মস্থলে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। গন্তব্য দেশগুলিতে দু-একটি ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানে অভিবাসী শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে দেওয়া হয় না। এছাড়া, দ্বি-পাক্ষিক বা ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির অভাবে শ্রমিকের অধিকার, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়নে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডে প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

খ) অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় উৎস ও গন্তব্য দেশের সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করা।

গ) প্রত্যাশী এবং প্রত্যাগত শ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সহ সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে 'শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রদান করা।

অভিবাসী শ্রমিকদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

গড়ে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বাংলাদেশি শ্রম অভিবাসনের লক্ষ্যে দীর্ঘসময় দেশের বাইরে থাকেন। তারা জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। দেশের অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখলেও তারা ভোট দিয়ে তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন না। ভোটের অধিকার না থাকার ফলে তারা রাজনৈতিক মতামত প্রদানে সম্পৃক্ত হতে পারেন না। বিশাল এই জনগোষ্ঠী দেশের আর্থ-সামাজিক মূলধারার বাইরে থেকে যান। ফলে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটে না।

অভিবাসী শ্রমিকদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) অভিবাসী শ্রমিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা।

খ) অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য স্ব স্ব কর্মস্থলের নিকটবর্তী দূতাবাস বা কনস্যুলার অফিসে গিয়ে অনলাইনে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৬.১.৮ পরিচ্ছন্নতাকর্মী/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শ্রমিক/দলিত জনগোষ্ঠী

পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত এক জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫৬ লক্ষ,[46] যাদের একটি বড় অংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কাজ করেন। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অধিকাংশই আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে দৈনিক মজুরিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত, ফলে তারা বেতন বৈষম্যের শিকার। পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা কোনোরকম সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই ম্যানহোল, টয়লেট ও সুয়ারেজ পরিষ্কারের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন। ফলে তারা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন এবং ক্যান্সার ও এজমার মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেশি।[47] যুগ যুগ ধরে পরিচ্ছন্নকর্মীরা বৈষম্য ও বঞ্চনার সাথে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থেকে দিন অতিবাহিত করছেন। কমিশন মনে করে যে তাদের এ অবস্থার আশু পরিবর্তন হওয়া জরুরি।

এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) আউটসোর্সিং বন্ধ করে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা এবং দীর্ঘদিন থেকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) পরিচ্ছনতাকর্মীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো প্রস্তুত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে দক্ষতাভিত্তিক পদোন্নতি নিশ্চিত করা। শ্রম আইন অনুযায়ী উৎসব বোনাস প্রদান করা।

গ) অগ্রাধিকারভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় (যেমন; পেনশন ভাতা, ভবিষ্যৎ তহবিল) অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে পরিচ্ছনতাকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সন্তানদের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

ঘ) পরিচ্ছন্নতা কাজে পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে আধুনিক পরিচ্ছন্নতা উপকরণ বা যন্ত্রপাতি নিয়মিতভাবে এবং বিনামূল্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ঙ) পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেক বেশি তাই নির্দিষ্ট বিরতিতে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নির্ণয় করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ভাক্সিন নিশ্চিত করা। সবার জন্য হেলথ কার্ড সরবরাহ করা এবং ঝুঁকি ভাতা নির্ধারণ করা। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

চ) পরিচ্ছনতাকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শোভন জীবনযাপন নিশ্চিত করতে "পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবাসিক এলাকা" স্থাপন করার মাধ্যমে মানসম্পন্ন আবাসন নিশ্চিত করা।

ছ) শিল্পভিত্তিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ও উন্নত স্বাস্থ্যবাস নিশ্চিত করে কারখানাভিত্তিক ওয়াশ কমিটি গঠন, সুনির্দিষ্ট নীতি ও ওয়াশ চেকলিস্ট প্রণয়ন করা।

জ) নারী কর্মীদের জন্য পরিবারিক জীবন ভারসাম্যময় ও নিরাপদ হয় এমন ধরনের কাজের ধরন, রুটিন ও পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং বিশেষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতি গ্রহণ করা।

ঞ) প্রয়োজনে দলিত/হরিজন জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে "সংরক্ষণ নীতি" প্রবর্তন করে পর্যায়ক্রমে অনগ্রসর অবস্থা থেকে উত্তরণ করা। পেশাগত পরিচয়ের কারণে হরিজন ও দলিত পরিবারের যে কোনো সদস্যকে রাষ্ট্রীয় যে কোনো ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ শাস্তিযোগ্য করা।

৬.১.৯ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক

বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা এবং নদীভাঙনের মতো চরম জলবায়ুজনিত ঘটনায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০১৯ সালে জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগের কারণে ২ কোটি ৪৯ লাখ মানুষের স্থানচ্যুতি ঘটে। বাংলাদেশের

---

46 অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, https://msw.gov.bd/site/page/22f31a43-bdab-4613-9fa2-বেদে,-দলিত,-হরিজন - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

47 এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, রাজধানী ঢাকায় পরিচ্ছন্নতা—কর্মীদের ২০ ভাগই ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন, এবং এর এজমায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন ২৩ ভাগ কর্মী। আশহাবুর রহমান শোয়েব, পরিচ্ছন্ন কর্মীদের অমানবিক জীবন, দৈনিক পূর্বকোন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০। https://dainikpurbokone.net/anniversary-supplement/107077/দৈনিক পূর্বকোণ | বাংলাদেশে আধুনিক সংবাদপত্রের পথিকৃৎ

অধিকাংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষ কৃষি ও মৎস্যজীবী।[48] প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে কৃষি শ্রমিকরা অ-কৃষি পেশায় যুক্ত হলেও দক্ষতা না থাকায় তারা কম পারিশ্রমিকে কাজ করেন।[49] জীবিকার ক্ষতি ও বাধ্যতামূলক অভিবাসন ছাড়াও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা আয়ের অভাবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনে উচ্চ সুদে স্থানীয় মহাজন বা সমবায় থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন। আয়ের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো শিশুদের কাজে নিয়োগ দেয়, ফলশ্রুতিতে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পায়। দুর্যোগপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করেন ও নানা রোগে আক্রান্ত হন। তবে অর্থের অভাবে তারা চিকিৎসাও করাতে পারেন না।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের কল্যাণে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ নীতি গ্রহণ করা। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ তহবিল/জরুরি ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা।

খ) জলবায়ু দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গঠন এবং সবুজ অর্থনীতির বিকাশমান খাতগুলিতে তাদের পুনঃপ্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

গ) পরিবেশ বান্ধব শিল্পকে প্রণোদনা দেয়ার পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব দক্ষতা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা চালু করা।

৬.২ কৃষিভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.২.১ কৃষি শ্রমিক

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মোট দেশজ জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান প্রায় ১৪ শতাংশ। এই খাত দেশে কর্মসংস্থানেরও বৃহৎ উৎস। অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ পান এবং নিয়োগপত্র ছাড়া কাজ করেন।[50]

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ কৃষি শ্রমিকের সংজ্ঞা থাকলেও তাদের কাজের স্বীকৃতি ও অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ নেই।[51] কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন খামারের শ্রমিকরা ২০১৭ সালের নীতিমালা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পান। তবে খামার বহির্ভূত কৃষি শ্রমিকদের কাজের যেমন অনিশ্চিয়তা আছে তেমনি দুর্যোগ ও বিপদে নেই কোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা।[52]

কৃষিখাতে নারী-পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরি বৈষম্য রয়েছে। নারী শ্রমিকেরা পুরুষের সমান বা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় দীর্ঘক্ষণ ও জটিল কাজ করেন। তবুও তারা মর্যদা ও মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন।[53]

শোভন কাজের নীতি অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। সরকারি-বেসরকারি খামারে কিছু নির্দেশনা থাকলেও খামার বহির্ভূত শ্রমিকদের জন্য তা অনুপস্থিত। কৃষিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হলেও শ্রমিকরা কোনো ধরনের সুরক্ষা পান না, ফলে তারা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকেন।

কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কমিশন প্রস্তাব করছে যে,

---

[48] R. Islam, “Livelihood of Coastal Community in Bangladesh: Options, Changes and Alternatives,“ In R. Ahmed, A. Al-Maruf, & J. C. Jenkins (Eds.), Transforming Bangladesh: Geography, People, Economy and Environment (pp. 139-145), (2023) Switzerland: Springer Nature.

[49] T. Aziz, “Where the Fishing Community Heading to? Disaster-Led Occupational Transformation of the Fishing Communities in Coastal Bangladesh,” i-manager's Journal on Humanities & Social Sciences, 3(2) (2023), P. 60-68.

[50] Hossain & M. Ahmed, “Economic and Social Upgrading of Smallholders in Rice Value Chains of Bangladesh: A Case Study,” An unpublished Research Report, International Centre for Development and Decent Work, Germany (2018).

[51] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-952/section-print-29070.html

[52] Jakir Hossain & Monsur Ahmed, “Economic and Social Upgrading of Smallholders in Rice Value Chains of Bangladesh: A Case Study.”

[53] আহম্মেদ, ফারুক, ‘কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ আছে, মূল্যায়ন নেই’। https://www.bonikbarta.com/editorial/ls7QBvWnYdMN4aib

ক) কৃষিকাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিকদের কাজের ধরন, সময় ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সার্বক্ষণিক কৃষি শ্রমিক, খণ্ডকালীন কৃষি শ্রমিক, ঋতুভিত্তিক বা অস্থায়ী কৃষি শ্রমিকদের সংজ্ঞায়িত করে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। এ ক্ষেত্রে কোন কোন কাজ কৃষি কাজ হিসাবে গণ্য হবে সে বিষয়ে শ্রম আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা আবশ্যক।

খ) কৃষি শ্রমিকদের তার এলাকার স্থানীয় সরকার বা প্রশাসন কর্তৃক তার কাজের ধরন এবং প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন কোন ধরনের কৃষি কাজে নিয়োজিত আছেন এবং সার্বক্ষণিক কৃষি শ্রমিক, খণ্ডকালীন শ্রমিক, ঋতুভিত্তিক শ্রমিক বা অস্থানীয় শ্রমিক ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধীকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান করা।

গ) কৃষি শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলি উন্নত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বিশেষ মৌসুমে বিশেষ করে বোরো ও আমন ধান ওঠার আগে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষি শ্রমিকদের যখন কাজ থাকে না, সে সময়ে তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া বা ভাতা প্রদান করা আবশ্যক।

ঘ) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর উপজেলা পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কৃষি শ্রমিকদের দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিণত করা জরুরি। প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারী কৃষি শ্রমিকদেরও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

৬.২.২ চাতাল/রাইস মিল শ্রমিক

খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, দেশে তিন ধরনের রাইসমিল রয়েছে: হাস্কিং মিল, আধা-স্বয়ংক্রিয় মিল এবং স্বয়ংক্রিয় মিল। লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) এর তথ্য মতে দেশে বর্তমানে ৫০৭টি হাস্কিং মিল এবং ৫৮৮৫টি অটো রাইস মিল রয়েছে।[54] তবে এই সকল চাতাল এবং অটো রাইস মিলে বর্তমানে কত সংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

শ্রম আইনের আওতাভুক্ত হলেও চাতাল শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যূনতম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বেশিরভাগ শ্রমিকই কোনো নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র পান না। চাতাল বা মিলে শ্রমিকদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই[55] এবং কাজের তুলনায় মজুরি অত্যন্ত কম এবং অনেক সময় তাও বকেয়া থাকে।[56] আবার নারী ও পুরুষ শ্রমিকভেদে মজুরি বৈষম্য রয়েছে।[57] চাতাল/রাইসমিলে শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হয়।[58] শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন ছুটি, চিকিৎসা সুবিধা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার থেকে বঞ্চিত। চাতাল শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা ও আর্থিক সমস্যার সমাধানে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) কর্মহীন চাতাল শ্রমিকদের বিশেষ করে এই খাতে কর্মহীন নারী শ্রমিকদের সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অথবা সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা।

খ) মজুরির স্বল্পতার কারণে বিশেষ করে যখন কাজ কম থাকে তখন চাতাল মিল শ্রমিকরা মালিকের কাছ থেকে আগাম টাকা নেন। যা পরিশোধ করার জন্য শ্রমিকদের বাধ্য হয়ে ঐ চাতালে কাজ করতে হয় বা অনেক সময় অন্য চাতাল মালিকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে ঋণের এই চক্র থেকে তারা বের হতে পারেন না। তাই শ্রমিকদের এই ঋণ চক্র বা দাদন চক্র থেকে মুক্ত করার জন্য সরকারিভাবে সহজ শর্তে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।

---

54 লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

55 জাকির হোসেন, মোস্তাফিজ আহমেদ, এবং আফরোজা আখতার, "চাতাল শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি: যৌক্তিক পরিমাণ ও পরিমাণের যৌক্তিকতা," ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টডিজ, ২০১০.

56 মো. মিনহাজুল হক, অটো রাইস মিল কর্মীদের ঈদ: বোনাস লাগবে না, আমাদের বেতন দেন, প্রথম আলো, ৪ জুন ২০২৪। https://www.prothomalo.com/opinion/letter/08j70gmaed

57 ঢাকা প্রকাশ, "পুরুষের চাইতে কম মজুরি পায় চাতালে কর্মরত নারীরা," ঢাকা প্রকাশ, ৮ মার্চ, ২০২৪, https://www.dhakaprokash24.com/saradesh/rajshahi/60190

58 মো. মিনহাজুল হক, প্রাগুক্ত

৬.২.৩ চা শ্রমিক

বাংলাদেশের চা শিল্প কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান খাত। গুরুত্ব বিবেচনায় কমিশন এ খাতে কর্মরত শ্রমিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক, মালিক প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সাথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় একাধিকবার মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়। শ্রমিকদের জীবনমান নিশ্চিত, সুষম শিল্প সম্পর্ক ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনা করে এ শিল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে।

এই খাতের শ্রমিকদের ঐতিহাসিকভাবে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে চা বাগানে কাজ করার জন্য নিয়ে আসা হয়। তারা বংশপরম্পরায় বাগানের অভ্যন্তরে বসবাস করে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় আলাদা। ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং চা শ্রমিক প্রতিনিধিদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গ্রাচ্যুইটি/পেনশন, ছুটি, বাসস্থান ইত্যাদি ইস্যুতে মূল শ্রম আইনের সাথে চা শ্রমিকদের প্রাপ্তির মধ্যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যতা রয়েছে যা চা শ্রমিকদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে নিয়োগকারীগণ বিদ্যমান বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, যা এ সেক্টরে ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

এ প্রেক্ষাপটে শিল্পের উৎপাদনশীলতা, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে চা শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাসমূহ তথা ভূমি অধিকার, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, কারিগরি শিক্ষা, সন্তানদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কাজের সুযোগ, স্থায়ীকরণ, তাদের নিজের ও পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, ইউনিয়নের নিয়মিত নির্বাচন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে কমিশনের সুপারিশ হলো, চা শিল্প ও শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির স্থায়ী ও কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক শ্রমিক ও নিয়োগকারী প্রতিনিধি, সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আগামী ৬ মাসের মধ্যে একটি পৃথক কমিটি গঠন করা। এই কমিটি সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা, মতবিনিময় সভা হতে প্রাপ্ত মতামত, সুপারিশ ও দাবিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে এবং অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা তৈরি করবে যা থেকে চা খাতের বিদ্যমান সকল সমস্যা সমাধানে একটি সামগ্রিক পথনির্দেশনা পাওয়া যায়।

৬.৩ রপ্তানিমুখি শিল্প ও এলাকাভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.৩.১ গার্মেন্টস (তৈরি পোশাক) খাতের শ্রমিক

বাংলাদেশের ৪০ লাখ তরুণ নারী-পুরুষ পোশাক শ্রমিক তাদের কাজের মধ্য দিয়ে দেশের পতাকা ও নাম সারা দুনিয়ায় পরিচিত করেছে। তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্পখাত পরিণত হয়েছে এদেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তিতে। জিডিপিতে এর অবদান ১০.৩৫%[59] এবং মোট রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশই আসে এই খাত থেকে।[60] কিন্তু তৈরি পোশাক শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রপ্তানি আয় এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সত্ত্বেও এই শিল্পের শ্রমিকের অধিকার, সুরক্ষা ও কল্যাণের সামগ্রিক চিত্রটি অনেক ক্ষেত্রেই উদ্বেগজনক। বর্তমানে মর্যাদাপূর্ণ-শোভন মজুরি, কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুরক্ষা—এই শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য অন্যতম করণীয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, সাপ্তাহিক ছুটি সহ অন্যান্য ছুটির ঘাটতি, স্বল্প মজুরি ও অপ্রতুল মজুরি বৃদ্ধি, প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার অনিশ্চয়তা এবং নারী শ্রমিকের ঘর ও বাহিরের দ্বৈত কাজের বোঝা—এ শিল্পের শ্রমিকের নিত্যদিনের সমস্যা।

সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতে পোশাকখাতের শ্রমিক-উদ্যোক্তার ভূমিকার বিকাশ এবং শ্রমিকের জীবন-জীবিকা-জবানের অধিকার সুরক্ষা-কল্যাণে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) পোশাক খাতে শ্রমিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা করার সুযোগ ও প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিতে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন শর্ত শিথিলযোগ্য করা।

[59] Bangladesh Bank (2023). Quarterly Review on Readymade Garments (RMG): April-June of FY23. External Economics Wing, Research Department, Bangladesh Bank.

[60] GoB (2023). Bangladesh Economic Review 2023. Dhaka: Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

খ) সকল শ্রমিকের কাজের শর্ত উল্লেখ করে নিয়োগপত্র নিশ্চিতের ব্যবস্থা তদারকি জোরদার করা।

গ) গার্মেন্টস শিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও পরিবর্তিত চাহিদার সাথে শ্রমিকদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য মালিক ও সরকারের উদ্যোগে শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণের নতুন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের দক্ষতার সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঘ) কারখানায় ও এলাকায় প্রয়োজনীয় যথাযথ মানসম্পন্ন ডে কেয়ার, বাসস্থান ও কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে হাইকোর্ট নির্দেশ ২০০৯ ও আইএলও ১৯০ নীতিমালা ও অভিযোগ সেল গঠন করা।

চ) কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের প্রমোশন এবং আপগ্রেডেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমোশন ও আপগ্রেডেশনের নীতি তৈরি করা, যাতে তাদের ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ নিশ্চিত হয় এবং কারখানার ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়।

ছ) শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কারখানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্কিম বা প্রোগ্রাম চালু করা। এছাড়া প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পেশাদার কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জ) কারখানাগুলি যেন তাদের অটোমেশন/প্রযুক্তিগত পরিবর্তন পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং দক্ষতার চাহিদা আগে থেকেই প্রকাশ করে সে জন্য কৌশল নির্ধারণ করা।

ঝ) কোনো শ্রমিককে সম্মতি ব্যতিরেকে কর্ম দিবসে অতিরিক্ত কাজ না করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সর্বদাই এ শিল্পে কাজের চাপ এবং অতিরিক্ত শ্রম/শ্রমিকের চাহিদা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে শ্রমিককে অমানবিক কর্মঘণ্টার চাপ হতে মুক্ত করতে বিভিন্ন কারখানায় 'শিফট ভিত্তিক' কাজ চালু করা। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, উৎসব ছুটি সহ সকল ছুটি যথাযথভাবে কার্যকর আছে কিনা তদারকি করা।

ঞ)বিজিএমইএ/বিকেএমইএ'র ডাটাবেস হতে কারখানাগুলির মধ্যে শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিকর তথ্য শেয়ারিং বন্ধ করা, যাতে তা তাদের ক্ষতির কারণ না হয়, ভবিষ্যৎ কাজের সুযোগের জন্য কোনো প্রতিবন্ধতকা সৃষ্টি না করে।

ট) রানা প্লাজা ও তাজরীন শ্রমিক প্রাণহানীর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা। দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের জন্য মানদণ্ড পূর্ণ মূল্যায়ন করা।

ঠ) পোশাক শ্রমিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর গঠনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা কোর্স ও মিডিয়ায় শ্রমিকের জীবন গাঁথা মর্যাদাপূর্ণভাবে উত্থাপন ও ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) শ্রমিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হয়ারানিমূলক সকল মামলা প্রত্যাহারে ব্যবস্থা নেয়া। শ্রমিকের আইনি সুরক্ষায় সরকারের উদ্যোগী ভূমিকা রাখা।

ঢ) রাত্রিকালীন কাজের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর পক্ষ হতে পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ণ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী রপ্তানিমুখি তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য একটি "জাতীয় কর্মস্থল নিরাপত্তা নীতিমালা" প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে দেশি বিদেশি সকলেই একটি একক মানদণ্ড মেনে চলতে পারে।

ত) সকল রপ্তানিমুখি শিল্পের সুরক্ষা তদারকি ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সেফটি ইউনিট গঠন প্রয়োজন, তা একটি ত্রি-পক্ষীয় উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কাছে যার জবাবদিহিতা থাকবে।

থ) পোশাক শিল্পে কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি মধ্যম মেয়াদি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

দ) কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশীয় সামর্থ্য উন্নয়ন এবং দেশীয় বিশেষজ্ঞ সহ বিশেষ ব্যবস্থা সরকারি ব্যবস্থাপনা তৈরি করা। এই ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

ধ) জাতীয়ভাবে সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়িনের যৌথ অংশীদারিত্বে গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন এবং ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়সমূহ মনিটরিংয়ের জন্য মনিটরিং ইউনিট গঠন।

৬.৩.২ চিংড়ি শিল্প শ্রমিক

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ঘের এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪৬ লাখ ৯৭ হাজার। এখাতে কর্মরত শ্রমিকের ৮০ শতাংশই নারী শ্রমিক।[61] চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে শ্রমিকদের মজুরি সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম। শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও প্রায়ই ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।[62]

চিংড়ি ঘেরে কর্মপরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। বিশ্রামের জন্য ছাউনি নেই, শৌচাগারের অভাব ও খাবার পানির সংকট রয়েছে। কিছু চিংড়ি খামারের পানি পঁচে যাওয়ার কারণে দূষিত পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েন। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে নারী শ্রমিকরা স্বল্প মজুরিতে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত। দীর্ঘদিন লবণ পানিতে কাজের ফলে তারা ডায়রিয়া, আমাশয়, শরীর ফুলে যাওয়া, চর্মরোগ, মাথা ঘোরা, অসময়ে গর্ভপাত ও জরায়ু ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকেন।

চিংড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং কাজের পরিবেশ বিবেচনায় কমিশন প্রস্তাব করছে যে,

ক) চিংড়ি শিল্পে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে সকল শ্রমিকের জন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন; মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা এবং শ্রমিকদের সেগুলি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

খ) স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়মিতভাবে যাচাই করার জন্য নির্দিষ্ট বিরতিতে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নির্ণয় ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা। সবার জন্য হেলথ কার্ড সরবরাহ করা।

গ) কর্মক্ষেত্রে বিশ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক বিশ্রামের স্থান, মাতৃদুগ্ধ কর্নার, সুপেয় পানির সরবরাহ ও শৌচাগার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঘ) চিংড়ি শিল্পে কর্মরত নারী-পুরুষের সমমানের কাজে সমমজুরির বিধান নিশ্চিত করা।

৬.৩.৩ ট্যানারি শ্রমিক

বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্প একটি শ্রমনির্ভর খাত। ২২০টি ট্যানারি থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত চামড়ার মোট ৭৬ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। এই খাতে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রায় ৮৫০,০০০ কর্মী নিয়োজিত রয়েছে, যার মধ্যে ৬০ ভাগ নারী।[63] বাংলাদেশের শ্রমঘন অন্যান্য শিল্পের মতোই, শ্রমমান ও কর্মস্থলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চামড়া ট্যানিং শিল্পও ব্যতিক্রম নয়, যেখানে অমানবিক কর্মপরিবেশ একটি সাধারণ বিষয়। ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনযাত্রা ও কর্মপরিবেশের লক্ষ্যে হাজারীবাগ থেকে স্থানান্তরের পরেও শিল্পটি পরিবেশ দূষণ যেমন প্রতিরোধ করতে পারেনি, তেমনি এখনও শ্রমিকদের জন্য মৌলিক শ্রম অধিকার, যেমন নিয়োগপত্র ও চুক্তিপত্র, ন্যূনতম মজুরি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি।[64] এমনকি সাভারের হেমায়েতপুরে চামড়া শিল্প নগরী গড়ে তোলা হলেও সেখানে শ্রমিকের আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের জন্য কোনো মেডিকেল সেন্টার/হাসপাতাল স্থাপন করা হয়নি।

এই খাতে স্থায়ী শ্রমিকের চেয়ে অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। ট্যানারিগুলি অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ দেয় যারা ১০ থেকে ১৫ বছর চাকরি করার পরও স্থায়ী হতে পারেনা।[65] ২০২৪ সালে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত গেজেট

---

[61] "চিংড়ি শিল্পে নারী শ্রমিক বৈষম্যের শিকার, সমস্যা সমাধানের তাগিদ ডেপুটি স্পিকারের," Voice Ekattor, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩, https://voiceekattor.com/চিংড়ি-শিল্পে-নারী-শ্রমিক/

[62] এস এম চন্দন, "খুলনার চিংড়ি শিল্প শ্রমিকদের কথা," Weekly Ekota, March 16, 2025, https://www.weeklyekota.net/index.php/home?page=details&serial=12015.

[63] Bangladesh Investment Development Authority, "Leather and Leather Goods," Retrieved March 2, 2025, from https://bida.gov.bd/storage/app/uploads/public/650/adb/872/650adb872b637097610685.pdf

[64] Jitendra Nath Paul, "Savar tannery states: A project that offers lessons from errors," The Business Standard, 26 January 2022.

[65] জনকণ্ঠ, "চামড়া শিল্পনগরে হ-য-ব-র-ল অবস্থা," ২৪ জুন, ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/different-news/news/724920.

অনুযায়ী ট্যানারি শ্রমিক ও কর্মচারীর মজুরি সাভার এলাকার জন্য ১৮০০১ টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ১৭০৪৮ টাকা নির্ধারিত হয়েছে[66] কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন হয়নি। পেনশন, বিমা সুবিধা ও উৎসবভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও অনেক শ্রমিক বঞ্চিত।

শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সহ তাদের ন্যায্য মজুরি এবং চাকরির নিরাপত্তায় আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

কমিশন এ প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সুপারিশ করছে:

ক) ট্যানারি শিল্পে অস্থায়ী নিয়োগ এবং মধ্যস্বত্বভোগী কনট্রাক্টরের মাধ্যমে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করে শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ দেয়া এবং শ্রম আইন অনুযায়ী চাকরির সকল শর্তের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ) ট্যানারি শিল্পের জন্য ন্যূনতম মজুরির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে মজুরি বাস্তবায়নের মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করা।

গ) ট্যানারির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক ঝুঁকি বিবেচনায় এ খাতের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ করা আবশ্যক। পাশাপাশি একটি নিয়ন্ত্রিত ও কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শিল্পে কর্মপরিবেশজনিত ঝুঁকি নিরূপণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঘ) ট্যানারি শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় আলাদা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নীতিমালা প্রণয়ন করা। এই নীতিমালার আওতায় ট্যানারিসমূহে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) অফিসার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা।

ঙ) চামড়া শিল্প নগরীতে ট্যানারি শিল্প শ্রমিকদের জন্য পেশাগত ব্যাধি বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।

চ) চামড়া শিল্প নগরী কেন্দ্রিক শ্রমিক আবাসন এবং শ্রমিক পরিবারের সন্তানের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

৬.৩.৪ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রমিক

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য গঠিত একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যা দেশের রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। বর্তমানে দেশের ৮টি ইপিজেড-এ প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন, যার ৬৬% নারী। এসব শ্রমিক তৈরি পোশাক, চামড়া, ইলেকট্রনিকস, প্লাস্টিক, টেক্সটাইল, ওষুধ সহ বিভিন্ন রপ্তানিমুখি শিল্পে কর্মরত। ইপিজেড বহির্ভূত শ্রমিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ দ্বারা সুরক্ষিত হলেও ইপিজেড শ্রমিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা একটি পৃথক আইন 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' দ্বারা নির্ধারিত।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯-এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। এই আইনের মাধ্যমে শ্রমিকরা ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (WWA) গঠন করতে পারেন যা ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে, যদিও এটি ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প নয়। শ্রমিক কল্যাণ সমিতিগুলি বেসরকারি সংস্থার সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না এবং বাইরের ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের সাথে তাদের সম্পর্ক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া এ আইনে শ্রম আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার অধিকারও অত্যন্ত জটিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক. একটি সুসংহত ও একক শ্রম আইন কাঠামো তৈরি করা যা ইপিজেড ও ইপিজেড-বহির্ভূত শ্রমিকদের শ্রম অধিকারের সমান সুরক্ষা প্রদান করবে। আদর্শগতভাবে অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য শ্রম আইনের আওতায় ইপিজেড শ্রমিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে করে ইপিজেডের বাইরে শ্রমিকদের জন্য যে সকল শ্রম অধিকার বিদ্যমান সেগুলি সমভাবে ইপিজেড শ্রমিকদের জন্যও প্রযোজ্য হয়।

খ. ইপিজেড শ্রমিকদের শ্রম আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে শ্রমিক কল্যাণ সমিতিসমূহের সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ রাখা।

---

[66] Nurnahar Akter Tania, "Tannery workers demand minimum wage Tk25,000," Textile Today, 30 March 2024.

গ. ইপিজেডের বিশেষ কার্যক্রম ও বাস্তবিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি পৃথক শ্রম আইন রাখা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে এটা নিশ্চিত করা যে উক্ত আইনে নির্ধারিত ইপিজেড শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেশের সাধারণ শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে সংগঠিত হওয়ার তথা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার (FoA), যৌথ দরকষাকষির অধিকার (CBA) এবং আদালত ও আইনি সহায়তার সমান সুযোগ দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই ইপিজেড শ্রমিকদের জন্যও নিশ্চিত করা।

৬.৩.৫ ডক/বন্দর শ্রমিক

বাংলাদেশে বর্তমানে সমুদ্রবন্দরসমূহ সম্পূর্ণরূপে সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হলেও শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় একাধিক কাঠামোগত ও নীতি-সংক্রান্ত সমস্যা বিদ্যমান। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ বন্দর শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, তবে তা বাস্তবায়ন নিয়ে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য মজুরি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও তা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। বন্দরের শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগে বিধি ও আইন থাকলেও সেই অনুযায়ী সবসময় শ্রমিক নিয়োগ হয় না। ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও বন্দরের শ্রমিকদের কোনো ঝুঁকি ভাতা নেই, উৎসব ভাতা নেই, এমনকি দুর্ঘটনায় শ্রমিক আহত বা নিহত হলেও ক্ষতিপূরণ পান না, কর্মক্ষেত্রে নেই কোনো নিরাপত্তার সরঞ্জাম।[67]

বন্দর সম্পর্কিত শ্রম আইনের ধারা ১৮৫ (ক) শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে খর্ব করে যা শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক।

ডক/বন্দর শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ সুপারিশ করছে:

ক) বন্দর ও ডক শ্রমিকদের আইএলও কনভেনশন ৮৭, ৯৮ এবং শ্রম আইন ২০০৬-এর ভিত্তিতে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণকারী শ্রম আইনের ১৮৫ (ক) ধারা বাতিল করা।

খ) দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত শ্রমিক কর্মচারীদের সকল সুযোগ সুবিধা বহাল রাখতে হবে। ২৫/১০/২০১০ সালে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে গৃহীত 'সমঝোতা স্মারকে'র (MOU) চুক্তি মোতাবেক ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের বাই-রোটেশন বুকিংয়ের ব্যবস্থা করা ।

গ) বার্থ অপারেটরের মাধ্যমে নিয়োজিত সকল শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়মিত করা ও বন্দরের শ্রম শাখার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, বেতন বৈষম্য দূরীকরণে রোটেশনে কাজ দেয়া।

ঘ) ঝুঁকি ভাতা, উৎসব ভাতা, বন্দরের শ্রমিকদের মতো পেনশন প্রদান।

ঙ) যে সকল প্রাইভেট কোম্পানির সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হওয়ার পথে তাদের সাথে নতুন করে কোনো চুক্তি না করা এবং বন্দরকে বেসরকারিকরণের সকল প্রক্রিয়া বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্দরের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চ) বন্দরে নতুন করে আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

ছ) কর্মরত ও বন্দরে শ্রম শাখায় যাচাই-বাছাইকৃত সকল শ্রমিক-কর্মচারীর বন্দরের পরিচয়পত্র প্রদান করা।

জ) কর্মরত সকল শ্রমিককে দুর্ঘটনার ঝুঁকি মুক্ত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

---

[67] 'স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমরা তাঁরাই, যাঁরা নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করব', প্রথম আলো, ২২ ডিসেম্বর ২০২৪। https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/bsz32wgdob

৬.৪ শিল্পভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.৪.১ রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ কারখানা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতার পর এ শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। এর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার আশা করা হয়েছিল, গঠন করা হয়েছিলো বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটি নানা সংকটের সম্মুখীন হতে থাকে। মূলত দুর্নীতি, অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও অব্যবস্থাপনের কারণে একের পর এক পাটকল বন্ধ হতে থাকে। শ্রমিক ছাঁটাই ও মজুরি না দেওয়ার কারণে কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন শ্রমিকরা। এর ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক-আন্দোলন ও সামাজিক অস্থিরতা।[68] যদিও বেসরকারি খাতের অনেক পাটকল ঠিকই মুনাফা করতে পারছে।[69]

সর্বশেষ ২০২০ সালের ১ জুলাই সরকার ২৫টি পাটকল বন্ধ করে দেয়। এর বাইরেও বিভিন্ন সময় অনেক পাটকল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে কর্মহীন হয়ে পড়ে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক।[70] এ সকল শ্রমিক তাদের বেতন ও পাওনাদি নিয়ে ক্রমশ জটিলতার সম্মুখীন হন। এখনও পর্যন্ত বহু শ্রমিক তাদের প্রাপ্য বেতন ভাতা পাননি। এ সকল শ্রমিকদের শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) বর্তমানে সরকার বন্ধ পাটকলসমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে চালুর চেষ্টা করছে। ইজারা প্রদান বাতিল করে সকল বন্ধ সরকারি পাটকল পুনরায় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চালুর ব্যবস্থা করা।

খ) পাটকলগুলিতে পুনরায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা ও কার্যকর পরিচালনার লক্ষ্যে বিগত দিনে ট্রেড ইউনিয়ন, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করে দেশের পাটশিল্প ও পাটচাষকে টেকসই করার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

গ) বিভিন্ন সময়ে সরকারের অদূরদর্শী পরিকল্পনা ও আমলাদের দুর্নীতি ও মাথাভারী অপচয়ের ফলে পাটকলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।

ঘ) পাটকল এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা, যাতে শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষা অব্যাহতভাবে চলতে পারে।

ঙ) পাটচাষ, পাটদ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি - সমগ্র বিষয় বিবেচনায় রেখে পাটখাতকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

চ) বিভিন্ন সময়ে পাটকল বন্ধের সাথে শ্রমিকদেরকে তাদের প্রাপ্য পাওনা (যেমন; বেতনভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড) থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সে সব পাওনা ক্ষতিপূরণ সহকারে শ্রমিকদের পরিশোধ করে তাদের জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করা।

ছ) বন্ধ কারখানাগুলিকে এলাকার প্রয়োজন ও আর্থ-সামাজিক বিবেচনায়, স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক বহুমুখী শ্রমঘন শিল্পে রূপান্তরে কার্যকর পদেক্ষপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যা বন্ধ কারখানার কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

জ) পাটকল শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ/বিকল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মহারা পাটকল শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

---

68 প্রাগুক্ত,

69 বাংলাদেশের সরকারি পাটকলগুলি বন্ধ করলো সরকার, দায় আসলে কার, বিবিসি নিউজ বাংলা, ১১ জুলাই ২০২০। https://www.bbc.com/bengali/news-53360302

70 প্রাগুক্ত,

৬.৪.২ জাহাজ ভাঙা শিল্প

বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কঠিন, কারণ আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যানের অভাব রয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে এ শিল্পে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক সরাসরি ও ১ লাখ পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[71]

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জাহাজ ভাঙা শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই খাতের শ্রমিকেরা দৈনিক মাত্র ৩০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা মজুরিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দৈনিক ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করলেও এই শিল্পে জড়িত শ্রমিকেরা কোনো ওভারটাইম ভাতা পান না। কোনো শ্রমিককে নিয়োগপত্র কিংবা পরিচয়পত্র দেয়া হয় না। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকলেও এই শিল্পের শ্রমিকেরা সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্থ হন। ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের হয়রানি ও বরখাস্তের মুখোমুখি হতে হয়। এছাড়া শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত, যা তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[72] শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (PPE) সরবরাহ করা হয় না। ফলে মৃত্যু ঝুঁকি নিয়েই শ্রমিকেরা বছরের পর বছর কাজ করে চলেছে।[73] ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে এ খাতে প্রায় ৯০০ জন শ্রমিকের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।[74] জাহাজ ভাঙা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে কমিশন প্রস্তাব করছে যে,

ক) জাহাজ ভাঙা শিল্পে একটা জাহাজ ভাঙা শেষ হলে অন্য আর একটি জাহাজ ভাঙার কাজ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ভাতা প্রদান ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) শিপব্রেকিং শিল্পে দুর্ঘটনার হার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত এবং উন্নত ডিজাইন, প্রযুক্তি এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরো দক্ষ ও নিরাপদ করা।

গ) আমদানিকৃত পরিত্যক্ত জাহাজে অ্যাসবেসটস, ভারি ধাতু, খনিজ তেল, জাহাজের তলা ও ব্যালাস্ট ওয়াটার, পলিসাইক্লিক অ্যারোমাটি হাইড্রোকার্বন, পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল, স্লাজ অয়েল ও অর্গানোটিন সহ বেশ কিছু বিপজ্জনক পদার্থ থাকে যা মানুষ এবং পরিবেশ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। এই খাতের শ্রমিকেরা প্রতিনিয়ত এই সকল বিপজ্জনক পদার্থ বা বর্জ্যের সংস্পর্শে কাজ করে। কিন্তু তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে গোসল বা কাপড় পরিবর্তনের জন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তারা বর্জ্যযুক্ত কাপড় পড়েই বাড়িতে যায় এবং নিজ নিজ এলাকার পুকুরে গোসল করে। এর ফলে একদিকে যেমন জাহাজের বর্জ্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে একই সাথে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপদ গোসলের ব্যবস্থা করা এবং নিরাপদ পোশাক সরবরাহ করা।

ঘ) জাহাজ ভাঙার সময় ঝুঁকিপূর্ণ অংশ চিহ্নিত করতে নির্ধারিত রঙের ব্যবহার অনেক ইয়ার্ডে যথাযথভাবে মানা হয় না, ফলে শ্রমিকরা অজ্ঞতার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হন। ঝুঁকি সঠিক পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণে কল কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের তদারকি বৃদ্ধি করা। কাজের ঝুঁকি, ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ কালার কোড এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সঠিক পদক্ষেপ সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা।

ঙ) ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া জটিল হওয়ায় তা সহজ করার জন্য আইনগত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত জাহাজ ভাঙা শিল্প একমাত্র চট্টগ্রামে অবস্থিত। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের ক্ষেত্রে একাধিক বিভাগীয় ট্রেড ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্তির শর্ত বাতিল করা।

চ) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনার বিরুদ্ধে ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাকরিচ্যুতি বন্ধে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

---

71 মেরাজ হাসান ও রায়া তাবাসসুম, 'জাহাজ ভাঙা শিল্পের অপার সম্ভাবনা', দৈনিক ইনকিলাব, ৫ মার্চ ২০২০।
https://m.dailyinqilab.com/article/272865/জাহাজ ভাঙা শিল্পের অপার সম্ভাবনা

72 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, বাংলাদেশ: শ্রম অপব্যবহার থেকে শিপিং ফার্মগুলি মুনাফা তুলে নিচ্ছে, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩।
https://www.hrw.org/bn/news/2023/09/28/bangladesh-shipping-firms-profit-labor-abuse

73 ফজলুল কবির মিন্টু, 'ঝুঁকিতে জাহাজ ভাঙা শিল্পের শ্রমিকেরা', ১৮ মার্চ ২০১৮।
https://bangla.bdnews24.com/blog/233043

74 পরিবেশ বিপর্যয়ে জাহাজ ভাঙা শিল্প, দৈনিক করতোয়া, ১১ জানুয়ারি ২০২৫।
https://www.dailykaratoa.com/article/113709

ছ) জাহাজ ভাঙা শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও গ্রাচুইটি সহ চাকরির অবসানে পাওনা নিশ্চিত করা।

জ) আহত ও অসুস্থ শ্রমিকদের (প্রাক্তন শ্রমিকসহ) চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা। শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঝ) অতীতের দুর্ঘটনাসমূহের তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান করা এবং সুপারিশ অনুযায়ী কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঞ) এই শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যর কথা বিবেচনায় রেখে ইয়ার্ডভিত্তিক সেইফটি কমিটি ও এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তা ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি (কমিউনিটিকে যুক্ত করার মাধ্যমে) গড়ে তোলা ।

ট) স্থানীয় কৃষি জমি ও জলাশয়সমূহের পরিবেশের উপর ক্ষতিকর কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করা জরুরি। কৃষি জমি ও জলাশয়সমূহকে নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য শিল্প ও জীবনচক্র রক্ষার জন্য জাহাজ থেকে কোনো ক্ষতিকর বর্জ্য সাগরে নিক্ষেপ বা নিষ্কাশন না করা। বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই জাহাজ বর্জ্যমুক্ত করা এবং জাহাজ নিরীক্ষার সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে সম্মিলিতভাবে জাহাজ পরিদর্শন ও কাটার অনুমতি দ্রুত সময়ে প্রদান করা।

ঠ) হংকং কনভেনশন বাস্তবায়ন এবং ইয়ার্ডে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের তালিকা করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি। বিকল্প কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.৪.৩ ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প শ্রমিক

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র পাদুকা কারখানাগুলির বেশির ভাগ ঢাকা, ভৈরব, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত। কারখানার সংখ্যা ১১ হাজারের উপরে এবং প্রায় চার লক্ষাধিক শ্রমিক এই কারখানাগুলিতে কাজ করেন।[75] তবে কাজের অনিশ্চয়তা, স্বল্প মজুরি, শিশুশ্রম, জবরদস্তিমূলক শ্রম ও অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের সাথে পুঁজি স্বল্পতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবও এই সকল কারখানার সাধারণ চিত্র।

'চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা' শিল্প সেক্টরের জন্য ২০২০ সালে নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হলেও তার বাস্তবায়ন এসব ব্র্যান্ডহীন জুতা কারখানায় হয়নি।

কারখানায় বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার থাকায় জুতা তৈরির প্রতিটি ধাপের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি যুক্ত থাকে। ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে চর্মরোগ, শ্লেষ্মা ঝিল্লির প্রদাহ, চোখের জ্বালা এবং চোখের ব্যথার মতো সমস্যা হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘক্ষণ কাজ করার ফলে মেরুদণ্ড ও কাঁধের ব্যথা সহ পেশী ও হাড়ের সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে।[76]

দেশীয় পাদুকা কারখানাগুলির টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যে দক্ষ কারিগরের অভাব, মূলধনের অপ্রতুলতা এবং উচ্চ সুদের হার শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য বড় বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদের হার এবং সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক উদ্যোক্তা ব্যবসায় সম্প্রসারণ বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটাতে পারছেন না।[77]

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম আইন অনুসারে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা।

খ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক শিল্প এলাকা গড়ে তুলে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হার কমানো ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পাদুকা শিল্পের উন্নয়ন করা।

---

75 প্রকাশ দত্ত, "পাদুকা শ্রমিক: নাম মাত্র মজুরি আর মর্যাদাহীন জীবন," সর্বজনকথা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

76 J. Nieves Serratos-Perez and Carlos Mendola-Anda, "Musculoskeletal disorders among male sewing machine operators in shoemaking," *Ergonomics* 36, no. 7 (1993): 793-800.

77 সম্ভাবনার পাদুকা শিল্পে সংকট অর্থায়ন ও দক্ষ কর্মীর, লিংকবিডি নিউজ, জানুয়ারি ৪, ২০২৫।

গ) প্রতিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার, বাসস্ট্যান্ড এবং অফিস আদালত চত্বরে পাদুকা শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ছোটো ছোটো কর্মচত্বর বরাদ্দ করা। এ ধরনের কর্মচত্বরগুলির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে স্থানীয় প্রশাসন, শ্রমিক সংগঠন ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয় প্রয়োজন। কর্মচত্বরগুলিতে বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও স্বাস্থ্যমান উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

৬.৪.৫ ফার্নিচার শ্রমিক

বর্তমানে দেশে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক ৪০ হাজারের মতো ফার্নিচার প্রতিষ্ঠানে মাসিক বেতন ও দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।[78] এসকল প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই কুটির, অতিক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন এবং তাদের নিয়োগ ব্যক্তিগত পরিচিতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই খাতের এসএমইগুলি শ্রমিকদের নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র প্রদান করে না এবং শ্রমিকরা দৈনিক মজুরিভিত্তিক বা চুক্তিভিত্তিক কাজ করে থাকে।

শ্রমিকদের কাঠের গুঁড়া, রং, বার্নিশ, আঠা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে হয় যার ফলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা বা চর্মরোগ, হাঁপানি সহ অন্যান্য শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া কিছু বার্নিশ, রঙ এবং দাগযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ লিভার ও কিডনির ক্ষতি করতে পারে এবং এমনকি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে।[79] শ্রমিকদের সাধারণত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) প্রদান করা হয় না এবং তীব্র শব্দের মধ্যে কাজ করলেও শ্রমিকরা শ্রবণ সুরক্ষার যন্ত্র ব্যবহার করেন না।

শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, ফার্নিচার শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ প্রয়োজন:

ক) শ্রম আইন অনুসারে একজন শ্রমিক যে ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার কথা ফার্নিচার শ্রমিকদের সেই সুযোগ সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। যেমন নিয়মিত মজুরি, ছুটি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা সহ কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়োনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা।

খ) চুক্তিভিত্তিক মজুরির পরিবর্তে সরকার কর্তৃক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে ফার্নিচার শিল্পের কাজের প্রকৃতি বিবেচনায় এই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা।

গ) নিয়োগকারী কর্তৃক সকল শ্রমিকের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ) ফার্নিচার শ্রমিকদের পেশাগত ব্যাধি নিরূপণে নিয়মিত বিরতিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষার করা এবং এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ।

ঙ) ফার্নিচার শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স সহ আরও কারিগরি স্কুল স্থাপন করা, যেখানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

চ) ফার্নিচার সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে দক্ষ নারী কর্মশক্তি গড়ে তুলতে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এর সাথে ফার্নিচার শিল্পে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকার কর্তৃক বিশেষ সুবিধামূলক নীতি যেমন মর্টগেজবিহীন বা সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা।

৬.৪.৬ পাথরভাঙা শ্রমিক

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাথর প্রক্রিয়াকরণ কারখানা লালমনিরহাট, পঞ্চগড় এবং সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত। পাথর ভাঙা শ্রমিকের সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানা গেলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় সিলেটে ৫০ হাজারের অধিক,[80]

[78] সুকান্ত হালদার, "মানসম্পন্ন কাঁচামালের অভাব ও উচ্চ শুল্ক আসবাবপত্র শিল্পের প্রধান বাধা," দ্যা ডেইলি স্টার বাংলা, নভেম্বর ১০, ২০২২. https://bangla.thedailystar.net/economy/industry/news-414381

[79] Dr Asli Tamer Vestlund (2013), Health and Safety in the Furniture Industry, Furniture and Joinery production. https://www.furnitureproduction.net/resources/articles/2013/10/1551098359-health-and-safety-furniture-industry

[80] Bappa Maitra, "Around 1,500 illegal stone crushing mills in Sylhet jeopardising public health, degrading environment," bdnews24.com, December 01, 2024, https://bdnews24.com/bangladesh/0851b252e98d

লালমনিরহাটে প্রায় ৪০ হাজার[81] এবং পঞ্চগড়ে প্রায় ১০,০০০ শ্রমিক[82] পাথর ভাঙার কাজ করেন। শ্রমিকদের ৪০ ভাগই নারী শ্রমিক।[83] পাথর ভাঙা একটি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, যেখানে শ্রমিকরা বিভিন্ন রোগ ব্যাধির শিকার হন। পাথর ভাঙা শ্রমিকদের একটি পেশাগত রোগ হচ্ছে সিলিকোসিস। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পাথর কাটার শ্রমিকদের ৮৯% দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রজনিত সমস্যার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বুকে চাপ অনুভব (৭৬%), শ্বাসকষ্ট (৭৪.৫%) এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশি (৬৬.৫%)।[84]

পাথর ভাঙার সাইটগুলি শ্রমিকদের জন্য শুধু ঝুঁকিপূর্ণই নয়, এটা পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর। অধিকাংশ কারখানা নিবন্ধন ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে এবং শ্রমিকদের জন্য কোনো স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই।[85] এছাড়া কারখানাগুলি কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য।

পাথরভাঙা শ্রমিকদের জন্য কমিশনের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

ক) পাথর ভাঙা শ্রমিকদের চাকরির পূর্বে এবং চাকরিতে যোগ দেয়ার পর নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, যেমন বুকের রেডিওগ্রাফি এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে প্রতি মাসে শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মালিক কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

খ) স্থানীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমন্বিতভাবে শ্রমিকদের সিলিকোসিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত একবার শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা যেতে পারে।

গ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পাথর ভাঙার সাইটগুলি নিয়মিত তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

৬.৫ সেবাখাতভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.৫.১ রেলওয়ে শ্রমিক

বর্তমানে রেলওয়ে খাতে প্রায় ২৫০৮৩ জন নিয়মিত কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।[86] এই সেক্টরে শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগে সম্প্রতি সময়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ কার্যক্রম প্রদান করা হয়েছে যার কারণে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত অনেক শ্রমিক দীর্ঘদিন যাবত কাজ করলেও তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ না হওয়ায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও চাকরি নিয়ে চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। আবার কিছু পদে আউটসোর্সিং করা হয়েছে এবং হচ্ছে যার ফলস্বরূপ এই পদ সমূহের শ্রমিক কর্মচারীদের কাজের নিরাপত্তা সহ কল্যাণ ও সুরক্ষার কাঠামো নিশ্চিত হচ্ছে না।[87] এই সেক্টরকে আরো জনকল্যাণমুখী করতে এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী এবং শ্রমিক নিয়োগে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা দরকার যার মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। এই লক্ষ্যে কমিশন প্রস্তাব করছে যে,

---

81 এস দিলীপ রায়, "ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত ৪০ হাজার পাথর শ্রমিক," দ্যা ডেইলি স্টার, মে ০১, ২০২২।

82 এম মোবারক হোসেন, "পুরুষের মতই পাথর ভাঙে হাজারো নারী, মজুরিতে বৈষম্য," Dhaka Mail, ৮ মার্চ ২০২৩, https://dhakamail.com/country/76089

83 এস দিলীপ রায়, "ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত ৪০ হাজার পাথর শ্রমিক," দ্যা ডেইলি স্টার, মে ০১, ২০২২।

84 Shamim Ahmed, Shah Ashiqur Rahman Ashiq Choudhury, Abir Hasan Dip, Taposh Bose, Ashis Kumar Sarkar, Mohammed Atiqur Rahman, and Jannatul Ferdous, "Respiratory symptoms, spirometric, and radiological status of stone-cutting workers in Bangladesh: A cross-sectional study," *Health science reports* 5, no. 5 (2022): e753, https://doi.org/10.1002/hsr2.753

85 Abu Siddique, "Stone crushing industry exposes workers to deadly silicosis disease," Dhaka Tribune, September 28, 2017, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/126805/stone-crushing-industry-exposes-workers-to-deadly

86 বাংলাদেশ রেলওয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলাদেশ রেলওয়ে। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। https://railway.gov.bd/site/page/ce7dd6af-c7c8-4811-86b3-ba871e2e406e/

87 অস্থায়ী শ্রমিকদের অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ, বাংলা ট্রিবিউন ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪। অস্থায়ী শ্রমিকদের অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ

ক) সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের তথা ট্রেড ইউনিয়নের মতামত গ্রহণ করা এবং সকল স্তরে নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে প্রত্যাশিত শিল্প সম্পর্ক জোরদার করা এবং এই সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করা।

খ) নিয়োগবিধি ২০২০ সংশোধনপূর্বক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির অত্যাবশ্যকীয় কারিগরি শূন্য পদে পিএসসির পরিবর্তে নিজস্ব কমিটির মাধ্যমে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে নিয়োগ বিধির কারণে কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর কারণে কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে সম্প্রতি অনুসৃত এককেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় দুই জোনে আলাদা কমিটির মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধানদের পদোন্নতি দ্রুততর করার বিষয়টি বিবেচনা করা।

গ) রেলের জন্য আউট সোর্সিং বন্ধ করে পূর্বের নিয়মে টিএলআর/অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তির প্রবাহ জারি রাখার উদ্যোগ নেওয়া।

৬.৫.২ নৌযান শ্রমিক

বাংলাদেশের সকল মালবাহী যানবাহনের ৫০ শতাংশ এবং এক—চতুর্থাংশ যাত্রীবাহী যানবাহন নদীপথে চলাচল করে। অভ্যন্তরীণ নদীপথে নৌবহর বা জাহাজের পরিমাণ বাড়ছে এবং বর্তমানে নিবন্ধিত জাহাজের পরিমাণ ২২,৩০০। তাছাড়া ৭ লক্ষ ৫০ হাজার প্রচলিত দেশীয় নৌকার একটি বড় অংশকে যন্ত্রচালিত (ট্রলার) করা হয়েছে। যার আনুমানিক ৬৫ শতাংশ নৌকা হচ্ছে যাত্রীবাহী, যেগুলি প্রধানত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের কাজে নিয়োজিত এবং বেশিরভাগই মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। দেশে নৌযানে কাজ করছেন অন্তত ২ লাখ শ্রমিক। আমদানি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহনের অনেকাংশেই নৌ পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও নৌযান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময় উপেক্ষিত।[88]

নৌ শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) শ্রম আইন অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য বিবেচনায় নিয়ে নৌযান শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরি বৃদ্ধিকরণে মজুরি বোর্ড গঠন করে সময় উপযোগী নূন্যতম মজুরি নির্ধারণে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) নৌযান শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাবিক কল্যাণ তহবিল ও ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে কন্টিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। সব মালিক সমিতিকে এক প্ল্যাটফর্মে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

গ) নৌপরিবহণ সেক্টরে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র নেই। শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিতকরণে সরকারি তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

ঘ) নৌপরিবহণ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত জলদস্যু এবং ডাকাতের কবলে পড়ে। নৌপরিবহণ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রতিটি বন্দর/নৌপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬.৫.৩ পরিবহণ

বিআরটিএর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা ৫৮.৯৭ লাখ, যার মধ্যে অধিকাংশই পরিবহণ খাতভুক্ত। দেশজুড়ে পরিবহণ খাতে প্রায় এক কোটি শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন বলে অনুমান করা হয়, যদিও তাঁদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন।[89] মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩, শ্রম আইন ২০০৬ এবং সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮-তে নিয়োগপত্র ও শ্রমিক সুরক্ষার বিধান রয়েছে, বাস্তবে তা কার্যকর নয়; বেসরকারি মালিকরা অধিক মুনাফার আশায় শ্রমিকদের অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেন।

---

৪৪ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কতৃর্পক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), জানুয়ারি, ২০১৬, পরিবেশগত এবং সামাজিক দিক নিরূপন কার্যনির্বাহী সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ প্রকল্প—১ (চট্টগ্রাম—ঢাকা—আশুগঞ্জ করিডোর) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।

89 এক কোটি পরিবহণ শ্রমিকের জীবনের চাকা থমকে; ০৮নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক দেশরূপান্তর, https://www.deshrupantor.com/465789

অধিকাংশ পরিবহণ শ্রমিক দৈনিক ১৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেন এবং ৯০ শতাংশের কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই।[90] ফলে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা সড়ক দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ। বাস চালক-শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু মজুরি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। চালকদের অনেকেই দৈনিক চুক্তিতে বাস চালান, যেখানে আয় নির্ভর করে মালিককে নির্ধারিত টাকা জমা দেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থের ওপর। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে শ্রমিকরা বা তাঁদের পরিবার কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ পান না। কল্যাণ তহবিলের নামে তাঁদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হলেও শ্রমিক প্রয়োজনের সময়ে সহায়তা পান না।

শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট শ্রমনীতি, ন্যায্য মজুরি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং নিয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সড়ক পরিবহণ নীতিমালা ২০২২ সংস্কার করে একটি সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮-এর অসংগতিপূর্ণ ধারাগুলি মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করা। সেক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ আইন সংশোধন করে সড়ক নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ব্যবহারে যুক্ত সকল পক্ষকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

খ) পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মহাসড়কগুলিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সহ পরিবহণ শ্রমিকের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করা।

গ) কোনো পরিবহণ শ্রমিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে মালিক এবং সরকারের পক্ষ থেকে তার সুচিকিৎসা এবং তহবিলের ব্যবস্থা এবং তা প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সকল পরিবহণ শ্রমিকের জন্য 'দুর্ঘটনা বিমা' চালু করা।

ঘ) হাইওয়ে ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পূর্বে ও পরে রোড সেইফটি অডিট করতে হবে এবং রোড সেইফটি ম্যানেজমেন্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৬.৫.৪ রিকসা/ব্যটারি রিকসা-ইজিবাইক/ভ্যান চালক

বাংলাদেশে রিকশা, বিশেষ করে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক অন্যতম প্রধান যাত্রীবাহী বাহন। ঢাকায় বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে প্রায় ১৫ লাখ রিকশা চলাচল করছে[91] এবং সারাদেশে প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি তিন চাকার রিক্সা ও ভ্যান রয়েছে,[92] যা প্রায় ৭০-৭৫ লক্ষ পরিবারের কর্মসংস্থানের উৎস এবং প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের জীবিকা এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। রিকশাচালকরা মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আসা দরিদ্র ব্যক্তি, যারা জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে কাজের অভাব, শিক্ষাগত সীমাবদ্ধতা ও পুঁজির অভাবে শহরমুখী হয়ে রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

রিক্সা শ্রমিকেরা মানবেতর পরিবেশে বসবাস করেন এবং নিরাপদ খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা[93], টয়লেট, নিরাপদ আবাসন ও সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। একজন চালক দিনে গড়ে ৭০০-৮০০ টাকা আয় করেন, কিন্তু গ্যারেজ ভাড়া ও কিস্তি বাবদ বড় অংশ ব্যয় হয়। অনেক চালক এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে রিকশা বা ইজিবাইক কিনেছেন, যার কিস্তি পরিশোধে সাপ্তাহিক চাপ রয়েছে।

ব্যাটারিচালিত রিকশার গতির কারণে শহরে অনেক জায়গায় চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এর ফলে চালকদের উপার্জনের একমাত্র উপায়ও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এই বাহনগুলি পরিবেশবান্ধব, নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে চালানো সম্ভব এবং তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং স্বল্প খরচে যাত্রী পরিবহনে

---

[90] বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) গবেষণা অনুযায়ী, পরিবহণ খাতের প্রায় ৮৬ শতাংশ চালক দৈনিক ১৩ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন এবং ৯০ শতাংশের কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই। বিশেষ করে দূরপাল্লার গণপরিবহনে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি দৈনিক ১৫ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন এবং ২০ শতাংশ একেবারেই কর্মবিরতি পান না।

[91] সানজানা চৌধুরী, রিকশা বৃত্তান্ত: কবে, কোথা থেকে, কে প্রথম এই বাহনটি বাংলাদেশে আনেন, বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২১, https://www.bbc.com/bengali/news-59214407

[92] আনোয়ার হোসেন, "ব্যাটারি রিকশা বাড়তে দিয়ে এখন সামলানো যাচ্ছে না," প্রথম আলো, ২১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/b4pe9wztea

[93] প্রায় ৯৪ ভাগ রিক্সাচালক অসুস্থতায় ভোগেন। মুন্নী আক্তার, "আগে চাকরী করছিলাম, কিন্তু পোষায় না'-ঢাকার একজন রিকশাচালক," বিবিসি বাংলা, ২৭ জুন ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-48788566

সক্ষম।[94] কমিশন মনে করে যে নকশা উন্নয়ন, গতি নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ ও একটি বাস্তবসম্মত নীতিমালার মাধ্যমে এ খাতকে নিয়মের মধ্যে এনে রিকশা-ভ্যান চালকদের জন্য একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবিকার পথ তৈরি করা সম্ভব।

কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

ক) প্রতিটি সড়ক ও মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশা সহ ব্যাটারিচালিত, স্বল্পগতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড/বাই লেন নির্মাণ করে সড়কে বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা নিরসন করা। নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং এরিয়া স্থাপন করা এবং পার্কিং এরিয়ায় টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা।

খ) দুর্ঘটনা রোধে ব্যাটারিচালিত বা তিন চাকার যানবাহনের নকশা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কারিগরি ত্রুটি সংশোধন করা ও গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে নকশা আধুনিকায়নে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যান্ত্রিক, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা এবং পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ইজিবাইক, রিকশা সহ ব্যাটারিচালিত বাহন নির্মাতাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে টাস্ক ফোর্স প্রণীত নকশা অনুযায়ী গাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

গ) ব্যাটারিচালিত বা তিন চাকার যানবাহনের জন্য "থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২৪" চূড়ান্ত করে দ্রুত গেজেট প্রকাশ করা এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ঘ) এই যানবাহনগুলিকে একটি সুশৃঙ্খল নীতি কাঠামোয় আনার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন, থানা, উপজেলা ও পৌরসভার ইউনিয়ন/ওয়ার্ডভিত্তিক ব্যাটারিচালিত সব যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান সহজতর করা এবং সকল চালককে সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা।

ঙ) বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় বন্ধ করতে ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা যা অন্যদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি করবে।

চ) কোনোভাবেই শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ নষ্ট/ধ্বংস না করা এবং এ বিষয়ে অভিযান পরিচালনাকারী ব্যক্তিদেরকে সচেতন করা এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটলে অভিযুক্তকে তাদের দায়বদ্ধতা/জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৬.৫.৫ নিমার্ণ শিল্প শ্রমিক

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নির্মাণ খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এই খাতের কর্মসংস্থানের সাধারণ চিত্র হচ্ছে অনিশ্চিত কর্মসংস্থান, স্বল্প মজুরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ। নির্মাণ শ্রমিকদের সারাবছর ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা থাকে না। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৮০ ভাগ শ্রমিকই দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।[95] কর্মসংস্থানের এই অনানুষ্ঠনিকতা নারী শ্রমিকদের জন্য আরো বেশি। ৯০ ভাগ নারী শ্রমিককে দৈনিকভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় যেখানে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনামূলকভাবে মাসিক বা ফুরনভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়।[96]

কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ও অনানুষ্ঠানিকতা ছাড়াও নির্মাণ শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি ও অনিয়মিত বেতন প্রাপ্তির সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া কর্মস্থলে তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও পেশাগত দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব বা নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদানে মালিকের অনীহা, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা, অতিরিক্ত শব্দ ও ধূলার প্রভাব এবং উপযুক্ত শৌচাগার সুবিধার অনুপস্থিতি নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সাথে বেড়েছে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সংখ্যা। অন্যদিকে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কলকারখানা পরিদর্শকেরা নির্মাণাধীন ভবন নিয়মিত ও যথাযথভাবে পরিদর্শন করেন না।

---

[94] ব্যাটারিচালিত বাহনে একজন যাত্রী পরিবহণে যেখানে মাত্র ১৩ পয়সা খরচ হয়, সেখানে অন্য পরিবহণে ন্যূনতম ৫৭ পয়সা খরচ হয়।

ইমরান হাবিব রুমন, "ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক: কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশ্ন," সর্বজন কথা ,৭ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (২০২১) https://sarbojonkotha.info/sk-28-battery-rickshaw/

[95] Jakir Hossain, Afroza Akter, Mostafiz Ahmed, Md. Mahmudul Haque, and Sekender Ali Mina, "Workers Rights in the Construction Sector of Bangladesh" Safety and Rights Society 2024, Page 30.

[96] প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা 30.

দেশ ছাড়াও বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মধ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রায় ৬০ শতাংশ নির্মাণ খাতে নিয়োজিত।[97] প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিবাসন প্রত্যাশী নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিদেশে অভিবাসন সহজীকরণ করা আবশ্যক।

শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা দূর করে সকল শ্রমিকের জন্য কাজের সুযোগ ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং নারী শ্রমিকদের কাজের সুযোগ এবং মজুরি বৈষম্য দূর করা।

খ) ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল সংকট দূর করে নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

গ) নির্মাণ শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিতে রেশনিং ব্যবস্থা সহ সরকারি উদ্যোগে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য কলোনি স্থাপন করে সুলভ মূল্যে দীর্ঘমেয়াদি লিজ প্রদানের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিত করা। কলোনিতে শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত বা আজীবন পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এক জীবনের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণের বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক। তাছাড়া নির্মাণ শ্রমিকরা যেহেতু উঁচু ভবনে কাজ করেন, তাই নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য একক বিমা চালু করা প্রয়োজন।

ঙ) দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে স্থাপনার মূল মালিক এবং ডেভেলপারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করার বিধান রাখা।

চ) অভিবাসন প্রত্যাশী নির্মাণ শ্রমিকদের বৈধ ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও নীতিগত বিষয়। এজন্য প্রথমত, বিদেশে যেতে আগ্রহী নির্মাণ শ্রমিকদের পাসপোর্ট ও ভিসা প্রসেসিং সহজতর করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সরকারিভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। তৃতীয়ত, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চতুর্থত, চাকরির তথ্য সরকারিভাবে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা, বিদেশে যাওয়ার আগে চাকরির শর্তাবলি, বেতন-ভাতা, চাকরির নিশ্চয়তা সহ শ্রমিককে বিদেশে প্রেরণের জন্য সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং বিদেশগামী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ।

৬.৫.৬ বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

বাংলাদেশে বিগত চার দশকে স্বাস্থ্যসেবার বৃহৎ অংশ বেসরকারি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার ৬৫ শতাংশ দিচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।[98] বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক (রোগ নির্নয়) সেন্টারে বিশাল আকারের পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। বড় বড় মহানগর, শহর ছাড়িয়ে বর্তমানে এই খাত উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়েও প্রসারিত। সুনির্দিষ্ট কোনো জরিপ বা তথ্য না থাকলেও এই খাতে আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সংস্কার পদক্ষেপসমূহ প্রস্তাব করছে:

ক) বেসরকারি স্বাস্থ্য শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকলেও বিপুল সংখ্যক শ্রমিক/কর্মচারী শ্রম আইনের কোনো সুযোগ সুবিধা তারা পান না। তাই এই খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রম আইন অনুযায়ী সকল অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারি তত্ত্বাবধান জোরদার করা প্রয়োজন।

খ) মজুরি বঞ্চনা দূর করতে শ্রম আইন অনুযায়ী নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করে বর্তমান বাজারদর বিবেচনায় তাদের জন্য বেঁচে থাকার উপযোগী নিম্নতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা জরুরি।

---

[97] Laurent Bossavie, "Low-skilled temporary migration policies: The case of Bangladesh," *background paper to the World Development Report* (2023).

[98] "বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা," প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০২১। https://www.prothomalo.com/lifestyle/বেসরকারি-খাতে-বাংলাদেশের-স্বাস্থ্যসেবা

গ) কর্মরত নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিমার ব্যবস্থা করা, যাতে অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে কর্মচ্যুতি ঘটলে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কোনো ঝুঁকির সম্মুখীন না হতে হয়।

ঘ) বর্তমানে এই খাতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার হিস্যা থেকে বঞ্চিত। প্রতি বছর শেষে ব্যক্তি/কর্পোরেট/যৌথ মালিকানাধীন নির্বিশেষে সকল নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে ব্যালেন্স শিট প্রদান করা ও প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় শ্রমিক-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৫.৭ হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক

দেশে প্রতিনিয়ত বাড়ছে হোটেল ও রেস্টুরেন্টের সংখ্যা, বাড়ছে এ খাতে শ্রমিকের অংশগ্রহণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুর‍্যোর তথ্য অনুযায়ী এই খাতে কর্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ২০ লাখ ৭১ হাজার এর কিছু বেশি। যার মধ্যে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৭০ জন এবং নারী শ্রমিক ১ লাখ ৭৩৭ জন।[99] হোটেল ও রেস্টুরেন্টে কর্মরত শ্রমিকদের নেই সঠিক কর্মঘণ্টা এবং তাদের মজুরি কাঠামোও অপ্রতুল (সর্বশেষ ২০১৭ সালে ঘোষিত নূন্যতম মজুরি—৩৭১০ টাকা)।[100] এ খাতে নিয়োজিত বেশিরভাগ শ্রমিক অস্থায়ী বা মৌসুমি ভিত্তিতে নিয়োগ পান, এক তৃতীয়াংশের বেশি কর্মী প্রতিদিন নয় থেকে দশ ঘণ্টা কাজ করে, আবার এক তৃতীয়াংশের বেশি কর্মী প্রতিদিন এগারো থেকে বারো ঘণ্টা কাজ করে। এছাড়া এক চতুর্থাংশের বেশি কর্মী কোনো বিরতি বা বিশ্রাম ছাড়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন।[101] হোটেল ও রেস্তোরাঁয় কর্মরত ৩২ শতাংশ কর্মী দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি পান এবং বাকি ৬৮ শতাংশ কর্মীরা মজুরি পান সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে, যা প্রায়শই অপ্রতুল।[102]

বাংলাদেশের হোটেল-রেস্টুরেন্টে কর্মীরা মৌখিক চুক্তিতে নিয়োগ পান, ফলে তাদের কাজের কোনো স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা নেই। এই খাতে আবার শিশুশ্রমও বিদ্যমান, শিশুরা সাধারণত অনানুষ্ঠানিকভাবে টেবিল বয় বা ওয়েটার হিসেবে কাজ করে। আইন অনুযায়ী শিশুশ্রমের জন্য কাজের সময় ৬ ঘণ্টা। তবে মালিকরা এটি ১২ ঘণ্টা নির্ধারণ করেন, অথচ তাদের দৈনিক মাত্র ৮০—১২০ টাকা মজুরি দেয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মতো কাজ করলেও তারা কম মজুরি পান এবং এতে তাদের কিছুই করার থাকে না। হোটেল ও রেস্তোরাঁয় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) হোটেল-রেস্টুরেন্ট খাতের শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মালিক কর্তৃক বাধ্যতামূলক লিখিত নিয়োগপত্র বা চুক্তিপত্র প্রদান এবং তা নিশ্চিতকরণে সরকারি (যেমন; ডাইফ এ ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে) তদারকি জোরদার করা অপরিহার্য।

খ) শ্রম আইন অনুযায়ী সকল হোটেল-রেস্টুরেন্ট শ্রমিকের জন্য সাপ্তাহিক দেড় দিন ছুটি, স্ব বেতন অন্যান্য ছুটি, উৎসব ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

গ) রোজার মাসে দিনের বেলা হোটেল-রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকার অজুহাতে কিছু প্রতিষ্ঠিত হোটেল ছাড়া অধিকাংশ হোটেলে এক থেকে দেড় মাসের জন্য শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। এভাবে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। এ সময় ছাটাইকৃত হোটেল-রেস্টুরেন্ট শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ঘ) হোটেল-রেস্টুরেন্টে শিশুশ্রম রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে এবং শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

---

[99] বিবিএস, হোটেল রেস্টুরেন্ট জরিপ ২০২১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যাবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২।

[100] বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিকের জন্য সরকার কর্তৃক নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সর্বশেষ সাল ও সর্বনিম্ন গ্রেডের নিম্নতম মোট মজুরি। https://mwb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mwb.portal.gov.bd/page/8157a5ff_d278_4cbe_92ba_8b010a3b6851/2024-12-03-10-20-9c930c5fd8de477fe0030df425d0b605.pdf

[101] BILS, Internship Study Reports on Four Sectors. https://bilsbd.org/wp-content/uploads/2019/02/Internship-Study-Report_BILS.pdf

[102] প্রাগুক্ত।

৬.৫.৮ গৃহ শ্রমিক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫-১৬ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী গৃহস্থালির কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ ৬৯ হাজার, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী এবং ২০ শতাংশ পুরুষ। এদের মধ্যে ৬৯.৬ শতাংশ শহর অঞ্চলে এবং ৩৭.৩ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে কাজ করেন।[103] বাংলাদেশ শ্রম আইনে গৃহশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত না হবার জন্য এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। বিপুল এই শ্রম জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় ২০১৫ সালে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এর জন্য আইন না থাকায় নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভবপর হচ্ছে না।

গৃহশ্রমিকদের নিয়োগপত্র নেই, মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ হওয়ায় অধিকার খর্ব হলেও প্রতিকার পাওয়া কঠিন। তাদের মধ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছে, সেক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসতবাড়িতে কাজ করা গৃহশ্রমিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই শিশু গৃহকর্মী।[104] গৃহশ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি, স্বাস্থ্যসেবা, বিশ্রাম ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হন এবং সরকারি কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুফল কম পান।[105] আবার বিদ্যমান সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সম্পর্কে অধিকাংশ শ্রমিক জানেন না। গৃহশ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়নে এবং তাদের আইনি অধিকার নিশ্চিতে কমিশন কর্তৃক দাবিকৃত প্রস্তাবসমূহ হলো:

ক) ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫’ প্রণয়নের পর নয় বছর অতিবাহিত হলেও এর কোনো বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয় না। তাই গৃহশ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয়া এবং তাদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত ‘গৃহকর্মীর কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা’ ২০১৫-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

খ) গৃহশ্রমিকদের (আবাসিক, অনাবাসিক, খণ্ডকালীন, স্থায়ী) জন্য একটি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান চুক্তি প্রণয়ন করা, যেখানে কর্মঘণ্টা, বেতন, ছুটি, খাওয়া, থাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুবিধা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে। শ্রমিক যদি নিয়োগকতার্র বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করতে চান সেক্ষেত্রে কার বরাবর, কোন্ স্থানে, কীভাবে করবেন এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা সহ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

গ) বিপুল সম্ভাবনা, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে গৃহশ্রমিকদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যা তাদের কর্মসংস্থানের আরও বেশি সুযোগ ও নিরাপত্তা প্রদান করবে।

ঘ) গৃহকর্মে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা জরুরি।

ঙ) গৃহকর্মীদের সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করা।

৬.৫.৯ পরিচর্যা কর্মী (কেয়ার ওয়াকার্স)

বাংলাদেশে পরিচর্যা খাতের সঠিক পরিসংখ্যান অনুপস্থিত; যেমন- মোট খাতের সংখ্যা, কর্মরত শ্রমিকের পরিমাণ ও লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত। অধিকাংশ পরিচর্যা কর্মী শোভন কাজের নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত এবং এ খাতে তদারকি ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা ও চট্টগ্রামে গৃহকর্ম, নার্সিং, স্বাস্থ্যসেবা, শিশু ও প্রবীণদের যত্নের মতো খাতে কর্মরত শ্রমিকরা ওভারটাইম সুবিধা, কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাবে ভুগছেন। ৭৫ শতাংশ শ্রমিক অতিরিক্ত কাজের পরও নির্ধারিত পারিশ্রমিক পান না, ৪০ শতাংশ পূর্ব ঘোষণা ছাড়া চাকরি হারান এবং ৫৭ শতাংশ রোগ বা ভাইরাসের ঝুঁকিতে থাকেন। তদুপরি ১৭ শতাংশ দাহ্য পদার্থজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন হলেও অর্ধেকেরও কম নিয়োগকর্তা নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করেন।[106]

পরিচর্যাকর্মীদের সার্বিক উন্নয়নে কমিশন নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছে:

---

103 Workers_Situation_Analysis_Report_2019_BILS.pdf?utm_source=chatgpt.com

104 Workers_Situation_Analysis_Report_2019_BILS.pdf?utm_source=chatgpt.com

105 "বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের অধিকার: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও করণীয়," DeshNewsBD, জানুয়ারি ২৪, ২০২৫, https://deshnewsbd.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/3347

106 Mostafiz Ahmed, Decent Work Status of the Care Workers: A Rapid Assessment, ILO and BILS, 2024.

ক) সরকারি বেসরকারি সকল শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের তালিকা করে তাদের একটি নীতি কাঠামোর মধ্যে পরিচালনা করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকার কতৃর্ক পরিচালিত শিশু যত্ন কেন্দ্রে আউটসোর্সিংয়ের পরিবর্তে এর সাথে সংশ্লিষ্টদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

খ) এই খাতের কর্মীদের সময়োপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাইরে দক্ষ পরিচর্যা কর্মী হিসেবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ) কেয়ার অর্থনীতি আরও প্রসার ঘটাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তিগত/উদ্যোগে গড়ে উঠা সেন্টারসমূহকে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান এবং একটি নির্দিষ্ট মডেল অনুসরণ করে সেন্টারসমূহকে পরিচালিত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ) পারিবারিক দায়িত্ব থাকা শ্রমিকদের কাজ ও পারিবারিক জীবনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নমনীয় কাজের (কর্মসংস্থানের ধরন ও চুক্তি, কর্মঘণ্টা, ছুটির ব্যবস্থা) জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইনি ও নীতি কাঠামো কাঠামো তৈরি করা এবং সে আলোকে কর্মক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা প্রস্তুত করা।

ঙ) পরিচর্যা কর্মীদের সাথে সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৫৬ ও ১৮৩ অনুসমর্থন করা।

৬.৫.১০ বিউটি পার্লার কর্মী

দেশে বিউটি পার্লার শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে এই খাতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বল্প শিক্ষিত নারীরা বিশেষ করে নৃগোষ্ঠী/আদিবাসী নারীরা এই খাতে বেশি নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত পার্লারের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখের মতো।[107]

এই খাতের শ্রমিকেরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে কিন্তু তারা অধিকার সম্পর্কিত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত।[108] শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি ও অধিকার পান না। বেশিরভাগ পার্লার কর্মীদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র না থাকার কারণে তাদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অপ্রতুল ছুটি, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বেতন ও অতিরিক্ত সময় কাজ করা তাদের নিত্য সঙ্গী। এই খাতে নিম্নতম মজুরি কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে কর্মীরা কম মজুরিতে কাজ কতে বাধ্য হন।

বিউটি পার্লারকর্মীদের শোভন কাজের পরিবেশ এবং সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতে, কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করছে:

ক) সকল বিউটি পার্লার শ্রমিকদের পেশাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সুরক্ষার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

খ) এ খাতের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করে কাজের মান ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা ও তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি কাঠামো তৈরি করা।

গ) কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান সহ সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

ঘ) কর্মক্ষেত্রে ও রাত্রিকালীন বাড়ি ফেরার সময় হয়রানি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা এবং সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

---

107 রয়া মুনতাসীর, "এ দেশের বিউটি পারলার," প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০১৯। এ দেশের বিউটি পারলার | প্রথম আলো

108 জাকির হোসেন, মোস্তাফিজ আহমেদ, ও আফরোজা আখতার,

৬.৫.১১ কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিক

বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে মানুষ কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্সসমূহের উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিকভাবেই বহু মানুষ এই খাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু এই কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখলেও তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। কর্মক্ষেত্র থেকে এদের কোনো নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র দেয়া হয় না যা তাদের নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি বাড়ায়।

এই খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি এত কম (কমিউনিটি সেন্টার শ্রমিকদের কাজ প্রতি দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা এবং ডেকোরেটার্স শ্রমিকদের মজুরি ৫০০ টাকা) যে উৎসব বা ভরা মৌসুমেও তাদের মাসিক আয় ৫-৬ হাজার টাকার বেশি হয় না। এরা কোনো ধরনের নিয়মিত সুবিধা যেমন, ছুটি, উৎসব ভাতা, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য ওভারটাইম ভাতা বা সামাজিক সুরক্ষা পান শ্রমিকদের এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে এবং শ্রম অধিকার সুরক্ষায় ও জীবনমান নিশ্চিতে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুসারে এই খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম শোভন ও মর্যাদাকর জীবনধারণ উপযোগী মজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই উদ্যোগ তাদের জীবিকা নির্বাহের নিশ্চয়তার সাথে সাথে কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবে।

খ) বিশেষ দিনগুলিতে, যেমন হিন্দুদের বিয়ের দিনে, শ্রমিকদের অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। এ অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করা। কেননা আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও বাংলাদেশ শ্রম আইন ১০৮ ধারা অনুসারে অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে।

গ) বর্তমানে কমিউনিটি সেন্টারসমূহে দুর্ঘটনাবশত কোনো ক্রোকারিজ ভেঙে গেলে তার জন্য শ্রমিকদের জরিমানা করার অঘোষিত নিয়ম বাতিল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি একটি অমানবিক চর্চা যা শ্রমিকদের মনের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

ঘ) রমজান মাসে কমিউনিটি সেন্টারগুলিতে কোনো কাজ থাকে না বিধায় পুরো রমজান মাস এই খাতের শ্রমিকেরা আয় শূন্য থাকেন। তাই রমজান মাসের কর্মহীন সময়ে অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এই একমাস তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা বা বিনামূল্যে এক মাস চলার মত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা যেতে পারে। এছাড়া শ্রম আইন অনুসারে মালিকের পক্ষ থেকে দুই ঈদে বোনাস প্রদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঙ) এই খাতে কর্মরত শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিপূরণ বা সবেতন ছুটি পান না। শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং চিকিৎসাকালীন সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে সবেতন ছুটি প্রদান নিশ্চিত করা জরুরি।

চ) এ সেক্টরে কোনও কারণ ছাড়াই প্রায়শই শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। এখানে ছাঁটাই বলতে মালিকের তালিকা থেকে শ্রমিকের নাম বাদ দেয়াকে বুঝানো হয়েছে। শ্রম আইন অনুযায়ী যথাযথ কারণ ও আগাম নোটিশ ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ছ) বর্তমানে এই খাতে অনেক অদক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছেন। তাই এই খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কাজের ধরন অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা যা শ্রমিকের পেশাদারিত্ব ও কাজের মান উন্নয়নের সাথে সাথে এ সেক্টরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

৬.৫.১২ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্মী

বাংলাদেশে মোট ৪,৫৪৭টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) রয়েছে যা ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে কাজ করছে।[109] প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সাধারণত ২ জন উদ্যোক্তা কাজ করেন, যেখানে একজন পুরুষ ও একজন নারী উদ্যোক্তা আছে। এই খাতের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। এইভাবে

---

109 মো. ওসমান গনি, গ্রামীণ উন্নয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, প্রতিদিনের সংবাদ। ২০ জুন ২০১৬ https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/editor-choice/8255

৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে মোট ৯,০৯৪ জন উদ্যোক্তা কর্মরত আছেন।[110] উদ্যোক্তারা স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং সেবা প্রদান করেন। এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের নির্ধারিত কর্মঘণ্টা বা ছুটির কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই। ইউডিসিতে কর্মরত উদ্যোক্তাদের শোভন কাজের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নের সংস্কার প্রস্তাব করছে:

ক) ৪৫৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে পরিচালিত চুক্তিপত্র বাতিল করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখের ০৫.১৬৬.০২২.০০.০০.০৪৪.১৯৮৮-১৩৬৫ (২৫০) নম্বর পরিপত্র মোতাবেক এই খাতে নিয়োজিতদের রাজস্বখাতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) এই সেক্টরের সাথে যুক্ত কর্মীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হলেও সকল ক্ষেত্রে শ্রম আইন অনুযায়ী কাজের শর্তসমূহ নিশ্চিত করা যেখানে কর্মঘণ্টা, মজুরি, ছুটি, চাকরির নিরাপত্তা ও সুরক্ষার মত মৌলিক বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে শোভন কাজ নিশ্চিত করা যায়।

গ) এই সেক্টরে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতার প্রয়োজন বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগের উপর। সুতরাং এই পেশায় সংশ্লিষ্টদের নিয়োগের একটি মানদণ্ড নিধার্রণ করতে হবে এবং তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো, যাতে তারা সফল উদ্যোক্তা হতে পারেন। অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার পার্সোনাল নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ অনুসারে 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর' পদে নিয়োগের নিয়ম অনুযায়ী তাদের নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬.৬ পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী

৬.৬.১ সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মী

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের জন্য প্রথাগত শ্রম আইন অনুযায়ী কিছুটা আলাদা পরিস্থিতি বিদ্যমান। সাংবাদিকদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়, যার আওতায় সংবাদপত্র কর্মীদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ আইনের অধীনে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের মজুরি বোর্ড হয়ে আসছিল। ২০০৬ সালে এই আইন বাতিল করে সংবাদপত্রের জন্য বেশ কয়েকটি ধারা শ্রম আইনে যুক্ত করা হয়।[111] এরপর শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। মজুরি বোর্ড অনুযায়ী সাংবাদিক, সকল সংবাদপত্রের কর্মকর্তা কর্মচারি, প্রেস শ্রমিক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি প্রাপ্ত হন। শ্রম আইনে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বলা হয়েছে সংবাদপত্র শ্রমিক। তবে সেখানে অনলাইন এবং ব্রডকাস্ট অর্থাৎ রেডিও টেলিভিশন কর্মীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[112] ফলশ্রুতিতে অনেক গণমাধ্যমকর্মী আইনের সুরক্ষার বাইরে রয়ে গেছেন।

সকল গণমাধ্যমকর্মীদের আইনি সুরক্ষার জন্য সাংবাদিকদের দাবির মুখে নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অ্যাক্টের সঙ্গে টেলিভিশন ও ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক ও কর্মীদের চাকরির শর্তগুলি যুক্ত করে ২০১৭ সালে 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন ২০১৭' নামে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। খসড়ায় ব্যাপক পরিবর্তন করে সংসদে যে বিল উত্থাপন করা হয় তাতে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম কর্মীদের সংজ্ঞায়ন সহ অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।[113] গণমাধ্যমের ধরন ও ধারণা বদলে যাওয়ার কারণে নতুন ধরনের গণমাধ্যমে অপ্রথাগত সংবাদকর্মী যেমন খণ্ডকালীন, চুক্তিভিত্তিক, সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক, সুনির্দিষ্ট ঘটনাভিত্তিক সংবাদকর্মী, ফ্রি ল্যান্সার গণমাধ্যমকর্মীদের অন্তর্ভুক্তির ঘটেছে যাদের সম্পর্কে খসড়ায় উল্লেখ নেই। প্রস্তাবিত আইনে সপ্তাহে ৪৮ কর্মঘণ্টা কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে যা সপ্তাহে ৬ দিন কর্মদিবস নির্দেশ করে। খসড়ায় ওভারটাইমের বিষয়েও সঠিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। আবার আলোচ্য বিলের ১২ ধারায় গণমাধ্যম মালিকদের অতিরিক্ত কর্মী ছাঁটাই করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে অতিরিক্ত কর্মী কারা এই বিষয়ে সেখানে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। ন্যূনতম ওয়েজ বোর্ড গঠনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক না করে সরকারের বিবেচনা ও ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। ওয়েজ বোর্ড না থাকলে বেতনকাঠামো কেমন হবে, তারও কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। একইভাবে ভবিষ্যত তহবিল গঠনের বিষয়টিও মালিক পক্ষের ইচ্ছাধীন রাখা

---

110 প্রাগুক্ত।

111 বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

112 বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ২(৭২), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

113 আজাদুর রহমান চন্দন, "সাংবাদিকদের চাকরি-আইন কেন জরুরি," bdnews24.com অক্টোবর ৮, ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/opinion/d2182597a32b

হয়েছে। প্রস্তাবিত বিধানে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম কর্মীদের চাকরির সুরক্ষা, সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি ও অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও দরকষাকষির বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়নি। বাতিল করা হয় বিদ্যমান গ্র্যাচুয়িটি সুবিধা। এর পরিবর্তে নামমাত্র ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়। কমানো হয় অর্জিত ছুটি, বিনোদন ছুটি সহ বিদ্যমান অনেক সুবিধা। বাদ দেওয়া হয় নৈশ পালা ভাতা ও দায়িত্ব ভাতার মতো সুবিধা। সাংবাদিক ও সম্পাদকের কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাই রাখা হয়নি। গড়পড়তা সবাইকে 'গণমাধ্যম কর্মী' নামে পরিচয় দেওয়া হয়।[114] পরবর্তীতে আইনটি পাস হয়নি।

আবার বিদ্যমান শ্রম আইনেরও সঠিক প্রয়োগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে পত্রপত্রিকার সাংবাদিকদের বেতন-ভাতার জন্য নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ অনুসরণ করার কথা থাকলেও কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানা হয় না সেই মজুরি বোর্ড।[115] আবার টেলিভিশন ও অনলাইন সাংবাদিকদের জন্য এই মজুরি বোর্ড কার্যকর না। তাদের জন্য আলাদা কোনো মজুরি বোর্ডও নেই। টেলিভিশনে ক্যামেরার পিছনে যারা কর্মরত আছেন তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট পদবি নেই। পেশার ধরন ও কাজ একই হলেও বিভিন্ন টেলিভিশনে তারা বিভিন্ন নামে কর্মরত। অন্যদিকে একই ধরনের পেশায় পত্রিকায় কর্মরতদের ফটো সাংবাদিক হিসেবে অবহিত করা হয়। এটা একই ধরনের কাজে বৈষম্য তৈরি করছে।

শ্রম আইন বাস্তবায়নে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং কারখানা পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের, তবে সাংবাদিকতা এবং সংবাদমাধ্যমে এই দায়িত্বের কোনো ভূমিকা নেই। এই খাতে দায়িত্ব পালন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডিএফপি। অথচ শ্রম আইনে এর সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) সব ধরনের সংবাদমাধ্যমের (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট) সাংবাদিক ও কর্মীদের জন্য 'দ্য নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অ্যাক্ট ১৯৭৪'-এর আদলে পৃথক আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান শ্রম আইনে পৃথক অধ্যায় সংযোজন করা।

খ) বিদ্যমান শ্রম আইনে 'সংবাদপত্র শ্রমিক'-এর সংজ্ঞা সম্প্রসারণ করে 'গণমাধ্যম শ্রমিক/কর্মী' করা এবং মাধ্যমে অনলাইন এবং ব্রডকাস্ট অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশন সহ সকল ধরনের গণমাধ্যম কর্মীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সকল সাংবাদিকের জন্য নিয়োগপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

ঘ) সাংবাদিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং ছুটির বিধানসমূহ কার্যকর করা এবং নারী সাংবাদিকের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করা।

ঙ) ক্যামেরার পিছনে যারা কর্মরত আছেন তাদের সকলকে চিত্র সাংবাদিক হিসেবে অবহিত করা।

চ) সাংবাদিকদের বেতন নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি মিডিয়ার কর্তৃপক্ষ/মালিক কর্তৃক প্রতি মাসের বেতন পরিশোধের ডকুমেন্ট কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ।

ছ) সকল সাংবাদিকের জন্য ঝুঁকি ভাতা, বিমা ও পেনশন চালু করা।

জ) সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সংস্কারের মাধ্যমে এটাকে সকল সাংবাদিকের কল্যাণে প্রকৃত অবদান রাখতে সক্ষম করা।

৬.৬.২ মৎস্যজীবী ও জেলে শ্রম জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের ১৪ লক্ষ নারী সহ প্রায় ২ কোটি অর্থাৎ ১২ শতাংশ লোক মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এবং ৯৬ শতাংশ শ্রমিক অপ্রশিক্ষিত।[116] মৎস্য শ্রমিকদের মধ্যে জেন্ডার, বয়স এবং স্থানভিত্তিক বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মৎস্য শ্রমিকরা প্রায়শই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করেন। সমুদ্রে মাছ ধরার ঝুঁকি, ঠান্ডা ও রোগের শঙ্কা, রাসায়নিকের সংস্পর্শ এবং অনিয়মিত ও কম আয় তাদের জীবনে সংকট তৈরি করে। আয় কম হওয়ায় অনেক সময় তারা মহাজন বা ফিশিং ট্রলার মালিকদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন, যা তাদের আরও দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়। মৎস্য শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মানবিক মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সকলের একসাথে কাজ করা জরুরি।

---

114 আজাদুর রহমান চন্দন, "সাংবাদিকদের চাকরি-আইন কেন জরুরি," bdnews24.com অক্টোবর ৮, ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/opinion/d2182597a32b

116 বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (২০২৪),

বিভিন্ন সময়ে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অভিযানের সময় শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ (যেমন মাছ ধরার জাল, নৌকা) নষ্ট/ধ্বংস করতে দেখা যায় যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এতে করে শ্রমিকের বর্তমান আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের আয়ের সুযোগও নষ্ট হয়।

এই বিষয়ে কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে:

ক) জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল করে লাইসেন্স প্রথা চালু করে প্রকৃত মৎস্যজীবী ও জেলেদের আইন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে মাছ ধরার অধিকার দেওয়া।

খ) মাছের প্রজননকালীন সময়ে সরকার ঘোষিত যে সময়কালের জন্য মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়, সেই কর্মহীন সময়ে নিষেধাজ্ঞার কারণে শ্রমিকদের যে ক্ষতি হয়, সেটা পর্যালোচনা করে মৎস্যজীবী ও জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মের ব্যবস্থা করা বা ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য জীবনধারণ উপযোগী বরাদ্দ এবং রেশনিং সহ প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ) ফিশিং ট্রলার মৎস্যজীবীদের জন্য ২০২২ সালে প্রকাশিত গ্যাজেট বাস্তবায়ন করা।

ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শোষণের হাতিয়ার "দাদন" প্রথা (৩০% সুদ হার) বিলোপে আইনগত ব্যবস্থা করা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে সহজ শর্তে এবং বিনা সুদে সরকারি স্বল্পমেয়াদি ঋণ কর্মসূচি চালু করে শ্রমিকদের মালিক/মহাজন হতে দাদন নেবার প্রথা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।

ঙ) সকল শ্রমিকের পরিচয়পত্র নিশ্চিত এবং একটি বিশেষ "ট্র্যাকিং এন্ড মনিটরিং" ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সমুদ্রে মাছ শিকার করতে যাওয়া ও ফেরত আসা শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিপদ সংকেত অবগত করা এবং পরিবারকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত করার পদ্ধতি চালু করা। এক্ষেত্রে কোস্টগার্ডের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনে উদ্ধার করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা।

চ) প্রতিটি মাছ ধরা ঘাটে শ্রমিকদের মাছ নিয়ে উঠানামার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা এবং মাছ সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি এলাকায় বরফকল নিমার্ণ করা।

ছ) উপকূলীয় জেলেদের বাসস্থানের সমস্যা প্রকট। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাগর শিকস্তি খাস জমি উপকূলীয় জেলেদের বরাদ্দ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা।

জ) মাছ ধরার উপকূলীয় ছোটো বোট মালিকদের হয়রানিমূলক পরিবেশে লাইসেন্সবিহীন বোটকে অবতরণ ঘাট ব্যবহার করতে না দেয়া।

ঝ) মৎস্য শিকার এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা।

ঞ) ইলিশ প্রজননকালে ইলিশ শিকার নিষিদ্ধের সময়সীমা ২২ দিনের জায়গায় ১৫ দিন করা।

ট) জলদস্যু, বালুদস্যু কর্তৃক জেলে আহত ও নিহত হলে এবং মৎস্য শিকারের উপকরণ জাল, নৌকা হারালে শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু আইন প্রয়োগ করে দায়ী ব্যক্তিদের কাছ থেকে শ্রম আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা।

ঠ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেলেদের মৃত্যু বা মৎস্য শিকারের উপকরণের ক্ষতি হলে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক পরিবারের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ড) কোনোভাবেই শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ নষ্ট/ধ্বংস না করা এবং এ বিষয়ে অভিযান পরিচালনাকারী ব্যক্তিদেরকে সচেতন করা এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটলে অভিযুক্তকে তাদের দায়বদ্ধতা/জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঢ) মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় ইত্যাদি সকল ধরনের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত রাখা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ণ) মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জাহাজভাঙা শিল্প কিংবা অন্যান্য শিল্প স্থাপনের কারণে সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলে সম্প্রদায় এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বালু উত্তোলন ও বাল্কহেডের কারণে মাছ ধরা কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬.৬.৩ হকার্স/শহর অঞ্চলে স্বনিয়োজিত শ্রম জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলিতে লক্ষাধিক হকার কর্মরত, যাদের বেশিরভাগ পুরুষ।[117] অস্থায়ী ভিত্তিতে স্বনিয়োজিতভাবে কাজ করে বিধায় তাদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও ছুটির ব্যবস্থা নেই; তারা দৈনিক ৮–১২ ঘণ্টা কাজ করেন। হকারদের প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি না থাকায় এ খাতটি অপ্রাতিষ্ঠানিক রয়ে গেছে। অনেক হকার স্থানীয় সংস্থার কাছ থেকে পরিচয়পত্র পেলেও এটি সর্বজনীন নয়।[118] হকার বোর্ড গঠনের প্রস্তাব থাকলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

হকাররা সাধারণত নিজেদের ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলেও অবৈধ চাঁদাবাজি, উচ্ছেদ অভিযান এবং জব্দ মালামাল ধ্বংস করার ঘটনা তাদের পেশাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। তাদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অনিরাপদ—ধূলাবালি, বর্জ্য, দুর্গন্ধ এবং খোলা জায়গায় অবস্থানের ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি সর্বব্যাপী। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা, চিকিৎসা বা কল্যাণমূলক কোনো সুবিধাও তারা পান না। পুনর্বাসনের দাবি দীর্ঘদিনের হলেও গৃহীত কার্যক্রমগুলি কখনোই কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না এবং তারা প্রশাসনিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) শহর অঞ্চলে বা বিশেষ এলাকাভিত্তিক স্বনিয়োজিত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার/যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হকারদের পরিচয়পত্র প্রদান করা ও শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।

খ) সকল ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি হয়রানিমুক্ত ব্যবসা পরিচালনার জন্য “বিশেষ হকার বাণিজ্যিক এলাকা স্থাপন” করা।

গ) আকস্মিক ও অপরিকল্পিত উচ্ছেদের সময় হকারদের জীবিকার উপকরণ ধ্বংস না করা এবং উচ্ছেদ বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সচেতন করা।

গ) আকস্মিক ও অপরিকল্পিত উচ্ছেদের মাধ্যমে কাজের অনিশ্চয়তা রোধে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পুনর্বাসন পরিকল্পনার শুরু থেকেই শ্রমিক প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৬.৬.৪ মার্কেট/দোকান কর্মচারী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ২৫ লাখ ৪১ হাজার পাইকারি ও খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯২ লাখ লোক কর্মরত আছেন এবং এর মধ্যে ২ লাখ ৩ হাজার ১৯১ জন নারী কর্মী।[119] অন্যদিকে দোকান কর্মচারী ফেডারেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সারাদেশে দোকান, শপিংমল, চেইনশপ, ডিপার্মেন্টাল ষ্টোর, রিটেইলশপ, হোলসেল, ইলেকট্রিক দোকান, সেলুন, বিউটি পার্লার, ওষুধের দোকান এই ১০টি সেক্টরে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক দোকান কর্মচারী কাজ করেন।[120] দোকান কর্মচারীদের কোনো নিয়োগপত্র নেই, কোথাও কোথাও শুধু নামে মাত্র পরিচয়পত্র আছে। তাদের কোনো নিদিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা নেই। দৈনিক গড়ে ১০/১২ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। তবে অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনো ওভারটাইম ভাতা পান না। এছাড়া বিশেষ দিনগুলিতে বা বিভিন্ন উৎসবে সময়ের কর্মঘণ্টার কোনো হিসেব থাকে না। শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের দেড়দিন সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়ার কথা থাকলেও কোনো দোকান কর্মচারী

---

117 মো: মাজহারুল ইসলাম, মো: আলী হায়দার, শরীফ মো: আমিরুল ইসলাম, এবং সৈয়দ মেহেদী হাছান, ‘চট্টগ্রাম শহরের হকারদের জীবন ও জীবিকা এবং নগরীয় প্রাতিবেশিক এলাকায় তার প্রভাব’, ভূগোল ও পরিবেশ জার্নাল ১১তম বর্ষ, মার্চ, ২০২১ https://www.researchgate.net/publication/352777310_cattagrama_saharera_hakaradera_jibana_o_jibika_ebam_nagariya_pratibesika_elakaya_tara_prabhaba_Street_vendor%27s_livelihood_and_their_impact_in_the_urban_neighbourhood_A_case_study_in_Chittagong_city

118 সাইদুল ইসলাম, থমকে আছে ঢাকা দক্ষিণ সিটির হকার পুনর্বাসন উদ্যোগ, ডেইলি ভোরের ডাক ডট কম, ৮ জানুয়ারি ২০২। https://www.dailybhorerdak.com/news/237933

119 বিবিএস, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায় জরিপ প্রতিবাদন ২০২১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যাবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২। 2022-09-11-07-01-f7682f00c346db36d7060ad3d8564197.pdf

120 ৬০ লক্ষাধিক দোকান কর্মচারীদের ঈদ বোনাস ও রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবিতে মানববন্ধন, সময় নিউজ, ২ মার্চ ২০২৪। https://somoynewsbd.net/%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE/

তা পান না। বড়জোর এক দিন সাপ্তাহিক ছুটি পান, তবে উৎসবের মাসগুলিতে তাও পান না। এই সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ডও নেই, ফলে মালিকেরা তাদের ইচ্ছে মাফিক কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করেন যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কর্মচারীদের ন্যায্য চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। বড় বড় শপিং মল ছাড়া বেশির ভাগ কর্মস্থানে বা তার আশেপাশে দোকান কর্মচারীদের জন্য কোনো স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নেই। এমনকি নারী কর্মচারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই।

শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) দোকান কর্মচারীদের কোনো নিয়োগপত্র না থাকায় তাদের চাকরি মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এজন্য চাকরি থাকাকালীন ও চাকরি পরবর্তী শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় চাকরি সংক্রান্ত সকল শর্তাবলি উল্লেখ করে নিয়োগপত্র প্রদান করা।

খ) কর্মচারীদের জন্য কোনো মজুরি বোর্ড নেই, যার কারণে তাঁদের ন্যূনতম মজুরিও নির্ধারিত না। দোকান কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন সহ প্রত্যেক কর্মী যেন তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হন এমন ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা।

গ) শ্রম আইন অনুযায়ী সপ্তাহে দেড় দিন ছুটির বিধান থাকলেও দোকান কর্মচারীরা এই ছুটি পান না। তাদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটির নিশ্চয়তা দেয়া।

ঘ) কর্মক্ষেত্রে বা তার আশেপাশে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে নারী দোকান কর্মচারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা।

৬.৬.৫ দপ্তরি/প্রহরী

সারাদেশে ২০১৩ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৭ হাজার দপ্তরি-কাম প্রহরী নিয়োগ দেয়া হয়।[121] সরকারি বিদ্যালয়ে চাকরি করে অমানবিক ও নজিরবিহীনভাবে তাদের রাত দিন দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এ পদে নিয়োগের পর থেকে তাদেরকে দিনে স্কুলের দপ্তরি আর রাতে প্রহরী হিসেবে ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।[122] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণিত 'আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী পদে জনবল সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৯' এ আউটসোর্সিং সেবাদানকারীদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা উল্লেখ নেই।[123] একই পদে কাজ করলেও তাদের এলাকাভিত্তিক বেতন বৈষম্য রয়েছে। কোনো উপজেলায় ১৪ হাজার ৪৫০ টাকা আবার কোথাও ১৬ হাজার ১৩০ টাকা করে বেতন পাচ্ছে। কোনো উপজেলায় উৎসব ভাতা পাচ্ছে, আবার কোথাও পাচ্ছে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী পদটি মূলত আউটসোর্সিং পদ। আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী এটি কোনো সরকারি বেতনধারী চাকরি বা পদ নয়। এসব কর্মীদের সেবামূল্য চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত। তাই যতদিন কাজ করবেন ততদিন চুক্তি মোতাবেক বেতন প্রাপ্য হবেন। আবার প্রতি তিন বছর পর পর ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে চাকরি নবায়ন করতে হয়। তাই এখাতে কর্মরত ব্যক্তি এক অনিশ্চয়তায় মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। দপ্তরি প্রহরীদের অনিশ্চয়তা দূরীকরণে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) দপ্তরি ও প্রহরীদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে নির্দিষ্ট আট ঘণ্টা করা এবং অতিরিক্ত সময়ের জন্য ওভারটাইম ভাতা প্রদান করা।

খ) চাকরি নবায়নের অনিয়ম বন্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ প্রদান করা। দপ্তরি কাম প্রহরীদের পদটি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তকরণ।

গ) আউটসোর্সিং নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন করে দপ্তরি কাম প্রহরী পদটি না রেখে শুধুমাত্র দপ্তরি বা অফিস সহকারী পদ বহাল রাখা এবং কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করা।

---

121 প্রাথমিকের দপ্তরি-কাম প্রহরীদের আন্দোলন স্থগিত, ঢাকা টাইমস, ২৪ আগস্ট ২০২০, https://www.dhakatimes24.com/2020/08/24/180463

122 প্রাগুক্ত।

123 "দপ্তরী কাম প্রহরীদের বেতন সংক্রান্ত পরিপত্র জারি," SonaliNewes, ফেব্রুয়ারি ,১৭, ২০২২ https://www.sonalinews.com/education/news/167196

৬.৬.৬ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মী

বাংলাদেশে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে কর্মরত মোট জনশক্তির সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের (এমআর) প্রায় ৯৮% পুরুষ।[124] বড় কোম্পানিগুলিতে স্থায়ীভাবে এমআর নিয়োগ দেওয়া হলেও ছোট ও মাঝারি কোম্পানিতে অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বেশি। তাদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা না থাকায় দিনে প্রায় ১৬–১৭ ঘণ্টা কাজ করতে হয় এবং সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটিও অনেক সময় নিশ্চিত নয়, বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে।

কাজের ভিত্তিতে প্রণোদনা দেওয়া হলেও টার্গেট পূরণের চাপে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডাক্তারের চেম্বারে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা এবং রোগীর প্রেসক্রিপশনের ছবি তোলা এবং তা ঊর্ধ্বতনের কাছে পাঠানোর বাধ্যবাধকতা অনেক সময়ই তাদের জন্য অপমানজনক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়।

এমআরদের চাকরির নিরাপত্তা অনিশ্চিত; লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলে বিভাগ পরিবর্তন বা চাকরি হারানোর ঝুঁকি থাকে। অন্যদিকে চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও চাকরি পরিবর্তনের স্বাধীনতাও সীমিত, কেননা চাকরির শুরুতে মূল শিক্ষা সনদ জমা নেওয়া ও ব্লাঙ্ক চেক জমা নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

কমিশনের প্রস্তাবসমূহ:

ক) চাকরির নিরাপত্তা, অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মঘণ্টা ওভার টাইম সুবিধা, ছুটি, চাকরির অবসান, সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

খ) পেশাগত স্বীকৃত ও নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশের সকল মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মীদের জন্য প্রস্তাবিত ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী বা সেলস টার্গেট অর্জনভিত্তিক শর্তে নিয়োগের পরিবর্তে কোম্পানির আকার ও সক্ষমতা নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করা। নিয়োগের সময় চাকরির সকল শর্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা এবং চাকরিতে যোগদানের পর অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং জবরদস্তিমূলক সেলস টার্গেট প্রদানে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা। ক্রেডিট সেলের দায় কোম্পানি কর্তৃক গ্রহণ করা।

ঘ) মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মীদের নিম্নতম মজুরি বোর্ডের এখতিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি ঘোষণা করা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি নীতি নির্ধারণ করা।

ঙ) চাকরির শুরুতে মূল শিক্ষা সনদ জমা নেওয়া, ব্লাঙ্ক চেক জমা নেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের আগে চাকরি ছেড়ে দিলে হয়রানি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে জবরদস্তিমূলক শ্রমে নিযুক্ত করার অপকৌশল/অসদাচরণ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং যে কোনো শর্তে বাধ্যতামূলক বা জবরদস্তিমূলক শ্রম প্রমাণ হলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ) মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের অনৈতিক, বিব্রতকর বা সামাজিকভাবে হেয় হতে পারে—এমন কোনো কাজে জোরপূর্বক নিয়োজিত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা। বিশেষভাবে, রোগীর গোপন তথ্য সম্বলিত প্রেসক্রিপশনের ছবি সংগ্রহে বাধ্য করা বন্ধ করা কোম্পানিকে এর জন্য দায়ী করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান করা।

ছ) পেশাগত দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত যাতায়াত ভাতা প্রদান অথবা যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির দায়িত্বে ব্যবস্থা করা।

জ) পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের সময় সড়ক দুর্ঘটনাকে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা হিসেবে গণ্য করা এবং আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

---

[124] Md. Eousuf Efti, Medical representative turnover intention: A growing concern in Bangladesh's pharmaceuticals industry, The Financial Express, 6 July 2023.
https://thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/medical-representative-turnover-intention-a-growing-concern-in-bangladeshs-pharmaceuticals-industry

৬.৭ বিশেষ নিয়োগের ধরনের ভিত্তিতে শ্রমিক

৬.৭.১ আউটসোর্সিং শ্রমিক

আউটসোর্সিং শ্রমিকরা অনিশ্চিত কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হওয়া, শ্রম অধিকার লঙ্ঘন এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাবে চরম বৈষম্যের সম্মুখীন। সরকারি পর্যায়ে ছয় লক্ষাধিক শ্রমিক আউটসোর্সিং ব্যবস্থায় থাকলেও বেসরকারি পর্যায়ে প্রকৃত সংখ্যা অজানা। আইনগতভাবে আউটসোর্সিং নীতিমালা (২০০৮, ২০১৮ ও ২০২৫) ও সংশোধিত শ্রম আইন (২০১৩) থাকলেও শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় তা অপর্যাপ্ত। অধিকাংশ আউটসোর্সিং কর্মীর নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র বা সার্ভিস বুক নেই। ফলে তারা চাকরিকালীন আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন এবং যে কোনো সময় নোটিশ ছাড়াই চাকরি হারাতে পারেন। নারী শ্রমিকেরা প্রসূতি ছুটি ও অন্যান্য আইনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

আউটসোর্সিং শ্রমিকদের জন্য আউটসোর্সিং নীতিমালার আওতায় নির্ধারিত মজুরি থাকলেও শ্রমিকেরা নির্ধারিত হারে মজুরি পান না। ঠিকাদারেরা মজুরির বড় অংশ কেটে রাখে এবং প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক তার জন্য নির্ধারিত মোট মজুরির পরিমাণ জানে না। এছাড়া একই পদে স্থায়ী ও আউটসোর্সিং শ্রমিকদের মজুরিতে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান।

শ্রমিক সংগঠনে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও আউটসোর্সিং শ্রমিকরা নানা বাধার সম্মুখীন হন। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের চাকরিচ্যুতির হুমকির সম্মুখীন হতে হয় যা তাদের অধিকার রক্ষার পথ সংকুচিত করে। বর্তমানে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের জন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই, যা তাদের আরও দুর্বল অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

আউটসোর্সিং শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, এসকল শ্রমিকদের অধিকার, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সংগঠনের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর নীতি ও আইনের প্রয়োগ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, কর্পোরেশন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়ী জনবল কাঠামো হালনাগাদ করে আইনের ধারা ও বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা।

খ) ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করা। যারা ৫-১০ বছর বা তদূর্ধ্ব সময় ধরে কর্মরত থেকে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাদের শ্রম আইন অনুযায়ী অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মূল মালিককে (Principal Employer) দায়বদ্ধ করা।

গ) ঠিকাদারের অধীনে বা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মরত শ্রমিক বা কর্মীদের বিনা কারণে চাকরিচ্যুত না করা, নতুনভাবে টেন্ডার আহ্বান না করা এবং ইতোমধ্যে যারা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের পুনর্বহাল করার করার বিষয়টি বিবেচনা করা। প্রকল্প শেষে শ্রমিকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিবেচনায় স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ঘ) আউটসোর্সিং শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার প্রদান করা এবং তারা যেখানে কর্মরত সেই প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নের মূলধারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তারা যাতে কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা ও বৈষম্যমূলক আচরণ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভিযোগ উত্থাপন ও নিষ্পত্তির সুযোগ পায় এবং সিবিএ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা রাখা।

৬.৭.২ রাইড শেয়ারিং/গিগ/প্লাটফর্ম ইকনোমির শ্রমিক

বাংলাদেশের নগর পরিবহণ ব্যবস্থায় রাইড-শেয়ারিং খাত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এই খাতের শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট আইনগত স্বীকৃতি না থাকা, সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায্য মজুরির অভাব, নিরাপত্তাহীনতা ও স্বাস্থ্য সমস্যা তাদের জীবনযাত্রাকে অনিশ্চিত ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ করে তুলেছে। এর সাথে রয়েছে সংগঠিত হওয়ার সীমিত সুযোগ ও নিবন্ধিত শ্রমিক ইউনিয়ন না থাকার সমস্যা। অধিকাংশ চালকেরই নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং ছুটির কোনো ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালানোর ফলে চালকদের মধ্যে পিঠ ও কোমরের ব্যথা, মানসিক চাপ ও ক্লান্তি তাদের নিত্য সঙ্গী। অন্যদিকে রাইড-শেয়ারিং কোম্পানি কর্তৃক চালকদের আয়ের উপর আরোপিত

কমিশনের কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই; দৈনিক আয়ের ২০-২৫% পর্যন্ত কমিশন কোম্পানিগুলিকে দিতে হয়। শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, সরকার, নীতিনির্ধারক ও রাইড-শেয়ারিং কোম্পানিগুলির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে রাইড-শেয়ারিং চালকদের শ্রম অধিকার, আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ:

ক. রাইড-শেয়ারিং চালকদেরকে 'শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং রাইড-শেয়ারিং খাতের শ্রম অধিকার, ন্যায্য মজুরি এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা সেল প্রতিষ্ঠা করা যার দায়িত্ব হবে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুসরণ করে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং কোম্পানিগুলির কার্যক্রম তদারকি করা।

খ. যে সব বহুজাতিক কোম্পানি রাইড-শেয়ারিং শ্রমিকদের ব্যবহার করছে তাদেরকে উক্ত কোম্পানির সরবরাহ চেইনের সক্রিয় শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করা এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও শ্রমিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

গ. জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ মজুরি কাঠামো নির্ধারণের মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া রাইড-শেয়ারিং কোম্পানিগুলি কর্তৃক নির্ধারিত কমিশন হার ন্যায্য ও যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা প্রয়োজন, যাতে শ্রমিকরা তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী যথাযথ আয় পেতে পারেন।

ঘ. রাইড-শেয়ারিং সেবার পরিচালনায় স্বচ্ছতা এবং শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে চালকদের ওপর আরোপিত প্রতিদিনের প্ল্যাটফর্ম ফি এবং যাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া সিটি ও ইন্টারসিটি ট্রিপ ফি স্থায়ীভাবে বাতিল করা এবং চালকদের যেন অপ্রত্যাশিত আর্থিক বোঝার সম্মুখীন হতে না হয় সে জন্য কমিশন বা নির্ধারিত সার্ভিস ফি ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো চার্জ আরোপ না করা।

ঙ. রাইড-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে কর্মরত শ্রমিকদের অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া/পদক্ষেপ অনুসরণ করা প্রয়োজন:

১) কোনো চালকের অ্যাকাউন্ট বন্ধের আগে শ্রম আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে নোটিশ প্রদান করা এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা।

২) যাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতে চালককে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা থেকে নিষিদ্ধ না করে, নির্দিষ্ট তদন্ত পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া।

৩) ভিত্তিহীন বা অযৌক্তিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হলে চালকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা।

চ. রাইড-শেয়ারিং শ্রমিকদের কর্মপরিবেশে নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস এবং কাজের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা:

১) যাত্রীদের অসদাচরণ, অনৈতিক বা বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য চালককে দায়বদ্ধ না করা এবং চালকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উভয় পক্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) অ্যাপ দ্বারা পরিচালিত রাইডে পেশাজীবী চালকের পাশাপাশি গাড়ির মালিকের বিস্তারিত তথ্যের ডাটাবেজ সংরক্ষণ।

৩) যাত্রী ও চালক উভয়ের জন্য ২৪/৭ কল সেন্টার বা সাপোর্ট সার্ভিস চালু করা যাতে কোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়।

৬.৭.৩ গৃহভিত্তিক শ্রমিক

ক) গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের সুরক্ষার জন্য শ্রম আইন ও নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

খ) গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পর্যায়ে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সংখ্যা ও কাজের ধরন নিয়ে জরিপ পরিচালনা করা এবং সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এদের নথিভুক্ত করে নিবন্ধিত করা আবশ্যক।

গ) মজুরি বঞ্চনা থেকে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য বেঁচে থাকার উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা আবশ্যক। ঠিকাদার ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও সুরক্ষা প্রদান করতে বাধ্য করা।

ঘ) গৃহভিত্তিক শ্রমিকেরা শ্রমের অধিকার, সংগঠিত হওয়া বা দরকষাকষি বিষয়ে অবগত নন। শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ প্রদান করা এবং শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক।

ঙ) সরকারি উদ্যোগে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা এবং স্বনিয়োজিত গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করা।

৭ বিশেষ প্রস্তাবনা

৭.১ শ্রম শক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত্র গবেষণা ও শিক্ষা

ক) শ্রম বাজারকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য শ্রম পরিসংখ্যানের ঘাটতি নিরসনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীনে শ্রম ইস্যুতে নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করা এবং শ্রম জরিপের ক্ষেত্রে আইএলও-এর সর্বশেষ মানদণ্ড অনুসরণ করা।

খ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক শ্রমশক্তি, শিশুশ্রম ও শ্রম সংক্রান্ত ইস্যুতে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত জরিপসমূহ এই কমিশন কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত 'গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' অনুবিভাগের সাথে সমন্বয় করে পরিচালনা করা এবং জরিপের প্রতিটি পর্যায়ে (বিশেষত পরিকল্পনা) ট্রেড ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) শ্রম বাজারের গতি প্রকৃতি ও কর্মসংস্থান, শ্রমিকের অধিকার পরিস্থিতি, শিল্প সম্পর্ক এবং অন্যান্য শ্রম ইস্যুতে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে যৌথ গবেষণা (নিয়োগকারী, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকার, উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্ত করে) সম্পন্ন করা, যাতে এই সমস্ত গবেষণা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

ঘ) শ্রমিক এবং শ্রমিক অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রমে শ্রমিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করা।

ঙ) মাঠ পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে শ্রম অধিকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড এবং শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.২ বাজেট বরাদ্দ

ক) বাংলাদেশে শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট দুটি মুখ্য মন্ত্রণালয় – শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যৌথভাবে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের এক ভাগ বরাদ্দও পাচ্ছে না। অথচ এই দুই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মানুষেরা দেশে-বিদেশে অর্থনীতির মূল শক্তি ও ভরসা। জাতীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে শ্রমখাত কম মনোযোগ পাচ্ছে, কম গুরুত্ব পাচ্ছে। বাজেট বরাদ্দের অগ্রাধিকার তালিকায় তারা নেই। বছরওয়ারি জাতীয় বরাদ্দের হিস্যায় শ্রমজীবীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির অংশীদারিত্বও বাড়ছে না। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা ও শিল্পসম্পর্ক উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় দুটির অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিকায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও তাদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন। বিশেষ করে শ্রমিকের কল্যাণ ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু, বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, জাতীয় পেনশন স্কিম প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সকল শ্রমিকের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু করা, শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য বাজেটে সুস্পষ্ট বরাদ্দ থাকা আবশ্যক।

খ) শ্রমকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেমন; বিমা, বেকার ভাতা, অবসর ভাতা, দুর্ঘটনাজনিত দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্প/সেবা প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের তহবিল হতে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ করা।

৭.৩ শ্বেতপত্র প্রস্তুত

ক) রানা প্লাজা দুর্ঘটনা, তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ড সহ উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা পরবর্তী সরকারি কার্যক্রম, তদন্ত ও বিচার, ক্ষতিপূরণ, শ্রম সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি আর্থিক অনুদান ব্যয় সম্পর্কিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

খ) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ফান্ডের ব্যবহার সম্পর্কিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

গ) করোনা মহামারী সহ বিভিন্ন সময় সরকারি প্রণোদনা/বিশেষ সহযোগিতা শীর্ষক শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১.৩.১: টেকনিকাল কমিটির সদস্যদের তালিকা

গবেষণা ও প্রতিবেদন কমিটি

প্রফেসর ড. জাকির হোসেন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
মোস্তাফিজ আহমেদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আফরোজা আখতার, গবেষক
মোঃ আওরঙ্গজেব আকন্দ, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মো. ছায়েম আলী খান, গবেষক
ড. আয়শা ইয়াসমিন, গবেষণা সহযোগী।

মূল কমিটি

ক। আইন ও নীতি কাঠামো বিষয়ক কমিটি

এডভোকেট এ কে এম নাসিম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, সম্মানিত কমিশন সদস্য
তাসলিমা আখতার, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এ এন এম সাইফুদ্দিন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এডভোকেট বরকত আলি, ব্লাস্ট
এডভোকেট নজরুল ইসলাম, সলিডারিটি সেন্টার
মোঃ মাছুম বিল্লাহ, আইন কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

খ। শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গর্ভনেন্স পর্যালোচনা কমিটি

ড. মাহফুজুল হক, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এ এন এম সাইফুদ্দিন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সাকিল আখতার চৌধুরী, সম্মানিত কমিশন সদস্য
মোঃ শফিকুর রহমান, শ্রম অধিদপ্তর
রেজুয়ানুল হক আজম, গবেষণা সহযোগী।

গ। শ্রম অসন্তোষ, বিচার ও অভিযোগ নিষ্পতি পদ্ধতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি

ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এডভোকেট এ কে এম নাসিম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
তপন দত্ত, সম্মানিত কমিশন সদস্য
তাসলিমা আখতার, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এডভোকেট আতিকুর রহমান
ইমতিয়াজ আহমেদ সজল, ঢাকা ইন্টান্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
এডভোকেট তৌফিক ইমতিয়াজ, বিলস।

ঘ। শিল্প সম্পর্ক (যৌথ দরকষাকষি ও সামাজিক সংলাপ) সংক্রান্ত কমিটি

কামরান টি. রহমান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
চৌধুরী আশিকুল আলম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এ এন এম সাইফুদ্দিন, সম্মানিত কমিশন সদস্য

আহসান হাবিব বুলবুল, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
খন্দকার শাফিন হাবিব শান, সলিডারিটি সেন্টার
ফাহমিনা মিশু কাশেম, জাতীয় শ্রমিক জোট
লস্কর মোঃ তসলিম, শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র।

ঙ। শ্রম জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ কর্মসূচি সংক্রান্ত কমিটি
রাজেকুজ্জামান রতন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ফজলে শামীম এহসান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সেকান্দার আলী মিনা, সেফটি এন্ড রাইট সোসাইটি
মো: মোসফিকুর রহমান, গবেষক।
আরিফুল ইসলাম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
মোস্তফা আল হোসাইন আকিল, ছাত্র প্রতিনিধি, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ সায়েদুজ্জামান মিঠু, বিলস
মেহেদী ইমাম, গবেষক।

বিষয় ভিত্তিক টেকনিক্যাল কমিটি

ক। কাজের অধিকার, সুযোগ, নিশ্চয়তা ও অন্তর্ভুক্তি
ড. অনন্য রায়হান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ড. ওয়াসেল বিন শাদাত, গবেষক
আরিফুল ইসলাম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
মোস্তফা আল হোসাইন আকিল, ছাত্র প্রতিনিধি, শ্রম সংস্কার কমিশন।

খ। মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা
ড. অনন্য রায়হান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ফজলে শামীম এহসান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সাদিক মাহমুদ, গবেষণা সহযোগী
সজীব দে, বিলস।

গ। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ
ফারুক আহম্মদ, সম্মানিত কমিশন সদস্য
আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
প্রফেসর ড. হাসানাত ম আলমগীর, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি
এ কে এম মাছুম উল আলম, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস
ড. মোহাম্মদ হায়াতুন নবী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
খন্দোকার আব্দুস সালাম, বিলস
মোঃ ওমর ফারুক, আলদি সি আর সার্পোট এশিয়া
সৈয়দ জেরিফ উদ্দিন আহমেদ, গবেষণা সহযোগী
সিফাত চৌধুরী, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ।

ঘ। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ কমিটি ও শ্রম জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ কর্মসূচি সংক্রান্ত কমিটি একই টিম হিসাবে গণ্য হবে।

ঙ। সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, ও যৌথ দরকষাকষি

সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, ও যৌথ দরকষাকষি ও শিল্প সম্পর্ক (যৌথ দরকষাকষি ও সামাজিক সংলাপ) সংক্রান্ত কমিটি একই টিম হিসাবে গণ্য হবে।

চ। শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি, এবং ন্যায় বিচার

শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি, এবং ন্যায় বিচার ও শিল্প সম্পর্ক (যৌথ দরকষাকষি ও সামাজিক সংলাপ) সংক্রান্ত কমিটি একই টিম হিসাবে গণ্য হবে।

ছ। সমতা, বৈষম্যহীনতা, নারী এবং বিশেষ জনগোষ্ঠী

কোহিনূর মাহমুদ, পরিচালক, বিলস

তাসলিমা আখতার, সম্মানিত কমিশন সদস্য

ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, সম্মানিত কমিশন সদস্য

সানজিদা সুলতানা, অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবী নারী

আদিবা আফরোজ, গবেষক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি

মৌসুমী নিশাত শিমুল, প্রোগ্রাম অফিসার, বিলস

তাকিয়া চৌধুরী, সহকারী কর্মকর্তা-এডভোকেসি, বিলস

তৃষিয়া নাশতারান, সংগঠক ও সম্পাদক, ফেমিনিস্ট অ্যালায়েন্স অফ বাংলাদেশ (এফএবি)।

জ। শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম

রাজেকুজ্জামান রতন, সম্মানিত কমিশন সদস্য

আসিফ আইয়ুব, যুগ্ম মহাসচিব, বিইএফ

আফজাল কবির খান, এডুকো

হাবিবুর রহমান, বিইএফ।

বিশেষ বিষয় ভিত্তিক টেকনিক্যাল কমিটি

অভিবাসন

সাকিল আখতার চৌধুরী, সম্মানিত কমিশন সদস্য

আসিফ আইয়ুব, বিইএফ

মাজহারুল ইসলাম, আইএলও

সানজিদা খোশনূর, গবেষণা সহযোগী।

প্রতিবেদনের ভূমিকা প্রণয়ন টিম

ড. হাসান আশরাফ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এডভোকেট নজরুল ইসলাম

তাসলিমা আখতার, সম্মানিত কমিশন সদস্য

সাচিবিক সহায়তা টিম

মোঃ মোজাম্মেল হক, যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

শফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর।

মোঃ মাছুম বিল্লাহ, আইন কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

নূর জাহান আমিনা মুন, এক্সিকিউটিভ এসিসট্যান্ট, বিল্স।

ফারহানা ইয়াসমিন, টাইপিস্ট, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

আবদুর রহমান, অফিস সহকারী, শ্রম অধিদপ্তর।

সার্বিক সহযোগিতা বিলস টিম

কোহিনূর মাহমুদ, পরিচালক
নাজমা ইয়াসমীন, পরিচালক
এম এ মজিদ, উপপরিচালক
মো: ইউসুফ আল মামুন, উপপরিচালক
মো: মনিরুল ইসলাম, উপপরিচালক
টিটু মিজান, সিনিয়র কর্মকর্তা, সমন্বয়, তথ্যপ্রযুক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণ
চৌধুরী বোরহান উদ্দিন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
মনিরুল কবির, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
মো সায়েদুজ্জামান মিঠু, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
সজীব দে, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
শামীম আহমেদ, রিসার্চ অফিসার
সাবরিনা শারমিন সেবা, অফিসার, মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টশন
মো হূমায়ুন কবির, সিনিয়র একাউন্টস অফিসার
মো আল মামুন-সিদ্দিক, সিনিয়র একাউন্টস অফিসার
মারথা হিমানি দেউরী, একাউন্টস অফিসার
মৌসুমী নিশাত শিমুল, ইনফরমেশন অফিসার
এডভোকেট তৌফিক ইমতিয়াজ, কর্মকর্তা-এডভোকেসি
তাকিয়া চৌধুরী, সহকারী কর্মকর্তা-এডভোকেসি
মো: আল-মামুন, লাইব্রেরিয়ান
সামিয়া খান, ইন্টার্ন
হালিম ফকীর সায়েম, ড্রাইভার
টিপু শিকদার, ড্রাইভার
গণি মিয়া, অফিস সহায়ক
সাথী বেগম, অফিস সহায়ক

সংযুক্তি ১.৩.২: সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা

শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
২) জাতীয় শ্রমিক জোট
৩) বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন
৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৫) বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার ফেডারেশন
৬) ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল
৭) গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন
৮) গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি ও নৌ পরিবহন শ্রমিক কেন্দ্র
৯) জাতীয় সোয়েটার্স গার্মেন্টস ওয়ার্কারস ফেডারেশন
১০) রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কারস ফেডারেশন
১১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
১২) বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
১৩) গার্মেন্টস টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন
১৪) বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি
১৫) গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
১৬) রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
১৭) জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
১৮) বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
১৯) জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট
২০) বাংলাদেশ সংযুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
২১) গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলন
২২) গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
২৩) জাতীয় নির্মাণ শ্রমিক জোট বাংলাদেশ
২৪) গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
২৫) সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
২৬) বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও সংগঠন
২৭) জাতীয়তাবাদী কৃষক দল
২৮) জাতীয় কৃষক জোট
২৯) বাংলাদেশ কৃষক মজুর সংহতি
৩০) বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি
৩১) বাংলাদেশ কৃষক সমিতি
৩২) বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ফার্ম লেবার ফেডারেশন
৩৩) শাহজালাল ফার্টিলাইজার শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৩৪) বাংলাদেশ কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতি
৩৫) নারী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন
৩৬) শ্রমিক অধিকার ঐক্য পরিষদ
৩৭) বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড কংগ্রেস
৩৮) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
৩৯) গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ট্রাস্ট
৪০) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন
৪১) সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
৪২) বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
৪৩) জাতীয় তৃণমূল শ্রমিক ফেডারেশন
৪৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
৪৫) বাংলাদেশ লেবার কংগ্রেস
৪৬) বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন
৪৭) বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
৪৮) বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফোরাম
৪৯) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক জোট
৫০) ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিট সেন্টার
৫১) শ্রমিক দল, রাজশাহী
৫২) রাজশাহী জেলা শ্রমিক দল রেলওয়ে
৫৩) শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৫৪) বরিশাল বাস মালিক সমিতি
৫৫) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
৫৬) বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
৫৭) কৃষি ব্যাংক এমপ্লোয়িস ফেডারেশন
৫৮) বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লোয়িস ফেডারেশন
৫৯) উত্তরা ব্যাংক শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
৬০) রূপালী ব্যাংক কর্মচারী সংঘ
৬১) জনতা ব্যাংক এমপ্লোয়িজ ফেডারেশন
৬২) বাংলাদেশ হাউজবিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পরেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
৬৩) বাংলাদেশ ব্যাংক জাতিয়তাবাদী কর্মচারী দপ্তর
৬৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমিতি
৬৫) অগ্রণী ব্যাংক কর্মচারী সমিতি
৬৬) সোনালী ব্যাংক সি. বি. এ.
৬৭) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল
৬৮) বাংলাদেশ অটোরিকশা হালকা যান ফেডারেশন
৬৯) ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সিকার, অটোট্যাম্পু, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
৭০) বাংলাদেশ অটো-রিকশা লাইট ভেহিকেল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
৭১) ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন
৭২) শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
৭৩) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৪) পাথর শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৫) বাংলাদেশ টি এস্টেটস্ স্টাফ এসোসিয়েশন
৭৬) ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন

৭৭) কে জি জি কর্মচারী ইউনিয়ন
৭৮) লঞ্চ লেবার এসোসিয়েশন
৭৯) বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন
৮০) পাটকল শ্রমিক দল
৮১) স'মিল ইউনিয়ন, খুলনা
৮২) ব্যাংক ফেডারেশন খুলনা
৮৩) ইজিবাইক ইউনিয়ন, বরিশাল
৮৪) রিকশা, ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, বরিশাল
৮৫) বরিশাল লেবার কর্মচারী ইউনিয়ন
৮৬) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন
৮৭) বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
৮৮) বরিশাল বাস শ্রমিক ইউনিয়ন
৮৯) বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, বরিশাল
৯০) পাট শ্রমিক ইউনিয়ন বরিশাল
৯১) উজিরপুর উপজেলা জেলে শ্রমিক ইউনিয়ন
৯২) রাঙামাটি জেলা শ্রমিক দল
৯৩) পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম
৯৪) শ্রমিক দল বান্দরবন
৯৫) কক্সবাজার বাসদ
৯৬) শ্রমিক দল রাঙামাটি
৯৭) সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
৯৮) সিলেট গ্যাস ফিল্ড কর্মচারী ইউনিয়ন
৯৯) জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
১০০) বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার শ্রমিক টিইউসি
১০১) রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
১০২) বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি
১০৩) সেন্ট্রাল উইমেন্স কমিটি – বিজিআইডাব্লিউএফ
১০৪) রাষ্ট্র সংস্কার শ্রমিক আন্দোলন
১০৫) এনজিডাব্লিউএফ
১০৬) বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন

মালিক সংগঠনসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
২) নবাবগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, রংপুর
৩) বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এন্ড রিসাকেলার্স এসোসিয়েশন
৪) রংপুর মোটর মালিক সমিতি
৫) চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স
৬) রংপুর জেলা ট্রাক মালিক সমিতি
৭) বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি
৮) রংপুর জেলা রেস্তোরা মালিক সমিতি
৯) বিজিএমইএ
১০) ক্লিনিক ডায়াগস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন, রংপুর
১১) বিকেএমইএ
১২) জেলা ইট ভাটা মালিক সমিতি রংপুর
১৩) ব্যাটারিচালিত রিকশা মালিক সমিতি, রংপুর
১৪) বেকারি মালিক সমিতি, রাজশাহী
১৫) রাজশাহী স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মালিক সমিতি
১৬) রাজশাহী মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী সমিতি
১৭) বালাদেশীয় চা সংসদ
১৮) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
১৯) বরিশাল-পটুয়াখালি বাস মালিক সমিতি
২০) বরিশাল মৎস্য আড়ৎদার এসোসিয়েশন
২১) বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভলপমেন্ট সোস্যাইটি
২২) উইমেন চেম্বার, বরিশাল
২৩) ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স
২৪) বিসিক মালিক সমিতি সিলেট
২৫) সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
২৬) বাংলাদেশ সুইটস মেনুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন
২৭) সিলেট ব্রিকস ওনার সোসাইটি

মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) অক্সফ্যাম
২) বাংলাদেশ বিজনেস এন্ড ডিজেবিলিটি নেটওয়ার্ক
৩) প্র্যাক্টিকাল একশন
৪) জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা
৫) এশিয়া ফ্লোরওয়েজ এলায়েন্স বাংলাদেশ
৬) উইমেন উইথ ডিজেবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
৭) বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
৮) ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ডিজেবলড উইমেন
৯) ডোমেস্টিক গার্মেন্টস ওয়ার্কারস ফেডারেশন
১০) জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন
১১) আফওয়া জোট
১২) সি আর পি
১৩) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হসপিটাল
১৪) রানা প্লাজা ট্রাস্ট
১৫) চট্টগ্রাম জেলা নারী সংহতি
১৬) Médecins Sans Frontières
১৭) ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন
১৮) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

১৯) প্রত্যয় সোশ্যাল ফাউন্ডেশন
২০) ওশি ফাউন্ডেশন
২১) ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল
২২) বাংলাদেশ ব্যাঙ্কস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন
২৩) জাতীয় আদিবাসী পরিষদ
২৪) মানবাধিকার ও পরিবেশ আন্দোলন বাংলাদেশ
২৫) RDRS
২৬) রূপসা
২৭) সেন্টার ফর রিসোর্স স্টাডিজ
২৮) খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা
২৯) এডভোকেসি অফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোজেক্ট
৩০) অকুপেশনাল সেইফটি বোর্ড অব বাংলাদেশ
৩১) Vision Spring
৩২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
৩৩) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স
৩৪) পাব্লিক সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল
৩৫) সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি
৩৬) ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক ইন্টান্যাশনাল
৩৭) অগ্নি ফাউন্ডেশন
৩৮) ইউসেপ
৩৯) এডুকো
৪০) রিলায়েন্ট উইমেন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (RWDO)
৪১) কর্মজীবী নারী
৪২) বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস (BLAST)
৪৩) ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল
৪৪) শাপলা (এনজিও), রাজশাহী
৪৫) খিয়াং আদিবাসী সংগঠন
৪৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ
৪৭) আদিবাসী ফোরাম
৪৮) ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ
৪৯) ন্যাশনাল ডমেস্টিক উইমেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
৫০) লেদার ডেবেলপমেন্ট ফোরাম
৫১) ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

পেশাজীবী সংগঠনসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ
২) হকার্স ফেডারেশন
৩) সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
৪) রোড ক্রস হকার্স
৫) হোম-বেইজড ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক-বাংলাদেশ
৬) ছিন্নমূল হকার্স সমিতি
৭) সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন
৮) বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও শিল্প শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
৯) Bangladesh FMCG HR Society
১০) BGSSF
১১) অ্যাপ-বেইজড ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন
১২) মাস্টাররোল কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
১৩) বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট স্যোসাইটি
১৪) ভ্রাম্যমাণ হকার্স
১৫) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক
১৬) শ্রমিক দল
১৭) লাইট হাউজ, রাজশাহী
১৮) এ. বি. শ্রমিক পার্টি
১৯) মহিলা পরিষদ, রাজশাহী
২০) বঙ্গবন্ধু এভিনিউস' সংগ্রাম পরিষদ
২১) কুলি মজুর শ্রমিক ইউনিয়ন, রংপুর
২২) দপ্তরি কাম প্রহরী
২৩) জেলা বাঁধন প্রতিবন্ধী সংস্থা
২৪) বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন
২৫) দিনের আলো হিজড়া সংঘ
২৬) রিক্সা ভ্যান চালক ইউনিয়ন
২৭) লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার
২৮) রাজশাহী চিনি কল
২৯) রাঙামাটি ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন
৩০) ইজিবাইক শ্রমিক ফেডারেশন
৩১) বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন
৩২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি
৩৩) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
৩৪) ইয়াং ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট ইউনিটি
৩৫) ঢাকা রাইড-শেয়ারিং ড্রাইভার্স ইউনিয়ন
৩৬) টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন
৩৭) বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
৩৮) ঢাকা সাব এডিটর কাউন্সিল
৩৯) দপ্তরি কাম প্রহরী
৪০) লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরাম

৪১) সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
৪২) ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার
৪৩) বিউট পার্লার শ্রমিক ইউনিয়ন
৪৪) ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট
৪৫) উত্তরা ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
৪৬) বাংলাদেশ হকার্স সংগ্রাম পরিষদ
৪৭) বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন

শ্রম সংশ্লিষ্ট এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) শ্রম অধিদপ্তর
২) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৪) বিসিক জেলা কার্যালয় রংপুর
৫) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
৬) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ
৭) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন
৮) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৯) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উন্নয়ন সহপযোগী সংস্থাসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) FNV
২) 3F
৩) ILO
৪) GIZ
৫) ActionAid
৬) BRAC
৭) ETI
৮) USAID
৯) RISE
১০) US Embassy
১১) Denish Embassy
১২) Fair Ware Foundation
১৩) Care Bangladesh
১৪) FES
১৫) WSUP
১৬) WARBE
১৭) OXFAM
১৮) Europian Union

এছাড়াও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তিবর্গের সাথে বিভিন্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন

১) লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন (প্রতিনিধিগণ)
২) রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর
৩) শ্রম আইন সংস্কার কমিটি (সদস্যগণ)
৪) খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
৫) এম এম আকাশ
৬) ইয়ানাতুল ইসলাম
৭) হামিদা হোসেন
৮) আনু মোহাম্মদ
৯) মোঃ রিজওয়ানুল ইসলাম
১০) শাহীন আনাম
১১) মোশাহিদা সুলতানা

সংযুক্তি ১.৩.৩: দাবিনামা ও লিখিত মতামত প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা

যে সকল শ্রমিক সংগঠন কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
২) গার্মেন্টস শ্রমিক পরিষদ
৩) ট্যানারি শিল্পের শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন
৪) ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন নারী চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
৫) বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন
৬) ডক জাতীয়তাবাদী শ্রমিক
৭) স্ক্যাভেঞ্জার্স এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের
৮) মেঘনা পেট্রোলিয়াম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
৯) বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
১০) বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ

১১) উত্তর চট্টলা উপকূলীয় জলদাশ কল্যাণ ফেডারেশন
১২) বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
১৩) কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স
১৪) বিউটি পার্লার শ্রমিক
১৫) চট্টগ্রাম হালকা মোটরযান চালক-শ্রমিক ইউনিয়ন
১৬) গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
১৭) চট্টগ্রাম মহানগর নির্মাণ শ্রমিক দল
১৮) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, খুলনা
১৯) বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন
২০) সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
২১) ট্রেড ইউনিয়ন প্লাটফর্ম ফর মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স
২২) বাংলাদেশ জাতীয় বিদ্যুত শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
২৩) সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন
২৪) শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, খুলনা
২৫) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি), চট্টগ্রাম
২৬) খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন
২৭) বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
২৮) বাংলাদেশ ট্যুরিজম এন্ড হোটেলস ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন
২৯) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
৩০) চট্টগ্রাম ওয়াসা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী দল
৩১) কেন্দ্রীয় চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন
৩২) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৩৩) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৩৪) উত্তর খুলনা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন
৩৫) জাতীয় গাহর্স্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন
৩৬) সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
৩৭) ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ
৩৮) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
৩৯) মৌলভীবাজার মৎস্যজীবী ইউনিয়ন
৪০) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
৪১) বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন, খুলনা
৪২) বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন
৪৩) বৃহত্তর বরিশাল রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন
৪৪) শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ
৪৫) সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, মৌলভীবাজার
৪৬) বাংলাদেশ রেল শ্রমিক ইউনিয়ন
৪৭) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন
৪৮) রংপুর জেলা হোটেল রেস্তরা শ্রমিক ইউনিয়ন
৪৯) ইন্টান্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন
৫০) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বরিশাল
৫১) বাংলাদেশ অটোরিকশা-হালকাযান পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
৫২) ট্যাক্সি কার, অটোটেম্পু, অটোরিক্সা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা
৫৩) এ্যালায়েন্স অব ট্রেড ইউনিয়ন
৫৪) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন
৫৫) সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
৫৬) পঞ্চগড় জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন
৫৭) সোনারগাঁও হোটেল শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন
৫৮) ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
৫৯) ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিক্সা চালক ঐক্য পরিষদ
৬০) পপুলার ফার্মাসিটিউক্যাল লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৬১) উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
৬২) ডক বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
৬৩) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
৬৪) ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
৬৫) জাতীয় কারিগর ও শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন
৬৬) বগুড়া জেলা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়ন
৬৭) ১০০ টিএসসি মেম্বার কনটিগুইটি
৬৮) বাংলাদেশ গণপূর্ত কর্মচারী ইউনিয়ন, পানি উন্নয়ন বোর্ড বগুড়া
৬৯) ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, (টি ইউ সি), বগুড়া
৭০) বগুড়া পাদুকা শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়া
৭১) বাংলাদেশ ব্যাংকস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন
৭২) বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
৭৩) বগুড়া জেলা জাতীয়তাবাদী হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৪) খুলনা হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৫) চা শ্রমিক ইউনিয়ন, মৌলভীবাজার
৭৬) স্বাধীনতা আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
৭৭) পল্লি বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৭৮) দৌলতপুর থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৯) গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
৮০) শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), সিলেট জেলা
৮১) সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট (সিলেট জেলা শাখা)

যে সকল পেশাজীবী সংগঠন কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর আউটসোর্সিং কর্মচারীগণ
২) বাংলাদেশ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালক কল্যাণ সমিতি
৩) ঢাকা ওয়াসা আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ
৪) ঢাকা রাইড-শেয়ারিং ড্রাইভার্স ইউনিয়ন
৫) জি. সি. বি. চট্টগ্রাম বন্দর ল্যাসিং অ্যান ল্যাসিং শ্রমিক
৬) বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
৭) রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ
৮) বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, মৌলভীবাজার
৯) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দল
১০) মিলনপুর মাঝিপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, রংপুর
১১) প্রাথমিক দপ্তরিদের চাকরি জাতীয়করণ দাবি আদায় সমন্বয় পরিষদ
১২) বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন, খুলনা
১৩) বিক্রয় বিপণন শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ
১৪) সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন
১৫) বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেনটেটিভ এ্যাসোসিয়েশন
১৬) টিভি ক্যামেরা সাংবাদিক
১৭) হোম-বেইজড ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক-বাংলাদেশ
১৮) বাংলাদেশ অবিভাগীয় ডাক কর্মচারী পরিষদ
১৯) জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড
২০) বিক্রয় বিপণন শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ
২১) পল্লি বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ
২২) কার, মাইক্রো, এ্যাম্বুলেন্স চালক কল্যাণ উপ-কমিটি
২৩) বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের
২৪) অ্যাপ-বেইজড ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন
২৫) গ্রামীণ ব্যাংকে দৈনিক ভিত্তিক পিয়ন কাম গার্ড
২৬) বাংলাদেশ এফএমসিজি এইচ আর সোসাইটি
২৭) গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম
২৮) বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার এসোসিয়েশন
২৯) সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকা আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ
৩০) ড্রাইভারস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
৩১) বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
৩২) আউটসোর্সিং কর্মচারীগণ
৩৩) বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
৩৪) জাতীয় কৃষক জোট
৩৫) মেট্রোরেল প্রকল্প আউটসোর্সিং কর্মচারী
৩৬) জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা
৩৭) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ
৩৮) Bangladesh Business & Disability Network
৩৯) বাংলাদেশ হকার সংগ্রাম পরিষদ
৪০) বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি
৪১) ওয়ার্ক এন্ড হেলথ সেইফটি এসিস্টেন্ট সেন্টার
৪২) সকল বাঁওড় জলমহালে ভুক্তভোগী ভূমিজ জেলে জনগোষ্ঠী
৪৩) ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৩ শাখা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৪) কৃষিশ্রমিক অধিকার মঞ্চ
৪৫) গ্রামীণফোন শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
৪৬) ফায়ার সার্ভিস
৪৭) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ
৪৮) খালিশপুর জুটমিল কারখানা কমিটি
৪৯) সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
৫০) সোনারগাওঁ টেক্সটাইল শ্রমিক কর্মচার সংগ্রাম পরিষদ
৫১) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
৫২) চা-বাগান শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী জনগণ
৫৩) BFSCD এর আউটসোর্সিং কর্মচারী, বাবুর্চি ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীবৃন্দ
৫৪) নগরের পরিচ্ছন্নতাকর্মী
৫৫) চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত আউটসোর্সিং কর্মচারী
৫৬) আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
৫৭) পাটকল রক্ষা আন্দোলন (যশোর-খুলনা)
৫৮) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৫৯) অলিম্পিক সিমেন্ট লিমিটেড শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ
৬০) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় নারীজোট
৬১) NESCO (NORTHERN ELECTRICITY SUPPLY COMPANY PLC) এ কর্মরত আউটসোর্সিং/এল ই এম কর্মচারী
৬২) পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্মচারী
৬৩) রং, বোর্ড, কাঠ শিল্প শ্রমিক ফ্রন্ট, বগুড়া
৬৪) রিকসা, ব্যটারি রিকসা-ইজিবাইক, ভ্যান সংগ্রাম পরিষদ, বগুড়া
৬৫) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাস্টাররোল/অনিয়মিত কর্মচারী
৬৬) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিরাপত্তা প্রহরী
৬৭) ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিক্সা চালক ঐক্য পরিষদ
৬৮) মাস্টাররোল কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
৬৯) সিএমএইচ ঢাকা এর আউটসোর্সিং কর্মচারী
৭০) মাস্টার রোল দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কল্যাণ পরিষদ
৭১) বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক সংঘ
৭২) বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ এসোসিয়েশন

৭৩) ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ বিক্রয় বিপণন শ্রমকি কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

যে সকল সংগঠন কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) নারীপক্ষ
২) ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ফর দ্যা আরবান পুউর
৩) বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
৪) রানা প্লাজা অ্যাকসিডেন্ট ভিকটিমস্ রাইটস নেটওয়ার্ক
৫) ইপসা
৬) অ্যাকশন এইড
৭) মমতা
৮) ক্ষুব্ধ নারী সমাজ
৯) সিপিডি
১০) হোমবেইজড ওয়ার্কার্স রাইট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ
১১) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
১২) Bangladesh FSM Network
১৩) বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
১৪) বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ
১৫) হরিজন ঐক্য পরিষদ
১৬) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৭) ভিসন স্প্রিং
১৮) ইথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ
১৯) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস
২০) কর্মজীবী নারী
২১) OXFAM
২২) সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি
২৩) Medecins Sans Frontieres
২৪) নাগরিক উদ্যোগ
২৫) কর্মজীবী নারী
২৬) বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
২৭) Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement
২৮) স্যানিটেশন ওয়ার্কার্স ফোরাম
২৯) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস
৩০) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ এন্ড সায়েন্সেস
৩১) ইউরিপীয় ইউনিয়ন

যে সকল মালিক সংগঠন কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) ন্যাশনাল টি কোম্পানি লি.
২) পঞ্চগড় জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ মালিক সমিতি
৩) পঞ্চগড় জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি
৪) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
৫) রংপুর জেলা ট্রাক কাভার্ডভ্যান ও ট্রাক্টর মালিক সমিতি
৬) বিজিএমইএ
৭) বাংলাদেশীয় চা সংসদ
৮) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
৯) বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওউনার্স অ্যাসোসিয়েশন
১০) বেপজা

যে সকল শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) শ্রম অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
২) শ্রম অধিদপ্তর
৩) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অদিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৪) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অদিদপ্তর
৫) শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম
৬) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
৭) শিল্প পুলিশ
৮) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন
৯) শ্রম অধিদপ্তর, দিনাজপুর

সংযুক্তি ৪.৩: শ্রমিক, মালিক, পেশাজীবী, শ্রম ও মানবাধিকার সংগঠন ও শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভার তালিকা

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ
শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
শ্রমিক অধিকার, নারী অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
নির্মাণ শ্রমিক প্রতিনিধি
চট্টগ্রামস্থ স্কপ ও অন্যান্য জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন
চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর প্রতিনিধি
শ্রম গবেষকবৃন্দ
শ্রম আইন সংস্কার কমিটি
হকার্স সংগ্রাম পরিষদ
রাইড শেয়ারিং ও পরিবহন শ্রমিক প্রতিনিধি
খুলানস্থ স্কপ ও অন্যান্য জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ
খুলানস্থ মানবাধিকার কর্মীগণ
বরিশালস্থ মানবাধিকার সংগঠনসমূহ
বিউটি পার্লার শ্রমিক সংগঠন
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
রানা প্লাজা ভিকটিম
লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন
সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
রাজশাহীর স্কপ ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নসমূহ
রংপুরস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনসমূহ
হালকা যানবাহন সংগঠন
ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক
আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়ন টিম
রাইজ
IndustriAll অন্তর্ভুক্ত গার্মেন্টস সংগঠনসমূহ
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী
WARBE
সিলেটস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও অন্যান্য চা শ্রমিক সংগঠন
মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ সংগঠনসমূহ
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল
আইএলও টেকনিক্যাল টিম
আইএলও টেকনিক্যাল টিমের (সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
অর্থনীতিবীদ
Médecins Sans Frontières
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম
সিনিয়র ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ
শ্রম অধিদপ্তর
গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠন
বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
চট্টগ্রামস্থ শ্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ
চট্টগ্রামস্থ মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার সংস্থার প্রতিনিধি
অক্সফ্যাম (অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিক অধিকার কর্মী)
শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক প্রশিক্ষকগণ
পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
আইএসসি প্রতিনিধিবৃন্দ
নারী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ
খুলানস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনসমূহ
বরিশালস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনসমূহ
বরিশালস্থ স্কপ ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনসমূহ
অনুল্লেখিত খাতসমূহের প্রতিনিধিগণ
OSHE ফাউন্ডেশন
দপ্তরি কাম প্রহরী
বিভিন্ন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ (স্কপ ব্যতীত)
রাজশাহীর মানবাধিকার/আদিবাসী সংগঠনসমূহ
রাজশাহীর বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনসমূহ
রংপুরস্থ স্কপ ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনসমূহ
গিগ এবং অ্যাপ বেজড্ ওয়ার্কারদের সংগঠনসমূহ
বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
এথিকাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ
Practical Action
সোনালী ব্যাংক কর্মচারী
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)
গণমাধ্যম সংগঠনসমূহ
সিলেটস্থ স্কপ ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নসমূহ
মৌলভীবাজারস্থ বিইএফ ও বিভিন্ন মালিক সংগঠন
আদিবাসী প্রতিনিধি
ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (বিটিইউসি)
কৃষি শ্রমিক সংগঠনসমূহ
প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ক সংগঠনসমূহ
শ্রম ইস্যুতে কর্মরত চিকিৎসাকর্মী
বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন
National Coordination Committee for Workers' Education (NCCWE)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক